প্রসঙ্গ

ধূর্জটিপ্রসাদ

৩২/ই/১ বাবুরাম ঘোষ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪০

পরিবেশক : চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

প্রথম পুস্তক সংস্করণ :
আশ্বিন ১৩৬৬

কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক ৩২/ই/১ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলকাতা ৪০ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী কর্তৃক প্রিণ্টার্স কর্নার প্রাঃ লিমিটেড, ১ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : দীননাথ সেন

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : শ্রীপ্রিন্টিং প্রেস, ১৬ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৯

সূচিপত্র

স্মৃতিচারণ

সুশোভন সরকার

[শ্রীসুশোভন সরকার মহাশয়কে আমরা ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেছিলাম; যেহেতু শারীরিক কারণে তাঁর পক্ষে স্বহস্তে লেখা সম্ভব ছিল না আমরা শ্রুতিধর যন্ত্রের ফিতের তাঁর কণ্ঠস্বর বিধৃত ক'রে এনেছিলাম। নিচের নিবন্ধটি তারই অনুলিখন। আমাদের ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয় একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে নিবন্ধটিকে পরিবর্ধিত করার, কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎকার ও তাঁর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান এত স্বল্পকালের ছিল যে সে সুযোগ আমরা পেলাম না, তাই তাঁর বাচনভঙ্গীকে অবিকৃত রেখে কথকতাধর্মী এই নিবন্ধটি ছাপা হোল; দ্বিতীয়ভাগে জুড়ে দেওয়া হোল প্রাসঙ্গিক কথোপকথন অংশটি।]

'পরিচয়'-এর কথায় তাঁর সম্পর্কে বলব। আমার বাবা সবুজপত্র কাগজটা রাখতেন। সেই কাগজেই আমি প্রথম তাঁর পরিচয় পাই। তিনি সবুজপত্র গোষ্ঠীর শ্রদ্ধেয় লেখক ছিলেন; সেই হিসাবেই তাঁর কিছুটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শুনেছি। কলকাতায় যখন আমি ছাত্র তখন তাঁর সংগে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এই সময়েই বোধ হয় তিনি অর্থনীতিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হয়ে চলে যান। ১৯২৬ সালে আমার যতদূর মনে হয় আমার প্রথম বছরের ছাত্রদের মধ্যেই ছিলেন ধূর্জটিবাবুর ছোটোভাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ধূর্জটিবাবুর সংগে আমার সাক্ষাৎ আলাপ ১৯৩১ সালের আগে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আলাপের সূত্রপাত পরিচয়ের বৈঠকে। পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩১ সালে এবং ছুটির সময় ধূর্জটিবাবু আসতেন লক্ষ্ণৌ থেকে আর আমি ঢাকা থেকে। আমাদের বৈঠকে তখন মজলিস খুব জমে উঠত। পরিচয়ের প্রথম সংখ্যায় ধূর্জটি-বাবুর সংগে আমার লেখাও বেরিয়েছিল। এটা আমার পক্ষে গৌরবের কথা। হিরণকুমার সান্যাল বলে গেছেন যে পরিচয়ের ভাবগঙ্গায় লালের ছোপ প্রথম আনলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ধূর্জটিপ্রসাদ দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন—তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই আকর্ষক, হাতে সর্বদা থাকত সিগারেটের টিন, বাচনভঙ্গী শিষ্ট, খুবই মজলিসী। এর কয়েক বছর পর আমি একডালিয়া রোডে আমার বন্ধু হিরণ কুমার সান্যালের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে কিছুদিন থাকি। তখন সেই পাড়ার প্রায়

আমাদের সামনাসামনি গড়ে উঠেছিল গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব বাড়ি। কাজেই আমাদের তখন খুবই আড্ডা হোত, বিশেষ করে ধূর্জটিবাবু যখন কলকাতা থাকতেন।

১৯৩৩-এর পর থেকে আমি কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করি, কিন্তু ধূর্জটিবাবু তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত বাংলার বাইরেই কাটান। তিনি আসতেন মাঝে মাঝে, আর যখনই আসতেন তখনই পরিচয়ের আড্ডায় খুব একটা আলোড়ন হোত। এই প্রসঙ্গে বলি পরিচয়ের দু-একটা লেখা উনি যুধিষ্ঠির দাস নামে বের করেছেন। তার পরে এলো তাঁর বিখ্যাত ট্রিলোজি, বাংলা সাহিত্যে যাকে একটা অসাধারণ সৃষ্টি বলে মনে করি—অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা। বইগুলি তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন তার উপর অনেক মন্তব্য লিখে। সেগুলি আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান সম্পদ। আমি ওঁর On Indian History বইখানি আরও কয়েকটি বইয়ের সংগে পরিচয়ে সমালোচনা করেছিলাম. তাতে এই বইটা হয়তো যথাযোগ্য সম্মান পায়নি, যদিও এ বিষয়ে কোনো ক্ষোভ তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেননি। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার সংগে কখনো আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না কারণ পরিচয়ের বৈঠকে প্রধান বস্তু ছিল মজলিসী গল্প এবং আজেবাজে তর্কাতর্কি। আর পরিচয়ের বাইরে যখন বাড়িতে ধূর্জটিবাবু আসতেন তখন নানারকম ঘরোয়া কথাতেই সময় কাটত অর্থাৎ আমাদের নেহাৎ বৈঠকী মজলিস বসত। সেইজন্য ধূর্জটিবাবুর ঠিক মত কী, কী আমাদের সংগে তাঁর পার্থক্য এসব নিয়ে কোনো আলোচনা মনে পড়ে না। শুনেছি তিনি নাকি নিজে বলে গিয়েছেন তিনি মার্কসিস্ট ছিলেন না, ছিলেন মার্কসোলজিস্ট। কথাটা অনেকাংশে সত্যি কারণ তাঁর পড়াশুনো ছিল প্রচুর কিন্তু কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানের সংগে গভীর সংযোগ ছিল বলে কখনো টের পাইনি, অবশ্য উত্তর প্রদেশের কম্যুনিস্ট তরুণরা অনেকখানি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে রুদ্রদত্ত ভরদ্বাজ। এও দেখেছি একবার যখন লক্ষ্ণৌ-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যেতে হয়েছিল এবং ধূর্জটিবাবুর অতিথি হয়েছিলাম তখন তাঁর সংগে আচার্য নরেন্দ্র দেবের গভীর সম্প্রীতি। নরেন্দ্র দেব তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। আমাকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই আমার যা মনে হয় তা এই যে বামপন্থীয় চিন্তামার্গে যাঁরা বিচরণ করতেন তাঁরা সকলেই ধূর্জটিবাবুর আড্ডার লোক ছিলেন এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে তাঁরা সকলেই পরম শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু আবার বলছি কোনো বিশেষ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তাঁকে বোধ হয় টানতে

পারেনি, যদিও তাঁর পড়াশুনো ছিল প্রচুর।

আবার ব্যক্তিগত কথায় ফিরে আসছি। কয়েকটা দিনের কথা খুব মনে পড়ে। আমরা তখন ডাকদায়। ধূর্জটিবাবু সুধীন্দ্রর অতিথি হয়েছিলেন কালিম্পং-এ। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে ওরা দুজন ডাকদায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। প্রচণ্ড আড্ডা হয়েছিল দুদিন। এই আড্ডাটাই ছিল তাঁর প্রাণ। পড়াতে বা লেখাতে তত্ত্বসন্ধান থাকলেও আসল ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন মজলিশী মানুষ এবং বন্ধুবান্ধবদের সেইজন্যই অত্যন্ত প্রিয়। তিনি প্রিয়তর হতেন মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা বলে। মনে পড়ছে যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন তখন ধূর্জটিবাবু মন্তব্য করেছিলেন—আমি নিঃসন্দেহ যে Providence is an Englishman কারণ এইবার তাদের শিক্ষা হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের খুব অনুরক্ত ছিলেন এবং হয়তো সেই জন্যেই পরিচয় যখন সুধীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে হস্তান্তরিত করলেন নতুন পরিচয়ের সংগে ধূর্জটিপ্রসাদ কোনদিনই নিজেকে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারেননি, তিনি বৈঠকে আসাও একরকম বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং পরিচয়ের নতুন কর্তৃপক্ষের সংগে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেননি। পরিচয়ের কুড়ি বছর বইতে হিরণকুমার সান্যাল যে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগে খানিকটা মনোমালিন্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেটার মূল বোধ হয় এখানেই। পরিচয়ের বৈঠকে ধূর্জটিপ্রসাদ আর কখনো বিশেষ আসেননি। তার আরেকটা কারণ হয়তো ছিল এই যে সাংসারিক কয়েকটি ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংগে তাঁর আগেকার বন্ধুবান্ধবদের একদম বিচ্ছেদ এসে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার ধরণও একেবারে পাল্টে যায়। পরিচয়ের পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে তাঁর সম্পর্ক শিথিল এমনকি ছিন্ন হয়ে যায় বলা চলে। এই বিচ্ছেদ ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। তিনি না পারতেন সুধীন্দ্রর নতুন ধরনের জীবনযাত্রা সমর্থন করতে, অন্যদিকে সুধীন্দ্রকে বর্জন করাও তাঁর পক্ষে দুঃসহ হোত। আমার মনে হয় এই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ধূর্জটিপ্রসাদকে পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে অনেকটা সাহায্য করেছিল, কিন্তু আমাদের সংগে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথমে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। এই সময় তিনি মাঝেমাঝে দেরাদুনেও বিশ্রাম করতে যেতেন। সুধীন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর শেষের দিকে ধূর্জটিপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসেন। আমি সমস্ত ব্যাপারটিকে অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থাপন করছি বলে হয়তো অন্যায় করে

ফেললাম, তবু এবার তাঁর শেষ জীবনের কিছু কথা বলব। গলায় ক্যান্সার হওয়ায় ধূর্জটিপ্রসাদ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্যে তিনি বিদেশে যান, কিন্তু তাতে রোগ আরোগ্য হয়নি। ফিরে এসে তিনি আমাদের এলগিন রোডের বাড়ির কাছে ডাঃ বি. এম. মৈত্রর বাড়ির চারতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তাঁর শরীরে অসাধারণ কষ্ট ; ক্রমাগত কাশি আসত—কিছুতেই আরাম পেতেন না। সেই সময় প্রায়ই ওঁর কাছে যেতাম এবং তিনি চাইতেন আমাদের উপস্থিতি। তাঁর মত লোককে জীবনের শেষ কটা দিন এমন কষ্টে কাটাতে হোল বলে আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। অবশ্য এর মধ্যেও তাঁর সবদিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি একটি ডক্টরেট পরীক্ষায় আমার সঙ্গে সহপরীক্ষক ছিলেন এবং অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ছে। আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির সে সময় হঠাৎ অবসান হয়। এতে ধূর্জটিপ্রসাদ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আবার আমাকে কাজ দেবার প্রস্তাব করাতে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বারবার খোঁজ নিতেন ব্যাপারটা কতদুর এগোল। এরই মধ্যে আমরা এলগিন রোড ছেড়ে নাকতলা চলে আসি নিজেদের বাড়িতে। সেইখানেই একদিন খবর পেলাম যে ধূর্জটিপ্রসাদের শেষ অবস্থা। দৌড়ে গেলাম কিন্তু তখন আর তার কোনো কথা বলবার অবস্থা ছিল না। আমার এই স্মৃতিচারণ খুবই ব্যক্তিগ • হয়ে গেল, কেবল ধূর্জটিপ্রসাদকে আমি বড়ো মনীষীর চাইতে মানুষ হিসেবেই বেশি কাছে পেয়েছি, দেখেছি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে।

২.

১) প্রঃ পরিচয় আপনাদের হাতে চলে যাওয়া ধূর্জটিপ্রসাদের অপছন্দ ছিল কেন ?

উঃ অপছন্দ কেননা চলে গেল কতকগুলো অর্বাচীন লোকেদের হাতে।

২) প্রঃ On Indian History-তে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন মার্কসের অনেককিছু ভালো, গণ্ডগোলটা হচ্ছে মার্কস যেখানে specificity কে overlook করে History as unity এভাবে দেখছেন এবং উনি মার্কসের সমালোচনা করছেন দুটো কারণে, Workers of the world unite এই স্লোগানের জন্যও মার্কস First International নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করেছিলেন। এসব লেখার আগে আপনাদের সংগে কোনো আলোচনা হয়েছিল যেমন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্যাসিজ্‌ম্ নিয়ে তর্ক ?

উঃ কোনো আলোচনা করেননি। আলোচনা যা হোত সবই লেখার মধ্যে। পরিচয়ের আড্ডা যে serious একটা ব্যাপার ছিল তা নয়। আড্ডা-গল্প-খাওয়া; একজন একটা কথা বললেন তো আর একজন আর একদিকে চলে গেল।

৩) প্রঃ ধূর্জটিপ্রসাদের training ছিল অর্থনীতিতে, লেখাপত্রের বড় অংশ সমাজতত্ত্বে, Marxist method নিয়ে—এই যে দৃষ্টি সরে যাওয়া একি নিজের থেকে হয়েছিল নাকি ভারতীয় Marxist-দের প্রভাব ছিল?

উঃ আমার তো মনে হয় না প্রভাব ছিল। তবে রাশিয়া গিয়েছিলেন।

৪) প্রঃ হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়ের কুড়ি বছর' বইতে (পৃঃ ৮৮) বলছেন ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন খ্যাপালোক, সুতরাং তাঁর গালিগালাজ গায়ে মাখার দরকার নেই। খ্যাপা মানে কি?

উঃ ওঁকে ঠিক খ্যাপা লোক বলা যায় না, অবশ্য মাঝে মাঝে খুব ধমক লাগাতেন।

৫) প্রঃ কিন্তু হিরণবাবুর সঙ্গে মতান্তর তো খুব সাধারণ কারণে। হিরণবাবু লিখেছিলেন ধূর্জটিবাবুর উপর আলোচনার ভার পড়েছিল; ধূর্জটিপ্রসাদ বলতে চান ভার কেউ দেয়নি, তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। এটা তো খ্যাপামির লক্ষণই।

উঃ কোনো কারণে হয়তো চটে গেছেন। হিরণ বোধহয় mean করেছে touchy—আসলে একটা লোক একটা character, দোষেগুণে মানুষ।

৬) প্রঃ দোষের উদাহরণ দিন একটা।

উঃ ওই যে বললাম, নিজেকে কখনো commit করলেন না। অনেক পড়াশুনো করেছেন, কিন্তু খুব definite point of view কোথাও দিয়ে গেছেন বলে তো মনে হয় না। এটা তাঁর অসম্পূর্ণতা, কিন্তু তিনি ছিলেন voracious reader, নানারকম বই পড়তেন। নানা কথা মনে আসত, পরিচয়ের আড্ডায় কি কোথাও এসব বলতেন কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর পাণ্ডিত্য কিংবা তাঁর philosophy কিংবা economics এসবগুলি তো বড়ো ছিল না, এসব নিয়ে আমরা কখনো মাথা ঘামাইনি।

ধূর্জটিপ্রসাদের অর্থনীতি-চিন্তা

ভবতোষ দত্ত

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সময়ে তাঁর অধ্যাপনা-জীবন শুরু করেন তখন অর্থনীতির পাঠক্রম খুব ব্যাপক ছিল। অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগ ছাড়াও ছাত্রদের পড়তে হোত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রশাসন। 'বিশেষ পত্র' হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং বা পরিসংখ্যান-তত্ত্বের মত নেওয়া যেত আন্তর্জাতিক আইন ও সমাজতত্ত্ব। আজকাল প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলাদা ডিগ্রী দেওয়া হয় এবং কয়েকটি স্থানে সমাজতত্ত্বেও পুরোপুরি এম-এ ডিগ্রীর পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। ষাট বছর আগে, কুড়ির দশকে নব-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি সমাজতত্ত্ব পঠন-পাঠন ও গবেষণার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন এই কেন্দ্রের মধ্যমণি। উত্তর ভারতের প্রবীণ সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই ধূর্জটিপ্রসাদের হাতে-গড়া ছাত্র।

নামে অর্থনীতির অধ্যাপক হলেও ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতি বেশি পড়ান নি এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর লেখাও খুব কম। কিন্তু অল্প যে দু'একটি লেখা পাওয়া যায় তাতে তাঁর গভীর চিন্তাশীল মন কত সহজে কত দুরূহ তত্ত্বের মূলে গিয়ে পৌছতে পেরেছিল তার পরিচয় পরিস্ফুট। যে দুটি অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তাঁর 'ডাইভার-সিটিজ' (১৯৫৮) নামক সংকলন-গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল, তার একটি—'অন দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অভ্ ইকনমিক থিয়োরি'—প্রকাশিত হয়েছিল শচীন চৌধুরী-সম্পাদিত 'ইকনমিক উইকলি'-র ১৯৫০ সালের বার্ষিক সংখ্যায়, এবং দ্বিতীয়টি—অ্যান ইকনমিক থিয়োরি ফর ইণ্ডিয়া' ১৯৫৪ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রূপে যোগ দেবার সময়ে উদ্বোধনী বক্তৃতা হিসাবে প্রদত্ত হয়েছিল। সংকলন-গ্রন্থটিতে অর্থনীতি-নামাঙ্কিত আরো দু'টি প্রবন্ধ আছে, কিন্তু তার বিষয়-বস্তু অর্থনীতির তত্ত্ব বা তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। উপরে উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধ থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদের অর্থনীতি-ভাবনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, বিশেষত, দ্বিতীয় প্রবন্ধটি থেকে।

১৯৫০-এ প্রকাশিত 'অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা' সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে মূল আলোচ্য

বিষয় ছিল তৎকালীন নব-প্রকাশিত কয়েকটি বই। লেখাটির মুখবন্ধ পড়ে মনে হয় যে সম্পাদক বোধহয় তাঁকে তাঁর সম্প্রতি-পঠিত বই সম্বন্ধেই লিখতে বলেছিলেন। প্রবন্ধটিতে সাঁইত্রিশটি বইয়ের উল্লেখ আছে। বইগুলির অধিকাংশই তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঠিতব্যের মধ্যে ছিল এবং সেগুলি সম্বন্ধে ধূর্জটি-প্রসাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এখন ত্রিশ বছর পরেও অসমীচীন মনে হবে না। এই সব মন্তব্যের মধ্যে থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বেরিয়ে আসে—প্রথম, অর্থনীতিতে গণিতের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি এবং দ্বিতীয়, ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যার বিশ্লেষণে 'কেইনসীয়' তত্ত্বের অনুপযোগিতা।

স্যামুয়েলসনের বিখ্যাত 'ফাউণ্ডেশনস অভ ইকনমিক অ্যানালিসিস' এবং নয়মান মরগেনসটারনের 'থিয়োরি অভ গেম্‌স্ অ্যাণ্ড ইকনমিক বিহেভিয়ার' তখন অবশ্য কয়েক বছরের পুরাণো হয়ে গিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন যে তিনি বই দু'টি বুঝতে চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু সফলকাম হন নি। এর প্রধান কারণ অবশ্য যে গণিতে বেশ কিছুটা জ্ঞান আগে থেকে সংগ্রহ না করে নিলে সরাসরি এ দুটি বইয়ের কোনোটারই কিছু বোঝা যাবার কথা নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন যে কেইনস গণিত-বিশারদ ছিলেন না। আসলে কেইনস কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের 'র‍্যাংলার' ছিলেন, কিন্তু বিষয়টির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। ফলে কোথাও তিনি কোনো গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন নি এবং গদ্য রচনায় অসামান্য অধিকার থাকাতে কোনো কথা বুঝিয়ে বলতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। ধূর্জটিপ্রসাদ এই কারণেই কেইনসের রচনাকে তাঁর নিজের অনুধাবন-শক্তির সমস্তরের বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে কেইনসের 'পূর্ণ-কর্মসংস্থান'-এর তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান, বিশেষত ভারতের মত দেশের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির দিক থেকে। তাঁর বক্তব্য, আমরা 'পূর্ণতর' কর্মসংস্থানের কথা ভাবতে পারি কিন্তু যে দেশে বিরাট-সংখ্যক লোক অনুৎপাদক কাজে বা যেখানে তাদের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় না এমন কাজে নিযুক্ত সেখানে আমরা কেইনসীয় পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি না। আলোচনাটা খুবই অসম্পূর্ণ, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তাধারার গতি কোন দিকে এর থেকে তার সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালী ও বিশেষত সরকারি উদ্যোগে উৎপন্ন জিনিসপত্রের দাম স্থির করার সমস্যা নিয়ে ১৯৫০-এর আগের দুই দশক ধরেই আলোচনা চলছিল। যে বইগুলি অপেক্ষাকৃত নুতনতর ধূর্জটিপ্রসাদ সেগুলির উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু বিশদভাবে কোনো মূল্যায়ন করেন নি। বোটের

উপর তাঁর বক্তব্য ছিল যে অর্থনীতির বিশ্লেষণ হবে ইতিহাসভিত্তিক। ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণের সঙ্গে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোনো বিরোধ নেই সেটা ধূর্জটিপ্রসাদ হয়তো আরো একটু জোর দিয়ে বলতে পারতেন।

এই প্রসঙ্গে দু'জন ভারতীয় গবেষকের উপরে তিনি একটু অবিচার করেছিলেন। এস-বি রঙ্গনেকার বই লিখেছিলেন অপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বি-ভি কৃষ্ণমূর্তি লিখেছিলেন পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মূল্য নির্ণয় নিয়ে। এঁরা দু'জনই গাণিতিক বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করেছিলেন। সেই গণিত খুব উচ্চস্তরের ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল, তা ছিল অপরিহার্য। তাঁদের যা বিষয় বস্তু ছিল তাতে ধূর্জটিপ্রসাদের ঐতিহাসিক পন্থা দিয়ে কিছু করা যেত না। বই দুটিতে অনেক ত্রুটি ছিল, বিশেষত প্রথমটিতে, কিন্তু তার সংস্কার হতে পারত বিশুদ্ধতর গাণিতিক পন্থায়। এটাও আশ্চর্য যে ১৯৫০-এ ধূর্জটিপ্রসাদ আর কোনো ভারতীয় লেখকের কোনো বইয়ের নাম উল্লেখ করেন নি। বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঘোষ, কে-এন্ রাজ প্রভৃতি অনেকের চল্লিশের দশকের শেষ দিকে প্রকাশিত বইগুলি সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু আলোচনা হতে পারত। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে ভারতীয় রচনার অভাব সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রায় সেই সময়েই অমিয়কুমার দাশগুপ্তের বই সবাই পড়ছিলেন। জে-কে-মেহতা-র অর্থনীতি আলোচনা সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ কী মনে করতেন সেটা জানতেও কৌতূহল থেকে যায়।

১৯৫৪ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতাতে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হলে একটা উদ্বোধনী বক্তৃতা দেবার বিলাতি প্রথা আমাদের দেশে চালু হয় নি। ধূর্জটিপ্রসাদ এই প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর মূল অর্থনৈতিক চিন্তাধারার একত্রে গ্রথিত একটা চিত্র দেবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম থেকে দেখা যায় তিনি 'ভারতের জন্য' ঠিক কী ধরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োজন তারই অনুসন্ধান করেছিলেন। ভারতের জন্য কী ধরণের গণিত বা পদার্থবিদ্যা প্রয়োজন সে প্রশ্ন কেউ তোলে না, কিন্তু অর্থনীতির বেলাতে সামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্নতায় মৌলনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। বক্তৃতাটি দীর্ঘ ছিল, কিন্তু তাঁর প্রধান বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করা শক্ত নয়।

অর্থনীতির ধারণাবলীর বিবর্তন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনার পরে ধূর্জটিপ্রসাদ চলে আসেন ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য কোন তাত্ত্বিক

রূপাদর্শ সবচেয়ে উপযোগী তার বিচারে। মনে রাখতে হবে যে ১৯৫৪ সালে আমাদের প্রথম পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনার তিন বছর পূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু বিখ্যাত মহলানবিশ মডেল তখনো আলোচনার স্তরে আসে নি। আর দুইবছর পরে লিখলে ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় পরিকল্পনার দিগ্‌দর্শন সম্বন্ধে আরো পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন যে ভারতীয় পরিকল্পনা কেইনসীয় অর্থনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে সামগ্রিক উন্নতির সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতি থেকে পাওয়া যাবে না—এর জন্য রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, গণ-মনস্তত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি সব রকমের সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। গাণিতিক পদ্ধতি থেকে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির শর্তাবলী পাওয়া যাবে, কিন্তু পরিবর্তনের দর্শন আসলে ইতিহাসের দর্শন, এবং এই ইতিহাস সামগ্রিক।

অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন যে কেইন্‌সীয় মূলনীতিতে আয় ও সম্পদের বণ্টনের কাম্য পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু নেই, অথচ ভারতীয় উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে এটাই বড় কথা। কেইনসকে বাদ দিয়ে যদি অর্থনৈতিক প্রগতির অন্য কোনো মূলনীতির সন্ধান করতে হয় তাহলে ধূর্জটিপ্রসাদ দুজনের তত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করেন—জোসেফ শুম্‌পিটার এবং কারল মারক্‌স্। তাঁর মতে অনুন্নত আর্থিক স্থিতি-কে উন্নয়নের পথে গতিশীল করতে যে বিশ্লেষণ ও নীতির প্রয়োজন হয় সেটা পাওয়া যাবে শুম্‌পিটারে, যাঁর অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল নতুন জিনিস, নতুন বাজার, নতুন রসদ, নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদির ফলেই দেশের মোট উৎপাদন এগিয়ে যায়, নতুনের প্রবর্তনই উন্নতির চাবিকাঠি। অবশ্য শুম্‌পিটার তাঁর এই ধারণা প্রয়োগ করেছিলেন ব্যক্তিপ্রধান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং আরো ব্যাপকভাবে ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক বা পরিকল্পনা-নীতি-অনুসরণকারী দেশে তাঁর তত্ত্ব ঠিক কোন রূপ নেবে সেটা ১৯৩৪ সালে তাঁর কাছে সমস্যারূপে উপস্থিত হয় নি। ধূর্জটিপ্রসাদ এটা বুঝেছিলেন যে ভারতের 'মিশ্র অর্থনীতি'-তে নবীকরণের ভার নিতে হবে প্রধানত রাষ্ট্রের এবং তাতে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার সহযোগের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাও আছে।

অন্য রূপাদর্শের অসম্পূর্ণতা থেকে দৃষ্টি চলে যায় মারকসের দিকে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন যে তরুণ শ্রেণী মারক্‌স্‌বাদ গ্রহণ করেন বিভিন্ন কারণে—কেউ বা অন্য পন্থার উপরে হতাশ হয়ে, কেউ নতুন ধর্মনীতি গ্রহণের আগ্রহে, এবং কেউবা ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশায়। মারক্‌স্‌বাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তব-

সম্মত বিশ্লেষণ এবং তার ব্যাপকতা ধূর্জটিপ্রসাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে মারক্সীয় যুক্তিধারার মধ্যে ফাঁক আছে, সূত্রের শৈথিল্য আছে। মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির পরীক্ষার অবকাশ আছে। মূল্যতত্ত্ব ও সামগ্রিক প্রগতি-তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। কথাগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন অত্যন্ত সংক্ষেপে, যদিও তাঁর পক্ষে আরো বিশদ আলোচনা করা সম্ভব ছিল। বিদেশ থেকে আহৃত চিন্তাধারা গ্রহণে যে আত্মমর্যাদার হানি হয় একথা বলে তিনি মারক্সবাদকেও ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করেন। পাঠকের মনে অতৃপ্তি থেকে যায়।

বাকি থাকে গান্ধীবাদ, যা নিতান্তই দেশজ। গান্ধীপ্রদর্শিত পন্থাতে বাস্তবতার অভাব নেই, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ স্বীকার করেছেন যে এই মত-সমষ্টিকে একটা পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের অঙ্গীভূত করা শক্ত। এবং এটাও ঠিক যে যুগের চাহিদার সঙ্গে গান্ধীনীতিকে খাপ খাওয়ানো খুবই দুরূহ। সীমিত অভাব-বোধ এবং শেষ পর্যন্ত অভাব-বোধের সম্পূর্ণ বিলয় ধূর্জটিপ্রসাদকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু তা সর্বজনগ্রাহ্য হবে না এটা তিনি বুঝেছিলেন। গান্ধীবাদ পঠন-পাঠনের প্রধান উপকার হবে বিদেশ থেকে আনা ধ্যান-ধারণার অন্তত আংশিক প্রতিষেধক হিসাবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় পথ? ধূর্জটিপ্রসাদ আবার ফিরে এসেছেন তাঁর আগেকার কথায়। অর্থনীতির সিদ্ধান্ত নিতে হলে অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে সেটা হবে না, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সব কিছু মিলে যে সমাজবিজ্ঞান তারই অঙ্গ হবে উন্নয়নের অর্থনীতি। অনেক কথাই অস্পষ্ট থেকে যায়, কিন্তু সংশয় জাগানোও চিন্তাবিদের অন্যতম প্রধান কাজ। ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন না এই কথা মেনে নিয়েও বর্তমান যুগের অর্থনীতির ছাত্র অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন ধূর্জটিপ্রসাদ যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন তার উত্তর খুঁজতে। আমাদের উন্নয়নের পথে কোথায় আমরা ভুল করেছি, কেন আমরা আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক সাম্যের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি, পরিকল্পনা নীতি গ্রহণের তিন দশক পরেও তার উত্তর মেলোন। চিন্তার জগতে এবং বাস্তবজীবনের মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণে সুসঙ্গত ও সু-সংহত প্রশ্ন তুলতে পারাটাই একটা মস্ত কাজ। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর তিনি দেননি, কিন্তু তার উত্তরপুরুষ সে কাজের ভার নিতে সংকুচিত হবে কেন?

ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদ : একটি পরম্পরা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

ই পি. টমসন লেসজেক কোলাকোস্কিকে লেখা এক খোলা চিঠিতে মার্কসীয় ঐতিহ্যের কথা বলেছেন—উপদেশাবলী বা মতবাদ, পদ্ধতি বা উত্তরাধিকার হিসাবে নয়, একটি পরম্পরা, ঐতিহ্য হিসাবেই মার্কসবাদকে তিনি দেখতে চান। গুরুত্বপূর্ণ নবপরিপ্রেক্ষিত মার্কসবাদে উন্মোচিত হতে পারে, যদি ঐতিহ্য হিসাবে মার্কসবাদ আমাদের কর্মে চিন্তায় আসে। বিশ্বইতিহাসের ত্রিপার্শ্বকাচের ভেতর দিয়ে মানবিক ঘটনাবলীকে দেখা, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষ কেমন সমাজে গড়ে ওঠে তা বোঝা, এসূত্রেই সম্ভব হয়। আবার মানুষের কর্মের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি কিভাবে মানবীকৃত হয়ে উঠছে, চিন্তা-মনন সক্রিয়কর্মের জ্ঞান – এ সবই স্পষ্ট হতে পারে মার্কসবাদকে অনড় তত্ত্ব হিসাবে না দেখে, কেবল একটা পদ্ধতি, একটা স্থাণু উত্তরাধিকার না ভেবে, একমাত্র পরম্পরা যেমন একই সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সূত্রে গৃহীত, বিবেচিত হয়, তেমনভাবে মার্কসীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হলে, তাকে মুক্তভাবে গড়ে তুললেই মার্কসবাদ প্রাণময় হয়। এ পরম্পরার আন্তর্জাতিক দিক যেমন আছে, তেমনি আছে বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দেশগত দিক। লেনিন, মাও জেদঙ বা গ্রামসির মত ব্যক্তির হাতে মার্কসবাদ এরকম দেশগত পরম্পরায় ধৃত হয়, যদিও তাঁদের কর্ম ও চিন্তার বিশ্বজনীন তাৎপর্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট। এঁরা দেশের সমাজের বিশেষ চারিত্র্যের প্র্যাকসিসের গৌরবময় কর্ম-ঐতিহ্য নির্মাণ করেন, ১৯২০-র দশকে ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হলেও তেমন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে না। কেন ওঠে না, তার কারণানুসন্ধানের ক্ষেত্র এ প্রবন্ধ নয়, তবে ওঠেনি যে সেটি বাস্তব সত্য, আর ওঠে নি বলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের মার্কসবাদী অবদান প্রায় শূন্য। কর্মৈষণার স্বাবলম্বী মার্কসবাদ না থাকার দরুণ তাত্ত্বিকভাবেও কোন ঐতিহ্য আমাদের দেশে নেই। বস্তুতঃ আমাদের গত প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস 'পরিবর্তে'র ইতিহাস : শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী, (যাদের হয়তো বুদ্ধিজীবী বা ইনটেলিজেনসিয়াও বলা যায়) নিষ্ক্রিয় সামাজিক

শক্তিসমূহের পরিবর্তে কাজ করেছেন। এঁরা যে সামাজিক শক্তিসমূহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন তা নয়। তা হতে পারে না ; এঁরা যাকে বলে আপেক্ষিক দূরত্বে ছিলেন। এর ফলে যেমন যথাযথ প্র্যাকসিসের জাগরণ ঘটে নি, তেমনি আবার কেউ কেউ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে, ঔপনিবেশিক-আধা-ঔপনিবেশিক অবসন্ন বিকারের বাইরে থেকে সামাজিক গতি-প্রকৃতি দেখেছেন। মার্কসীয় কর্মকাণ্ডের পঙ্গুতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মননে, সামাজিক গতি-প্রকৃতির উৎসাহী অনুধাবনে নির্মাণ করতে চেয়েছেন মার্কসীয় ঐতিহ্য, যা চালু পার্টিগত কাজকর্ম থেকে পৃথক : ১৯৩০-৪০ দশকের শ্রমিক-কৃষকদের ক্রমশঃ ঐতিহাসিক হয়ে ওঠার বীরত্বপূর্ণ কিন্তু ধারাবাহিকতাহীন লড়াইয়ে এঁদের মনন মূর্ত হয়েছে অনেকখানি। এরকমই একজন ব্যক্তি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাঁর সম্পর্কে জনৈক লেখক লিখেছেন, "নিজেকে কোনোদিন মার্কস্‌বাদী বলে জাহির করেননি, রঙ্গ করে বলতেন তিনি মার্কস্‌তত্ত্ববিদ্। স্রেফ চেতনার আশ্রয়ে জীবনবোধের উপান্তে পৌঁছনো অসম্ভব প্রয়াস, কিন্তু তাঁর প্রয়াসে অন্তত কোনো স্খলন-বিচ্যুতি ছিল না।" (সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা অশোক মিত্র পৃঃ ১৩৯)

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি লিখেছেন ১৯৩০-এর দশকের স্বরু থেকে ১৯৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধের দুতিন বছরের মধ্যে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদে শেষের দুতিনবছর বাদ দিলে পুরোপুরি স্তালিনের যুগ। এ যুগের নানাবিধ বিশ্লেষণ হয়েছে ; একথা সর্বজনস্বীকৃত প্রায় যে মার্কসীয় ঐতিহ্য রচনায় স্তালিন-যুগ নানাদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে—বহুমুখী বিকাশের বহুমাত্রিক অর্কেস্ট্রায় মার্কসবাদ বেজে ওঠে নি। নিশ্চয়ই তার কারণ একমাত্র স্তালিন ছিলেন না, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে সৃষ্ট রুশ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ মার্কসীয় ঐতিহ্য রচনায় গোঁড়ামি, ডগমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, সাম্যবাদকে এক ধরণের ধর্মীয় মন্ত্রোচ্চারণে পরিণত করেছিল। এর মধ্যেই চীনে মাও জেদঙের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নির্মিত হচ্ছিল, জর্জ লুকাচ ভিন্ন পরম্পরার কথা বলছিলেন ; আন্তনিও গ্রামসির মনীষা ও কর্মকাণ্ড মার্কসবাদকে মুক্ত স্রোতে নিয়ে আসছিল। বলাই বাহুল্য এত সব ভিন্ন ঐতিহ্যের কথা আমাদের দেশে সে সময় পৌঁছায় নি বললেই হয় ; ধূর্জটিপ্রসাদের মত গ্রন্থবিহারী ও আধুনিক বইয়ের অক্লান্ত অন্বেষণকারীর রচনাবলী পড়লেই বোঝা যায় মার্কসবাদের ভারতীয় ব্যাখ্যায় উৎসাহী, স্তালিনীয় ডগমার বাইরে একটা ঐতিহ্য সৃষ্টির জন্য আকাঙ্ক্ষী, ধূর্জটিপ্রসাদ এঁদেরই রচনায় পেতেন সমর্থন, পেতেন চিন্তাসূত্র : কিন্তু তাঁর লেখাতে এঁরা অনুপস্থিত, চিন্তার কাঠামোয় এঁদের কোন

প্রভাব বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। কাসিরের, Dilthey, ম্যানহাইম, কাহলার, এডমণ্ড উইলসন আসেন—যাঁদের লেখায় সচেতন-অচেতনভাবে মার্কসবাদ কিছুটা অঙ্গীভূত। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর মার্কসবাদকে যান্ত্রিকতার হাত থেকে রক্ষা করেন এই সব লেখকদের বুর্জোয়া কিন্তু মার্কসীয় উপাদানে জারিত দৃষ্টান্তে; অন্যদিকে বারবার ঘুরে আসেন ভারতীয় বাস্তবে, ভারতীয় বীক্ষার বিশ্লেষণে, ভারতীয় পরম্পরার শিকড়ে। তিনি উৎসাহী হন মার্কসবাদকে ভারতীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণে স্বাধীনভাবে প্রয়োগে, পদ্ধতির কথা তিনি বলেন ঠিকই, কিন্তু সমগ্রভাবে নির্মাণ করতে চান ঐতিহ্য। তবে স্তালিন আমলে যাঁর রচনা জার্মানীতে ভিন্ন পরম্পরার সৃষ্টি করছিল, সেই Karl Korsch-কেই ধূর্জটিপ্রসাদ পেলেন মার্কসবাদী পরম্পরার পৃথক ঐতিহ্য হিসাবে; বিস্ময়ের যে Karl Korsch এখনও ভারতীয় মার্কসবাদে আদৌ বিবেচিত হন নি, ১৯৪০-এর দশকের ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকেই অনুসরণ করেন। ১৯২৪-এ জিনোভিয়েভ অশোভনভাবে আক্রমণ করেছিলেন লুকাচকে, Korsch-কে। তাঁর মার্কসিজম অ্যাণ্ড ফিলজফি প্রায় লুকাচের হিস্ট্রি অ্যাণ্ড ক্লাসকনশাসনেসের ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রেখটের মার্কসবাদের শিক্ষক Korsch তাঁর স্বাধীনচিন্তার জন্য নিন্দিত হন, ১৯২৬-এ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪৯-এর আগে মাও-সেতুঙের রচনাবলীর প্রকাশের এক পরিকল্পনার জন্য তিনি ভূমিকা লেখেন, মাও-এর তত্ত্বগত মৌলিকতার গুরুত্ব স্বীকার করে। এই Korsch-কে অনুসরণ করা থেকেই বোঝা যায় ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য কি। চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকামী পুরুষতত্ত্বের প্রবক্তা ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তিকে স্বয়ম্ভর স্বরাট হিসাবে দেখেন নি, ক্রমবিকাশমান ব্যক্তি "হয়ে ওঠে" দলের মধ্য দিয়ে, শ্রেণীর মধ্য দিয়ে, আরও বলা ভাল, দলেরই পর্যায় ও পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে—তাদের বিশ্বাস, আচরণ, আদর্শ, মূল্যবোধ, অর্থাৎ বীক্ষা ও পরম্পরা ব্যক্তির এই বিকাশে অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবেই যে স্বাধীন স্বশাসিত ব্যক্তির পুরুষত্বর কথা ধূর্জটিপ্রসাদ ভাবেন, দলের অন্যান্যর সহযোগিতায় যে বাঁচে, তার ক্ষেত্রে কোন নিয়তিবাদী পদ্ধতি, পরম্পরা মানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না; সে ভারতীয় ধর্মীয় ভাববাদীই হোক, আর যান্ত্রিক জড়বাদীই হোক। সে কারণেই তিনি যান এমন বীক্ষার কাছে যে বীক্ষা একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক, বাস্তব ও ভবিষ্যৎমুখী। মার্কসবাদকে তাই তিনি গ্রহণ করেন নিজের মত করে, নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, Karl Korsch-দের মধ্যে পান এই ব্যাখ্যার সমর্থন।

ভারতীয় ঐতিহ্যে মার্কসবাদের এই স্বাবলম্বী স্বাধীন ব্যাখ্যার, পরম্পরার কোন

পূর্বসূরী ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় পাননি বললেই চলে। ১৯৫৫-র ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, "An attempt was made by M. N. Roy to interpret Marxism in the light of India's status as an evolving colony, but no Indian Marxist offered an Indian version of Marxism that could be substitute for Gandhism" জীবনের শেষ দশকের এই সিদ্ধান্ত, যখন তিনি লেখা সুরু করেন তখন আরও সত্য: ১৯৫৫ র মধ্যে তবু কিছু চেষ্টা হয়েছে। লক্ষণীয় তিনি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের। মানবেন্দ্রনাথের পরবর্তী বিকাশ যেমনই হোক না কেন বা রায়পন্থীদের আচার আচরণ যতই আপত্তিকর মনে হোক না, ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে তাঁর রচনাবলীতে ভারতীয় ঐতিহ্য, পরিবেশে মার্কসবাদের প্রয়োগের সৎ চেষ্টা, মার্কসবাদকে 'ডগমা' হিসাবে না ভাবার ইচ্ছা লক্ষণীয়। ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন (১৯২২) ও হোয়াট ইজ মার্কসিজম (১৯৩৮)-এর মত লেখায় মানবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে মার্কসীয় ঐতিহ্য নির্মাণের পুরোযায়ীর কাজ করেছিলেন। Karl Korsch-এর মতই মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে দর্শন হিসাবেই দেখেন। জীবনের দর্শন হিসাবে মার্কসবাদ সমগ্রের অনুসন্ধিৎসু, অর্থনৈতিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনাকে অঙ্গীভূত করে এ জীবনদর্শন। মার্কসবাদকে কেবল অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে দেখাকে 'ভালগার' ব্যাখ্যা হিসাবে দেখেছিলেন। মার্কসবাদ কোন ডগমা নয়, কোন উপলব্ধ জ্ঞান নয়, প্রায় গ্রামসির ধারণারই ছায়া দেখি যখন মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে কার্ল মার্কসের আগেকার তিনশ চারশ বছরের সমস্ত মানবিক কর্ম ও মননের "Co-ordination, a systematisation and a clear scientific presentation" হিসাবে দেখেন। তিনি স্পষ্ট বলেন মার্কস হচ্ছেন প্রথম বস্তুবাদী যিনি আইডিয়ার অবজেকটিভ-রিয়ালিটিকে স্বীকার করেছিলেন। একবার ধারণা নির্মিত হলে তা বাস্তব হয়ে ওঠে, "ideas as real as any other physical object. Ideas are matter, ideas and their objects are no longer antithetical terms, but it becomes a question of priority." বস্তুত: মার্কসবাদের নিয়ন্ত্রণবাদী-নিয়তিবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেই মানবেন্দ্রনাথ দাঁড়ান—মার্কসবাদ কোন মন্ত্র নয়, মার্কসবাদ ক্রমশ: হয়ে ওঠা; ডগমা নয়, পদ্ধতি—তার যথার্থ প্রয়োগ তাই মন্ত্রোচ্চারণের মত আবৃত্তি নয়, দেশকালের পটে তাকে গ্রহণ, হতে পারে তার কোন অংশের সংশোধনের প্রয়োজন। কারণ রেনেসাঁস-উত্তর

ইয়োরোপের সমগ্র মনন-কর্মের এই সংশ্লেষণে ইয়োরোপের বাইরের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে ছিল না আবার ১৮৮৩-র পর বিশ্ব অনেক পরিবর্তিত, মার্কসের চিন্তাও এই পরিবর্তনের একটা কারণ। তাই মার্কসের দর্শনের সৃষ্টিমূলক প্রয়োগ চাই; লুকাচ যাকে টোটালিটি বলেন, দর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে মানবেন্দ্রনাথ সেভাবেই দেখেন—সমগ্রের আলোকে, তার মূল প্রস্থানের প্রয়োগে মানবেন্দ্রনাথও গড়তে চেয়েছিলেন ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহ্য। ধূর্জটিপ্রসাদ স্বদেশে এই একজনকেই তাঁর মার্কসবাদী ঐতিহ্যের সমসাময়িক অগ্রজ হিসাবে পান।

ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সারা জীবনের লেখায় ছড়িয়ে আছে: এই দীক্ষাও তিনি ধীরে ধীরে অর্জন করেন, সংগঠিত করেন, খানিকটা দেশ-কালের পটে স্বাবলম্বীভাবেই। ১৯৩০-এর দশকেই এই দীক্ষার পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে তাঁর রচনাবলীতে—পরিচয়ে প্রায় ধারাবাহিকভাবে "ইতিহাস" শীর্ষক যে প্রবন্ধ তিনি ১৩৪ -৪১-এ লেখেন তাতেই ধরা পড়ে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমাজ-ইতিহাসকে দেখবার ধরণটি বেঁধে নিচ্ছেন মার্কসীয় দীক্ষার জীবনদর্শনের কাঠামোয়। অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে ইতিহাসের ব্যাখ্যার সমালোচনা ক'রে তিনি বলেন, "সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস।" বিজ্ঞানের অভিধাকে ব্যাপ্ত করে বলেন, "বাঁচবার প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান।...যতদিন থেকে খাদ্যসমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে অর্থনীতিগত ব্যাপারটি (ইকনমিক ফ্যাক্টর) সর্বদাই ছিল এবং সে বিষয়টি অঙ্কের ভাষায় প্রাইমারী—একেবারে প্রাথমিক।" বলাই বাহুল্য ১৯৩৩-এ এই সিদ্ধান্তে আসা, যে কোন ভারতীয়র পক্ষেই শুধু যে আধুনিকতা তাই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিকও—যদিও ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এর সঙ্গেই লক্ষণীয় ধূর্জটিপ্রসাদ যান্ত্রিকতাকে এড়ান, সমাজের গতিপ্রকৃতির জটিলতা মনে রাখেন: "কিন্তু আবিষ্কারের গতি, সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এই দুই গতির ভিন্ন হারের ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়।" এই গতির ভিন্ন হার দূর করা এখনও সম্ভব হয় নি। গ্রামশি বলেছিলেন সবাই বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সবার কাজ বুদ্ধিজীবীর নয় অর্থাৎ কাজের হেরফের থাকেই। এর ফলে সমাজ ঠিকমত গঠিত না হলে অসামঞ্জস্য আসে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, "কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী সম্প্রদায়।" ইতিহাসের স্থূলধারাটি "ধনসমাগমের ও বিজ্ঞানের ইতিহাসধারাপুষ্ট।...কোনো একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার ধ্বংসের

কারণ লুকানো থাকে। ধ্বংসের কারণ—ভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। তার কারণ—ধনতন্ত্রমূলক সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর অবস্থিত প্রবণতা এবং বিজ্ঞানের কৃপায় নবনব উপায়ে উৎপাদনের প্রাচুর্য।"

ইতিহাসের এই ধারা ও রীতি সম্পর্কিত ধারণার প্রয়োগ ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় বাস্তবের ক্ষেত্রে করেন পরিচয়ের দুনম্বর ইতিহাস প্রবন্ধে। আজ ১৯৮০-র দশকে তাঁর বিশ্লেষণে নতুন কিছু না পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে বাংলাভাষায় এ বিশ্লেষণ নতুন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসে। আর এ প্রবন্ধেরও একাধিক অংশে যে বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আজ মার্কসবাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। "প্রোটেকশানিজম (protectionism)-এর মোদ্দা কথা এই—দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধের নামে নতুন ধনী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ব্যবসাদার ও জমিদারকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া ; স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি করা ও এমন বাজার তৈরী করা, যেখানে অন্যদেশের সস্তা মাল প্রবেশ করতে পারবে না। এ স্বাধীনতা স্টেটের দান।" ১৯৩০ এর দশকে জাতীয়তাবাদের প্রবল ঝোঁকের মধ্যে এ চিন্তা যথার্থ মার্কসবাদীই করতে পারেন, যাঁর শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ আরও বলেন, "আমাদের মানসিক ইতিহাসের তিনটি বর্তমান লক্ষণ আছে। এক—দর্শন ও ধর্মের ভাষার নিয়ত প্রয়োগ, দুই—দেশাত্মবোধ ও তিন—উদারমত। এই তিনটি নিদর্শন কিন্তু আমাদের ইতিহাসের মর্মকথা ব্যক্ত করে না। বরঞ্চ গোপন করে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, কংগ্রেস ও শিক্ষিত সমাজ এই গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক।... একদিকে ভারতের ইতিহাস এখনও লিবারেল যুগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসার তাগিদে যে অধিরাজ্য বা ইম্পিরিয়ালিজম্ তৈরী হয় তারই ফলাফল আমাদের সকলকে ভোগ করতে হচ্ছে।" আমাদের দেশের "বৈশিষ্ট্য হল বিংশ শতাব্দীতে জীবনধারণ করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযোগী জীবনধারণের উপায় অবলম্বন করা।" এ মন্তব্যাবলী আজও বাতিল হয় না।

ইতিহাসের তিন নম্বর প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ সরাসরি চলে আসেন 'শ্রেণী'-র তাৎপর্য বোঝাতে। শ্রেণীকে তিনি একটি প্রত্যয় হিসাবে দেখতে চান যার সাহায্যে "অতীত, বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সুব্যবস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সুসম্পূর্ণ করে। এই হিসাবেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রকৃত দর্শন।" "শ্রেণী বললেই দুটো মানসিক অবস্থা সূচিত করে।" মানসিক অবস্থা শব্দ দুটি থেকেই বোঝা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ শ্রেণীচৈতন্যকে বড় করে দেখেন। "একাধিক পণ্ডিতের মতে

শ্রেণীপ্রত্যয়ের কোনো সার্থকতা নেই, কারণ সেটিকে জাতিভেদের জাতি (caste), ব্যবসায়ের বৃত্তি (vocation কিংবা profession) ও শিল্পজীবিকা (craft) থেকে পৃথক করা যায় না। এই মতকে গ্রাহ্য করতে আমি অনিচ্ছুক।" কেন মানেন না, তাও ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন। ভারতীয় সমাজতত্ত্বে, সামাজিক নৃতত্ত্বে আজও জাতিবর্ণের পরিপ্রেক্ষিত কতটা দাপটে চলছে তা Louis Dumont-দের রচনাবলী পড়লেই বোঝা যায়, আঁন্দ্রে বেতেই-এর মত সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক ইদানীং শ্রেণীপ্রত্যয় ব্যবহার করছেন ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের বিশ্লেষণে। শুধু তাই নয়, মার্কসীয় বীক্ষার বিপরীতেই যেন ম্যাক্স হেবারকে খানিকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে—যেখানে প্রফেশন, স্ট্যাটাস ইত্যাদির প্রসঙ্গে হেবারকে বিকৃত করে আনা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ধূর্জটিপ্রসাদ যে স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় রাখেন তার মূলে তাঁর ক্রমঅর্জিত মার্কসীয় বীক্ষা। শ্রেণী বলতে তিনি বোঝেন, "(১) উৎপাদন-শক্তিকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘ গড়ে ওঠে, (২) ইতিহাস-নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক একটি জনসঙ্ঘের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, উৎপাদনটি সামাজিক ব্যাপার এবং সম্পর্কটি রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণতঃ স্থিরীকৃত ও আইনের দ্বারা অনুমোদিত; (৩) সম্পর্ক স্থাপনের পর সামাজিক শ্রম ও সম্পত্তি ঐ জনসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, পরে সেই বিভাগ রাষ্ট্রের দ্বারা চিরন্তন বলে ঘোষিত হয়। এই প্রকার জনসঙ্ঘকে শ্রেণী বলা হচ্ছে।" স্পষ্টই, রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটিও এই শ্রেণীর প্রত্যয়ে রয়েছে—খুব স্পষ্টভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ এখানে শ্রেণী প্রত্যয়টিকে ও রাষ্ট্রের শ্রেণীগত ভিত্তিটিকে ধরেছেন। এরপরও তিনি বলেন, শ্রেণীর ঘনীভূত হবার উপায় বিরোধ, যে বিরোধের প্রকৃতি মুনাফা ও উৎপাদনব্যবস্থার ওপর একাধিপত্যের বিস্তার। শ্রেণী-সচেতনা ও বিরোধ-সচেতনতা অবশ্যই শ্রেণী গঠনের অপরিহার্য উপাদান। ধর্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রের রীতিনীতি শ্রেণীর উৎপত্তিতে নিশ্চয়ই কাজ করে, তাদের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ধর্মসংস্কারের পার্থক্যে যে সামাজিক বিভাগ হয়, সেটি শ্রেণীবিভাগ নয়। আর অন্যগুলির "ইমারত দৃঢ়, তবে তাদেরও ভিত্তি অর্থনৈতিক মনে রাখা চাই।" ধূর্জটিপ্রসাদের শ্রেণীপ্রত্যয়ে স্পষ্টই প্রতিভাত, ১৯৩৩-৩৪-এর মধ্যেই মার্কসীয় বীক্ষা ও দর্শনকে তিনি সমাজ-সভ্যতার বিশ্লেষণের সারণী হিসাবে অর্জন করেছেন, গ্রহণ করেছেন।

১৯৪০-এর দশকে ধূর্জটিপ্রসাদ সরাসরি মার্কসবাদ বলতে তিনি কি বোঝেন, সে কথা জানান। ১৯৩০-৪০-এর দশকের স্বদেশীয় আলোড়ন, ফ্যাসীবাদের উত্থান ও

বিকাশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংগঠিত হওয়া খুব স্বাভাবিকভাবেই, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু আপেক্ষিক দূরত্ব থেকে সামাজিক মানুষ হিসাবে এসব সম্পর্কেই গভীরভাবে ভাবিত ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তার দিগন্তকে আরও নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি সব থেকে স্পষ্টভাবে বলেন On Indian History, A study in Method (1945)-এ, মার্কসবাদ ও মনুষ্য ধর্ম (বক্তব্য, পৃঃ ২৭-পৃ: ৩৪) প্রবন্ধে ও An Economic Theory for India (Diversities, 1954) শীর্ষক এক উদ্বোধনী ভাষণে।

মার্কসবাদী হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসকে, সে সম্পর্কিত জ্ঞানকে যথার্থই বিশেষ মূল্য দেন। এশীয় জাতীয়তাবাদের ওপর এক প্রবন্ধে (Diversities : pp. 198-204) স্পষ্টই বলেন, "In short, the crisis of the modern age is the crisis in historical knowledge." আর মার্কসবাদী হিসাবে এই আধুনিক যুগের সংকটকে তিনি অনুধাবন করতে চান স্বদেশীয় ইতিহাসজিজ্ঞাসার পটে; দেখেন, "the beginnings of modern Indian historiography were laid in the period of colonial commerce." অথচ "Indian history is Indian culture." (Diversities pp. 121-123) ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসীয় বীক্ষা থেকে এটা বুঝেছিলেন ইতিহাসকে সমাজকে পাল্টানোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ইতিহাস ও সমাজকে, তার ধারা ও গতিপ্রকৃতিকে জানা ও বোঝা। এ পথে আমাদের ইতিহাসচর্চা বড় বাধা—দেশীয় ঐতিহাসিকরা তাঁর কাছে ছদ্ম উকিল ও ছদ্ম কেরানীরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ইতিহাসকে জানার জন্য চাই সঠিক পদ্ধতি। ভারতইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হিসাবে তিনি মার্কসবাদের প্রয়োগ চেয়েছিলেন। সেই পদ্ধতিগত জিজ্ঞাসা তাঁকে নিয়ে যায় মার্কসবাদের নিজস্ব ব্যাখ্যায়, যা ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহ্য নির্মাণের এক সাহসিক প্রচেষ্টা।

ধূর্জটিপ্রসাদ ১৯৪০-এর দশকে স্বীকার করেন, "Very little, in English at least, is available on the operative part of the method actually followed by Karl Marx, Lenin and other Marxists in their historical writings (The difficulty is enhanced in India by the Government ban)"। প্রথমেই বলেন laws of Dialectics বা দ্বন্দ্বের সূত্র যে একশ্রেণীর মার্কসবাদী ব্যবহার করে তা খানিকটা হিন্দুর কর্মবাদের মত—

সব ঘটনা, আচরণ পূর্বনির্ধারিত। ধূর্জটিপ্রসাদ এই নিয়ন্ত্রণবাদ বা নিয়তিবাদকে মার্কসীয় বীক্ষার বিরোধী ভাবেন। অথচ দ্বান্দ্বিক বীক্ষা না থাকলে মার্কসবাদ শৃঙ্খচারী হয়ে পড়ে, এটাও বলেন। ইতিহাসের মতই মার্কসবাদ গতিশীল, কোন বদ্ধ ব্যবস্থা, ডগমা নয়। মার্কসবাদের কোন সতর্ক ছাত্র, কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতাই মার্কসবাদকে ডগমা হিসাবে দেখে না। মার্কসবাদকে গসপেল হিসাবে গ্রহণ করলে মার্কসীয় পদ্ধতিই প্রায় বাতিল হয়ে যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ লেনিনের উদ্ধৃতি দেন, "the limits of approximation of our knowledge to the objective, absolute truth are historically conditional, but the existence of such truth is unconditional and the fact that we are approaching nearer to it is unconditional." এই দ্বান্দ্বিক বীক্ষাটির মধ্যে ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস গঠনের প্রয়োজনীয় সূত্রটি আছে। বস্তুতঃ এখান থেকেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তন্ময়তার, নিরপেক্ষতার মায়ার বাইরে আসা যায়; অতীত পাল্টায় না, কিন্তু প্রতিযুগ অতীতকে নতুনভাবে দেখে, ব্যাখ্যা করে নিজ প্রয়োজনে; অতীতের এক একটি দিক গুরুত্ব পায়, বিশেষভাবে আলোকিত হয়। তখনই পক্ষাবলম্বনের প্রশ্ন আসে—"মানুষেরা তাদের নিজের ইতিহাস নির্মাণ করে, কিন্তু তাদের খুশীমত ঠিক নয়।" "ইতিহাস লক্ষ্যের অনুসরণে মানুষের সক্রিয়তা।" ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিক ইচ্ছাসমূহের সঙ্গে ভৌতিক, প্রযুক্তিগত দিকসহ মানবিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া জড়িয়ে থাকে। বহু লক্ষ্য ও অসংখ্য ব্যক্তিক ইচ্ছার অবস্থিতি কি ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বিচারের বাইরে রাখে? ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, না। এখানেই মার্কসবাদের শ্রেণীপ্রত্যয়ের সার্থকতা। শ্রেণী-লক্ষ্য ও শ্রেণী-স্বার্থের প্রভাবে এই অসুবিধা দূর হয়—"they have a regularity (not recurrence)." এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ধূর্জটিপ্রসাদ সাধারণ মানুষ বা লাইবনেৎসের গড় বস্তুগত প্রেরণার ধারণাকে মানেন না। বলেন, "Marx's subject in History was the whole man, whose integrity was jeopardized by class-divisions and could be restored by their liquidation," অর্থাৎ তিনি জানেন, মূর্ত সমগ্র মানুষই চূড়ান্ত বাস্তব, মানুষই শ্রেণীবর্গ তৈরী করে, আবার শ্রেণীর বিলোপেই তার মুক্তি। এখনকার ই. পি. টমসনরাতো একথাই বলছেন। ইতিহাসে চান্স বা আপতন সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসকে উদ্ধৃত করেন: "Its (world history's) nature would have to be of a very mystical kind

if "accidents" played no role." ঘটনার গতি ত্বরান্বিত ও স্তিমিত হতে পারে এই ধরণের accidents-এ মার্কস উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন আন্দোলনের নেতৃত্বে যে সব ব্যক্তি, তাদের চরিত্র। আর মার্কসবাদীর কাছে প্রকৃতি বিশুদ্ধ ভৌত ভূগোলের প্রকৃতি নয়, মানবিক ভূগোলেরই কাছাকাছি। প্রকৃতি "বস্তু" উৎপাদনেরই অন্তর্ভুক্ত, মার্কসের কাছে প্রকৃতির বিধি আসলে প্রকৃতির সামাজিক বিধি। এভাবেই, ধূর্জটিপ্রসাদ দেখান ইতিহাস, অন্ততঃ মার্কসবাদীর কাছে এক ধরণের 'বিজ্ঞান'।

ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যায় মার্কসীয় পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত, "is the recognition of the fact of crisis which marks the beginning no less than the end of an epoch." স্পষ্টতঃ, মার্কসের উদ্ধৃতি দিয়ে, ধূর্জটিপ্রসাদ গুরুত্ব দেন, ভাবগত রূপকে—"ideological forms in which men become conscious of the conflict and fight it out" ন্যায্যতই তিনি মার্কসের ফ্রান্স বিষয়ক রচনাবলীকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেন, গুরুত্ব দেন ব্লাখ ও মেহরিং-কে লেখা এঙ্গেলস-এর চিঠি দুটিকে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে মার্কসীয় বীক্ষার একটি মূল সূত্র, এ কথা মানেন ধূর্জটিপ্রসাদ। মার্কসের রচনাবলীতে মেটেরিয়াল ও কণ্ডিশনস-এর ধারণা দুটি কিন্তু ইকনমিক ও ফোর্সেস-এর সমার্থক নয়। সংঘাত বা দ্বন্দ্বও কোন দার্শনিক ধারণা নয়, মানবিক ও বস্তুগত অর্থাৎ সামাজিক ও ঐতিহাসিক। একটু শিথিলভাবে বলা যায় দুটি শ্রেণীর বিরোধী ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদে আর একটি বিরোধ-বৈপরীত্যর দৃষ্টান্ত পান: নগর ও গ্রামের। ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত দেন "The whole economic society is summed up in the movement of this antagonism." এই বিরোধটি সাধারণত মার্কসবাদীরা উপেক্ষা করেন। এরপর ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসীয় পদ্ধতি কেন বৈজ্ঞানিক সেটি প্রায় সূত্রাকারে জানান: (ক) ধারণাগত বিমূর্তিকরণ মার্কসবাদ এড়িয়ে চলে। (খ) কোনরকম যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক মার্কসবাদ মানে না। (গ) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অনুধাবনে মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক—সামাজিক প্রক্রিয়া ও গতিই মার্কসের কাছে মূল বিষয়। (ঘ) নির্দিষ্ট প্রবণতা মার্কসবাদ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়, যে প্রবণতার সাহায্যে প্রক্রিয়ার গতিপথের ইঙ্গিত দেওয়া, তার গভীরতা ও গুণ বিচার করা যায়। (ঙ) ব্যবহারিক, অভিজ্ঞতালব্ধ ও কারণ-কারকীয়তার ওপর জোর দেয় মার্কসবাদ। ঐতিহাসিক যুগের ও যুগান্তের বিশেষ, নির্দিষ্টতা মার্কসবাদে গুরুত্ব পায়। Specificities of epochs মার্কসীয় বীক্ষার একটি

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর এক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ পুরোপুরি Karl Korsch-কে অনুসরণ করেন। Korsch মার্কসীয় পদ্ধতির সারসত্তা হিসাবে দেখেন, "the principle of historical specification."

মার্কস যে ভ্যালু বা মূল্য সম্পর্কে এত মনোযোগ দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর পূর্বসূরীরা মূল্যকে সর্বকালীন সত্যের এক বর্গ হিসাবে দেখেছিলেন। মার্কস বললেন, মূল্য ধারণা বিমূর্ত ঠিকই, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বিমূর্ত, সুতরাং সমাজের একটি ডিটারমিনেট বা সীমিত নির্ধারিত অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তিতেই এই ধারণা করা যায়। দি পভার্টি অব ফিলজফিতে মার্কস রিকার্ডোর সম্পর্কে এই আপত্তিই তোলেন যে রিকার্ডো খাজনা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে বুর্জোয়া উৎপাদনকে দেখে খাজনার ধারণাকে সর্বকালে ও সর্বদেশে প্রয়োগ করেন। বস্তুতঃ "নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশ"-ই বস্তুকে পণ্য করে, বিনিময়ের রূপ ও বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে, বিভিন্ন ধরণের অর্থ ও তাদের সামাজিক ভূমিকার কারণ হয়। মূলধনের বিশ্লেষণে মার্কস এই হিস্টরিকাল স্পেসিফিসিটি বা অনন্যতাকে সমধিক গুরুত্ব দেন প্রত্যক্ষে-প্রচ্ছন্নে—একটি ঐতিহাসিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে মূলধনের নানাদিক দেখেন (Capital for trading in goods, Capital for trading in money, Capital for lending money)। ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে একটি আর একটিতে রূপান্তরিত হয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তন এগনোর সঙ্গে। এই রূপান্তর ঐতিহাসিক, কোন ঐতিহাসিক রূপই উধাও হয়ে যায় না, চিহ্ন থেকে যায়। রাশিয়ার ধনতন্ত্রের ইতিহাসে ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে লেনিন এই মার্কসীয় পদ্ধতি অসাধারণভাবে অনুসরণ করেছেন বলে ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন। মার্কস কোন জায়গাতেই নিজেকে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক হিসাবে দেখেন নি। কোন দেশের আর্থনীতিক ইতিহাসের বর্ণনাত্মক বিবরণ দেওয়া তাঁর এঙ্গেলস-এর উদ্দেশ্য ছিল না—এঙ্গেলস-এর পিজ্যান্ট'স ওয়র ও অরিজিন অব্ দি ফ্যামিলি সমকালের জন্যই অতীতে যাওয়া। এডমণ্ড উইলসন যে মার্কসকে "পণ্যের কবি" বলেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদের সেটি খুব পছন্দ। পরিবর্তনে মার্কস বিমূঢ় হন না, নির্মাণ করেন "Chart of the currents"। মার্কসের রচনার মত আর কোথাও নতুন বৌদ্ধিক আবিষ্কারের উত্তেজনা পাঠক অনুভব করে না।

এ পর্যন্ত ধূর্জটিপ্রসাদ স্পেসিফিসিটির ব্যাখ্যায় Korsch-কে অনুসরণ করেন।*

* এই স্পেসিফিসিটির ধারণা শিল্পের ক্ষেত্রেও সাহসিকতার সঙ্গে প্রযুক্ত হচ্ছে। জর্জ লুকাচের নন্দনচিন্তা তার উদাহরণ। এদেশে ধূর্জটিপ্রসাদ করেন।

Korsch স্তালিনীয় যুগে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর হেগেলীয় উত্তরাধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ যান্ত্রিক মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রবক্তাদের দ্বারা নিন্দিত Korsch যান্ত্রিক মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে লেনিন ও কাউটাস্কি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৬০-এর দশকের মার্কসবাদ সম্পর্কে নতুন যে চেতনা ও আগ্রহ জাগে তাতেই তাঁর রচনার পুনর্মুদ্রণ হতে শুরু হয়। বলাই বাহুল্য ধূর্জটিপ্রসাদ লেনিনের সমালোচক ছিলেন না, তিনি লেনিনকে মার্কসবাদের যথার্থ নায়ক হিসাবেই দেখেন। এমনকি স্তালিন সম্পর্কেও বলেন, তিনি has forged ahead of Lenin in regard to planning, peasantry and nationalities অন্যদিকে মাও সম্পর্কে মন্তব্য করেন, মাও has struck a hitherto unidentified vein of Marxism in the organization of country which is simultaneously at all levels of material development. এমতাবস্থায় Korsch-কে মার্কসবাদের ঐতিহ্যে গ্রহণ যথেষ্ট মুক্ত মনের পরিচায়ক। ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসের যুগান্তকারী দর্শন ও বীক্ষা, প্র্যাকসিসের বহুমাত্রিক পরম্পরাকে, শত পুষ্পের প্রস্ফুটনকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন —পুরোমাত্রায় স্তালিন আমলে, স্তালিনের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও, অন্যচিন্তার অন্য ধারার মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করতে ভয় পান নি। এই মুক্ত মন ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহ্য নির্মাণে বড় সম্পদ—ভারতবর্ষের বাস্তবে মার্কসবাদকে মেলাবার প্রাথমিক উপাদান। আসলে স্তালিনীয় ডগমাকে তিনি মেনে নেননি।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাই ক্রোচের ধারণা, সব ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস, মার্কসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। ক্রোচের ভাববাদের কথা তিনি জানতেন না তা নয়, কিন্তু গ্রামসির ক্রোচের ওপর লেখা পড়লেই স্পষ্ট হয়, ক্রোচে কেমন প্রারম্ভ-সূত্র হতে পারেন মহান মার্কসবাদীর ক্ষেত্রে। মার্কসের তাঁর সময়কার ঘটনাবলী সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ উৎসাহের কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন। মার্কসের, এঙ্গেলসের জীবন্ত সময়ের সম্পর্কে উন্নত চেতনা স্পেসিফিকেশনের বড় দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড ও রাশিয়া সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণীর কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন—ইংলণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব সংগঠিত হবার ও রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটবার সম্ভাবনার কথা মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই বলেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় জাতিসমস্যার সমাধান যেভাবে করা হয়েছিল, তাতেই স্পেসিফিকেশনের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি জাতিকে ভাগ করা হয়েছিল, তার বাস্তব উন্নতির স্তর অনুযায়ী—যুদ্ধের মধ্যে এই জাতিরা যেভাবে

ঐক্যবদ্ধ হয় তাতেই প্রতিটি জাতির স্পেসিফিকেশনের সম্পূর্ণতা বোঝা যায়, অথচ তারা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।..."the political military and cultural forms making up the specification are in their structural pattern only the conditions and relations of material production." এই মেটেরিয়াল প্রোডাকশনের ওপরই পার্থক্য ও ঐক্য নির্ভর করে। সুতরাং জাতি-সংস্কৃতি ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান নির্ভর করে ইতিহাসের সেই বীক্ষার ওপর যে বীক্ষা ভাববাদী ও যান্ত্রিক-জড়বাদী বীক্ষা থেকে আলাদা। ধূর্জটিপ্রসাদ স্পেসিফিকেশন অর্থে এঞ্জিনিয়াররা কণ্ট্রাকটরদের জন্য যা বোঝেন বা ম্যাক্স হেবারের মত টাইপসজিস্টরা টাইপ বলতে যা বোঝেন, তা বোঝেন না। ফিকটেরা স্পেঙ্গলারের রোমান্টিক ও হতাশ জীবনদর্শনের ব্যাপারও এটা নয়। মার্কসীয় পদ্ধতি এদের ত্রুটিগুলিই দূর করে—"We know too well the defects of these schools ; their undefined types, the neglect of cross-types, the arbitrary assumptions in regard to the constituent elements of types and the 'intuitive' understanding of their genius spirit etc, their susceptibility to interpretation in the light of the motive for perpetuating vested interests by the powers themselves, who alone can interpret the 'soul' of the type and do so to curb opposition and change, their inability to form a world picture in any sense other than the cyclical and the repetitive etc etc." মার্কসীয় "বস্তু" সামাজিক-ঐতিহাসিক অর্থে, "সম্পর্ক"কে নিয়ে। মার্কসবাদের "quality of emergence" আছে যাতে ধারাবাহিকহীনতা জড়িত। আবার পুরনো আকারের সদৃশও মনে হতে পারে। পরিবর্তন ও সমালোচনা নিয়ে মার্কসীয় বীক্ষা সক্রিয়বাদী। যে অগ্রগতির কথা এ বীক্ষা বলে তা বৈখিক নয়। সাম্যবাদ, মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে কোন সদর্থক বিবৃতি নয়, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বা অনুসন্ধানের উপায় অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক উপায়ে অসম গতি, অন্যান্য পরিস্থিতি ও প্রত্যাবৃত্তিকে স্বীকার করা। মার্কসের কাছে ধনতন্ত্র সমসাময়িক প্যাটার্ন—এর প্রযুক্তিবিদ্যা, শ্রেণী-সম্পর্ক, মূল্য-মুনাফা সম্পর্কে ধারণা, ভাবাদর্শ—প্রলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন নিজস্ব চিন্তার স্বাবলম্বনে : লেনিন, Korsch বা আরও অনেকে তাকে সাহায্য করেন, কিন্তু

ভারতীয় হিসাবে তিনি মার্কসবাদকে দেশ-কালের পটে, ভারতীয় ইতিহাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জন করেন : সচেতন এই অর্জন। ১৯৪০-এর দশকের এই পরিগ্রহণ এতই মৌলিক যে আজ ১৯৬০-৭০ দশকের মার্কসবাদের চর্চার নবজাগরণেই তাঁর বিশ্লেষণ,—মার্কসীয় বীক্ষা যথার্থ প্রাসঙ্গিক হয়। বিস্ময়ের, আমাদের দেশের মার্কসীয় ভাবনার যান্ত্রিকতায়, পরনির্ভরতায় ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় নিঃসঙ্গ ভাবেই এই কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। দুহাতে সরাতে চেয়েছিলেন মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা। "মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম" শীর্ষক আলোচনায় প্রথমেই তিনি বলেন, "মার্কসবাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দুটি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য : (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের অবকাশই মিলবে না, এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি।" এই দুটি উত্তরের সারবস্তা মেনেও ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হয়, "এই ধরণের উত্তর নঙর্থক, ধনতন্ত্রে মানুষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্কস-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায়না।" তিনি 'ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে' দেখতে চান। "বর্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ সুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য লাগে। এই থেকেই মনুষ্যধর্মের আরম্ভ।···এই Scepticism—সন্দেহবাদের সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্ববিচারের সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্কসবাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে।" সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব অনেকদিন চলে—এর ফলে মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র এটা যেমন বোঝা গেল, তেমনি আবার প্রকৃতিসমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। অনন্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ পেল ভয়, রেনেসাঁসে এই মানুষের এই সঙ্কুচিত হওয়ার দিকটায় ধূর্জটিপ্রসাদ অঙ্গুলি সঙ্কেত করেন। প্রশ্ন উঠল এবার প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কি করে মুক্ত হবে। অঙ্কশাস্ত্র ও তার অধীন সবরকম বিদ্যার সাহায্যে মানুষ এর উত্তর খুঁজল, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেল। এর বিপক্ষে, অবরোহী-বিদ্যার প্রতিপক্ষে মাথা তুলল জীববিদ্যা। জীববিদ্যার উদ্দেশ্যবাদ সমাজ-বিশ্লেষণে উন্নতিবাদকে নিয়ে এল। কিন্তু নতুন বিপদ ঘটল—প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু নৌকোয় পা—কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না এগোলে কেবল বর্ণনার জঞ্জাল। সেই পুরনো তর্ক—বিশেষ বড় না সাধারণ বড়। কেউ ইতিহাস-সমাজ বিদ্যাকে বিজ্ঞানের মত করতে চাইল,

কেউ সাহিত্যের মত। প্রত্যেক মানুষসংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিয়ম তৈরি করল, আবার দাবি জানাল তাদেরটাই একমাত্র নিয়ম। এর ফলে অকারণ তর্ক, হাহুতাশ। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, "দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্কসবাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ, অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা সে কেবল মানবপ্রকৃতিই নয় জড়প্রকৃতিরও নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে এবং নিজের মত ভেঙে-গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিকাস কার্টেসিয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে।" মার্কসবাদ, তাঁর কাছে, হুম্যান জিয়োগ্রাফীর সঙ্গে যুক্ত। অন্ধনিয়তি ও আকস্মিকতা, দুইকে এড়িয়ে "অসীমের বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয়ে মার্কসবাদী আপনার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারে।" আরোহী যুক্তিপন্থার সঙ্গে অবরোহী যুক্তিপন্থার মিশ্রণ ঘটেছে এই বীক্ষায়। এর মূল কথা, জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষচর্চা, এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্তন। মার্কসবাদে বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খানিকটা মিটেছে। মার্কসবাদী ইতিহাস ন্যাচারাল হিস্ট্রী থেকে পৃথক। এর উন্নতিবাদ অজানিত উদ্দেশ্যে চালিত নয়। মানুষের চেষ্টার ওপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মার্কসীয় মানবতা স্টোয়িকদের মানবতার মত আত্মকেন্দ্রিক নয়, ভারতীয় মানবতার আত্মচর্চাও নয়, নয় রেনেসাঁস যুগের শেষভাগের খাপছাড়া, মুনাফালোভী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মার্কসবাদের কেন্দ্র মানুষ, তবে এ মানুষ মাত্র ব্যক্তি নয়। মার্কসবাদের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ একটি মানব-গোষ্ঠীর মারফৎ—সেই গোষ্ঠী প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে ব্যক্তি পদার্থটি প্রকাণ্ড বিমূর্তভাব, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে, ভারতীয় চিন্তা ও সমাজের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ। "সুতরাং ব্যক্তিত্বের নামে মার্কসবাদের বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধনিকদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের।" মার্কসবাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয়।

যদিও ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসকে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক হিসাবে দেখেন না তথাপি ভারতবর্ষের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্বের সন্ধানে তিনি মার্কসবাদের কাছেই যান। এর মূল কারণ মার্কসীয় স্পেসিফিসিটি, যার আলোচনা আগেই করা হয়েছে—In

Marxism each epoch is specific; and its specificity is responsible for its adequate concepts. মার্কসবাদের বিশ্লেষণের বাস্তবতা ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকের কাছে চ্যালেঞ্জস্বরূপ, এঁরা একে উপেক্ষা করেছেন—এ অভিযোগ ধূর্জটিপ্রসাদ স্পষ্টভাবেই করেন। শ্রেণীর সামাজিক প্রত্যয়টিকে ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ইতিহাসের এলিয়েনেশন-এর সমগ্র প্রক্রিয়াটিই মার্কসবাদের পাঠের বিষয়, ডি-এলিয়েনেশনের জন্যও কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা মার্কসবাদ বলে। মার্কসবাদের পাঠ তাই ভারতীয়দের কাম্য, অবশ্যই অন্ধ প্রয়োগ নয়। কারণ অন্ধ প্রয়োগ মর্যাদা-হানিকর।

ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, অর্জন করেছিলেন ভারতীয় হিসাবে। ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মার্কসবাদকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। এমনকি মার্কসীয় মনুষ্যধর্মের সন্ধানও তিনি ভারতীয় হিসাবেই করেন। এদিক দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতবর্ষে মার্কসীয় ঐতিহ্য নির্মাণের অন্যতম প্রধান প্রথম ব্যক্তি। এ মার্কসবাদ যান্ত্রিক নয়, ডগমা নয়, এ মার্কসবাদ শ্রেণী ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সূত্রে, ঐতিহাসিক বিশেষ যুগের নির্দিষ্টতার চেতনায় ভবিষ্যৎমুখী। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষার সমগ্রকে, টোটালিটিকে ধূর্জটিপ্রসাদ সবিশেষ গুরুত্ব দেন, যেমন দেন শ্রেণীর মিডিয়েশনকে। বস্তুতঃ এ সমগ্রের বোধের জন্যই ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদকে গোটা ঐতিহ্য হিসাবে পেতে পারেন। তাঁর পরে বা জীবৎকালেই মার্কসীয় পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ভারতবর্ষে এসেছেন, কিন্তু ঐ সমগ্রর চেতনা অধিকাংশর নেই, হয়তো নাম করা যেতে পারে কোশাম্বীর। ১৯৪৬-এর নিউ হিউম্যানিজম নামক প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদই এই সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় রাখতে পারেন: "Surrealism in art, nation-state in politics, race in anthropology, protectionism in economics, elan vital in philosophy, mutation in biology, indeterminism in physics and mysticism in religion were blood brothers. They belonged to the breed of the unconscious." একজন ব্যক্তি জ্ঞানের কামরা-করণে, খণ্ডীভবনে বিশ্বাসী না হলেই, সমগ্রের প্রক্রিয়ায় আস্থা রাখলেই, একই ঐক্যদৃষ্টি পান, আর ধূর্জটিপ্রসাদ এটা নির্মাণ করেন মার্কসবাদী প্রস্থান থেকে। মার্কসবাদী হিসাবে ইতিহাসের সচেতন ছাত্র ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের প্রভেদ মানতেন না, একথাও স্বীকার করতেন না মার্কসবাদ সমাজতত্ত্ব বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব,

সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই তিনি মার্কসবাদে দেখেন। মার্কসবাদ বিজ্ঞান মানতেন, কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানের অর্থে নয়, সব রকম বৌদ্ধিক বা ইনটেলেকচুয়াল কার্যাবলীই প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনুগত হবে, এটা ভাবার কারণ তিনি খুঁজে পান নি। তেমনি দ্বান্দ্বিক মার্কসবাদকে শক্তির ভারসাম্যের যান্ত্রিক তত্ত্বে পরিণত করায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। আসলে যাকে সমাজের উপরিকাঠামো বলা হয় তার সঙ্গে ভিতে অবস্থিত অর্থনৈতিক শক্তি সমূহের সম্পর্ক বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ উৎসাহী ছিলেন, এই জটিল সম্পর্কের অনুধাবনে তিনি জ্ঞানের বিষয়ের সীমা মানেন নি। নিজেই লিখেছেন, ' In Bengali, I am taken as one interested in literature and music, in other parts of India I am treated as a sociologist and an economist " কিন্তু ধর্জটিপ্রসাদের জগৎ মার্কসীয় সমগ্রে এমনই বিধৃত যে এসবই একটি কেন্দ্র থেকে জাত। রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর অনবদ্য বইটি (Tagore— a Study, 1943) পড়লেই বোঝা যায়, সবকিছু কেমন একটি ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিতে বিধৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সমগ্রভাবে ও সমগ্রের বিকাশ হিসাবে দেখেন। "the dialectic of unfolding and discovery" তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টই জানান, "the work of a great artist, however 'mutative' it is, has to be ultimately socially selected and socially appraised." রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তিনি দেখেন ডায়ালেকটিকস। রবীন্দ্রনাথের জীবনের রূপরেখা আঁকতে গিয়ে প্রথমেই ধূর্জটিপ্রসাদ বলে নেন "Tagore was a product of his times and his environment; he sought to refashion them in the light of his understanding; and the interaction was a valuable strand in the culture process of modern India " এই প্রক্রিয়া দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনায় আলোকিত, পরিবর্তনে বিচলিত (১৯৪৩-এর অভিজ্ঞতা স্মরণে রাখতে হবে)। এই পরিবর্তনময় প্রসঙ্গই রবীন্দ্রনাথ পাঠের যথার্থ পটভূমি। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে শুধু তাঁর পটভূমি-জাত হিসাবে দেখেন না—একজন মহৎশিল্পীর নিজস্ব ডায়ালেকটিকস-এর বিকাশের সূত্রেও বিচার করেন। সেকারণেই তাঁর সামান্য বেশী একশ পৃষ্ঠার বইটি উপনিষদ, বঙ্গীয় জাগরণ, ভাববাদ, শ্রেণীদৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা হয় না, এ সবের উল্লেখ থেকেও রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তির, ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় পুরুষের সৃষ্টিময়তা বস্তুবাদী বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায়। আজও বইটির প্রকাশের চল্লিশ বছর পরেও, রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি বই যদি কাউকে পড়তে দিতে হয়, মহাশিল্পীকে অনুধাবনের জন্য, তাহলে এই বইটিই তুলে দিতে হয়, যদি ধূর্জটিপ্রসাদের কোন কোন অভিমত গ্রহণ-

যোগ্য নাও হতে পারে। উপন্যাসের সামাজিক সমস্যা বা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতেও ধূর্জটিপ্রসাদ সমান সতর্কতায় তাঁর মার্কসীয় মুক্তমনের প্রয়োগ করেন।

অবশ্যই ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদচর্চায় প্র্যাকসিস ছিল না, যে কারণে তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলতে চাইতেন না। নিজের জীবনাচরণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "First books, then ideas, and lastly experience—that has been my way" অনেক মার্কসবাদী উল্টো প্রক্রিয়ায় এগোন—কিন্তু আমাদের দেশে শুধু অভিজ্ঞতার স্তরেই অনেকে আটকে যান, তাকে বাঁধতে পারেন না কোন বীক্ষার ধারণায়-আদর্শে, পঠনের পরিশ্রমে। ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার পথে যাত্রার পথটি তাই আমাদের দেশের "স্পেসিফিক" অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ—বিশেষতঃ তাঁর মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে। ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ জড়িত না হওয়ায় নৈর্ব্যক্তিকতার সুবিধার কথা বলেন, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার কথাও তোলেন যাতে সবদিকের দোষগুণ বিচার করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই জানিয়ে দেন, "The line between static and dynamic neutrality is chiefly a matter of action and goal, but for the intellectuals it is a matter of high discrimination and clarification of the goal, and ultimately, of choice." ১৯৫৫-র এই প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে তাদের ভূমিকা, কাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রত্যাশা করা, এখনই যায় না, কিন্তু বিরাট বাধা সত্ত্বেও তারা সচেতন হবে, আশা করা যায়। ১৯৫৫-র দশকে দাঁড়িয়ে বলা যায়, ধূর্জটিপ্রসাদের এ আশা বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু তাঁর ভারতীয় মার্কসীয় প্রাতত্ত্ব নির্মাণের সাহসিক, স্বাবলম্বী প্রচেষ্টা এই দায়বদ্ধতার দিকেই ঠেলে দেয়—বুদ্ধিজীবীর দুর্বলতা ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন অথচ বুদ্ধিজীবীর অহংকার থেকে দূরে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রায় নিঃসঙ্গ সংগ্রাম ভারতীয় বাস্তবকে মার্কসবাদের আলোয় অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় উজ্জ্বল, সব ভারতীয় মার্কসবাদীর কাছেই তিনি এক পরম্পরা, বর্তমানের রিক্ত বুদ্ধিজীবী মরুপ্রান্তরে এক উজ্জীবনী দৃষ্টান্ত, যদিও আজকের ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে তাঁর উপন্যাসের খগেনবাবুর মতই ভাবতে ইচ্ছা করে, "এ-দেশে এ-সমাজে এ-যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কী দোষ করেছে, ধরা পড়েছে বিষ।" খানিকটা আত্মজৈবনিক অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনার খগেনবাবুর যন্ত্রণায়, তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতাতেই কি ধরা পড়ে না ধূর্জটিপ্রসাদের দায়বদ্ধ যন্ত্রণার আগুন, যার মধ্যেই বাঁচবার মন্ত্র লুকিয়ে থাকে?

ধূর্জটিপ্রসাদ: প্রগতিশীলতা বনাম রক্ষণশীলতা

দেবী চ্যাটার্জী

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে সুপরিচিত একটি নাম হলেও, সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত। দেশ-জোড়া খ্যাতি তিনি খুব সম্ভব চাননি, পানওনি। তার জন্য তিনি কোন আক্ষেপ করেননি। বিবিধ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদির মাধ্যমে। অর্থনীতির অধ্যাপনা তাঁকে অর্থনীতির গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখেনি। জীবনকে তিনি সামগ্রিকভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই হাত বাড়িয়েছিলেন অর্থনীতির গণ্ডির বাইরে— সমাজতত্ত্বের দিকে, ইতিহাসের দিকে, এমনকি সাহিত্য ও সঙ্গীতের দিকেও।

বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি বা আইনবিদ্যা মানুষের তথা সমাজের আংশিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে—কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক চিত্র পরিবেশন করায় ব্যর্থ হয়। সমাজকে জানার জন্য মানুষকে চেনার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদ তাই নির্ভর করেছিলেন সমাজতত্ত্বের উপর। সমাজতত্ত্বের পঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি তাই মন্তব্য করেছিলেন: "I strongly plead for the study of sociology at this crisis of humanity Politics, economics, jurisprudence have taken man piece-meal, split up the social processes and halted them." [ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, **Views and Counterviews**, দি ইউনিভার্সাল পাবলিশার্স লিমিটেড, লখনৌ, ১৯৪৬, পৃঃ ১০]।

মানুষের প্রতি ও সমাজের প্রতি একটি সহজাত মমত্ববোধ ধূর্জটিপ্রসাদের বিভিন্ন রচনায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের চিত্র তাঁকে পীড়া দিত। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করবে—একে অন্যের পদদলিত হয়ে নয়। একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন মনে ধরে রেখে বাস্তব সমাজের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ স্বাভাবিক ভাবেই হতাশ বোধ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি মার্কসীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং জীবনের প্রান্তভাগে তিনি নিজের পরিচয় দেন 'মার্কসোলজিস্ট' হিসাবে। যদিও ১৯২৪-এ প্রকাশিত

Personality and the social sciences গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, 'সমাজতান্ত্রিকরা তাত্ত্বিক হিসাবে ব্যর্থ' (socialists fail as theorists), পরবর্তীকালে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁর পরিবর্তিত চিন্তাধারা প্রকাশ পায় ১৯৪৬-এ প্রকাশিত তাঁর **Views and Counterviews** গ্রন্থে যেখানে মার্কসবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লেখেন :

"His materialism is not the materialism of the sensualist or of the mechanist-scientist, its pronounced idealism is better grounded upon the facts of life and the laws of living than the idealism of academies ; its stress on science is one of the best correctives to the debilitating transcendentalism of the Indian ; its democracy, yes Marxism is along some of the best democratic traditions of the Greek, the French and the British political thought, is fuller than the democracy of any of the previous forms ; its civic sense is the fruit of fraternity..." [পৃঃ ১৫৭-৮]।

আরো কিছু বছর পরে, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে, মার্কসবাদ-এর ওপর আস্থা রেখে তিনি বলেন : "হ্যারী পলিট যাবে, রজনী দত্ত যাবে, কিন্তু মার্ক্সিজম্ যাবে না—আণবিক যুগেও নয়।" [মনে এলো, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র, ১৩৬৩, পৃঃ ১১৫]। ভারতবর্ষে মার্কসীয় চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ধূর্জটিপ্রসাদ একটি শুভ ইঙ্গিত হিসাবেই গ্রহণ করেন, "...when Marxism has come to India, who can be unhappy but those who want to keep India as she has been—an etherised patient on this huge operating table." [**Views and Counterviews,** পৃঃ ১৫৭]।

কিন্তু মার্কসবাদকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করতেও ধূর্জটিপ্রসাদ পারেন না। তাঁর মানসিকতা দ্বিধা বিভক্ত থেকে যায়। প্রকট হয়ে দেখা দেয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর স্বাভাবিক মানসিক দ্বন্দ্ব, যা ধূর্জটিপ্রসাদকে দোদুল্যমান রাখে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার মাঝে। তাই আমরা দেখি মার্কসবাদের নানাবিধ প্রশংসা করেও মার্কসবাদ থেকে দূরে থেকে যান তিনি। মার্কসবাদকে গ্রহণ করার অক্ষমতার কারণ হিসাবে লেখেন যে তিনি—'**Not yet convinced of the univer-**

sality and infallibility of any Ism, [ঐ, পৃঃ ১৫৯]।

ভারতীয় মার্কসবাদীদের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ধূর্জটিপ্রসাদকে সন্তুষ্ট করেনি। নানা প্রশ্ন তাঁর মনকে পীড়া দিত। 'সামন্ততন্ত্র', 'ধনতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দের যে ব্যবহার ভারতীয় মার্কসবাদীরা করে থাকেন তা তাঁর মনঃপূত হয়নি। তিনি মনে করতেন, সে শব্দের ব্যবহারে আবেগ ধরা পড়ে, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গি অবহেলিত থেকে যায়। সামন্ততন্ত্র তো সব দেশে সব কালে এক নয়—সে তারতম্যের স্বীকৃতি কোথায় ভারতীয় মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণে? ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করতেন সমস্ত বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ যদি মার্কসবাদের ছকে ফেলে মেলানো সম্ভব হ'ত তা হলে হয়তোবা ভালই হ'ত, কিন্তু তা যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানে পুরোপুরি ভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করা অবৈজ্ঞানিক। এই যুক্তি প্রদর্শন করে ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে থাকেন। মনে রাখেন না লেনিনের মন্তব্য, মার্কসবাদ একটি 'Dogma' নয়। মার্কসবাদকে মেনে নিয়েও একটি বিশেষ রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে মেনে নেওয়া যায়; তার জন্য মার্কসবাদকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির। তৎকালীন ভারতীয় মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণভঙ্গিতে কোন সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়ে থাকলে ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদকে অস্বীকার না করেও তার প্রতিবাদ বোধহয় করতে পারতেন; কিন্তু না—তা তিনি করেননি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ প্রদর্শন করতে গিয়ে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার শিকার হ'ন। সম্ভবতঃ তাঁর বুদ্ধিজীবী জীবনের প্রারম্ভে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মনে যে দ্বিধা ছিল—যা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর ১৯২৪-এ প্রকাশিত **Personality and the social sciences** গ্রন্থে তা পরবর্তীকালেও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সে গ্রন্থে তিনি শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্বকে ইতিহাসের বিকৃত বিশ্লেষণের ফল বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের জানা নেই শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মতামত পরিবর্তনের কোন কথা। তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন রচনায় মার্কসবাদ সম্পর্কে বহু মন্তব্য থাকলেও শ্রেণীসংগ্রাম—যা মার্কসবাদের মূল ভিত্তি তার সম্পর্কে তিনি নীরব থেকে যান। ফলে স্বভাবতই দেখা দেয় আমাদের মনে এ প্রশ্ন।

একাধারে দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমবেদনা অথচ তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে দ্বিধা—ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় প্রকট ভাবে দেখা দেয়। আন্দোলনের বাস্তবতার মধ্যে সাহিত্যের সৌখিনতা থাকেনা—তাই সম্ভবতঃ তিনি তাকে বারংবার এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। রাজনীতিবিদদের

দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে তাই তিনি শুধু তাদের সমালোচনা না করে রাজনীতিকে পরিহার করেছেন। প্রাতিবুর্জোয়া মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তাই তিনি ঘোষণা করেছেন : "আমি পোলিটিক্যাল জীব নই। কেবল ভাল ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে চাই।" [ঝিলিমিলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃঃ ৫৩]।

একজন সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবীর এই কি শেষ কথা ? রাজনীতি কি জীবনের সঙ্গে, বেঁচে থাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয় ? যে ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতকেও 'integral part of living' মনে করতে পেরেছিলেন, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে এ বিচ্ছিন্ন মনোভাবের পরিচয় দিলেন কি ভাবে ? 'পোলিটিক্যাল জীব' তো কোন পৃথক জীব নয়, মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রামই তো মানুষকে অনিবার্য ভাবে 'পোলিটিক্যাল' বানায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ডায়রীগুলিতে (যা পরবর্তীকালে ছাপা হয় মনে এলো ও ঝিলিমিলি নামে) ভারতীয় রাজনীতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে যে হতাশাবাদের পরিচয় দেন তা ভারতবর্ষসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ধারায় প্রায়শই দেখা দেয়। এ হতাশাবাদ একান্তই 'নেতিমূলক'—নতুন কোন পথের সন্ধান দেয় না। নতুন দিনের লড়াইএ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ না করে হতাশাবাদের শিকার এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন, সাধারণ মানুষের মানুষের মত বেঁচে থাকার আন্দোলন থেকে অনেক অনেক দূরে।

দুঃখ ধূর্জটিপ্রসাদ পেতেন শুধু দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দিকে তাকিয়েই নয়—স্ত্রীজাতির সামাজিক অসম্মানের কথা ভেবেও। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে তিনি তাঁর ডায়রীতে লিখলেন : "মরে গেলে আবার যদি জন্মাতেই হয়, তবে মেয়ে না হয়ে জন্মালেই ভাল। অত কষ্ট, অত অত্যাচার সহ্য হবে না।" [ঝিলিমিলি পৃঃ ৩৩]। কিন্তু স্ত্রীজাতির সামাজিক শোষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে কি তাঁদের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন ? না তিনি তা পারেননি। রমণীকে পুরুষের সমমর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত বোধ করেছিলেন। তাঁর বিচারে "এদের বয়স হলেও কথাবার্তা একটু ছেলেমানুষী" [ঐ]। অন্যত্র স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর অবহেলা আরো প্রকটভাবে দেখা দেয় যখন তিনি বলেন : "আমার জীবনে একটিমাত্র স্ত্রীলোক দেখেছি—ইন্দিরা দেবী।...অন্য স্ত্রীলোক মেয়েমানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ মাত্র" [ঐ, পৃ. ৬৩]। প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব ধূর্জটিপ্রসাদের স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত মানসিকতায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

একদিকে ভারতীয় রমণীর চিরাচরিত কোমল চিত্রটিকে তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং বিবাহকে তাঁদের 'ম্যানিফেস্ট ডেস্টিনি' হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। অপরদিকে রমণীকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখার কথা ভাবতে পারেননি। মনে করেছিলেন পুরুষদের মতই মেয়েদের কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত বাইরের জগতে। [মনে এলো, নিউ এজ, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ২:৮]

জাতিভেদপ্রথার প্রতি ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন প্রদান করায় ধূর্জটিপ্রসাদ সংরক্ষণপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিভেদপ্রথার বিশ্লেষণ করেন বলে সে প্রথার শোষণের ইতিহাস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যে প্রথার অর্থনৈতিক শোষণের ভিত্তি সুবিদিত সে প্রথার সূচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন: It was a great attempt in the sense that it aimed at the solution of racial problem, not by decimating the conquered race, but by relegating it to a definite status by birth in the social hierarchy. [*Personality and the Social Sciences* পৃঃ ৫৫] প্রথাটি এখানে শুধু জাতিগত দিক থেকেই দেখা হয়েছে—তার অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণ নীরব। জাতিভেদপ্রথার অবসানের প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা সম্পর্কেও তিনি কোন মন্তব্য করেন না। যিনি বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষিতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি সামাজিক স্বীকৃতি প্রদত্ত শোষণব্যবস্থা, যা'র অপর নাম জাতিভেদ তার অবসানের ব্যাপারে কোনই দাবী করলেন না। অথচ সাধারণভাবে তো তিনি সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন—যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তিনি সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা'কে সমর্থন জানিয়েছিলেন [লেনিন-রচিত 'সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা'-য় ধূর্জটিপ্রসাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। তবে কি জাতিভেদপ্রথার বিষয়ে সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত তিনি হতে পারেননি? সন্দেহ থেকেই যায়। প্রগতিশীলতার আবরণের নিচে রক্ষণশীল তার অবয়ব যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার যে দ্বন্দ্ব ধূর্জটিপ্রসাদের একাধিক রচনায় প্রকাশ পায় তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষের তথা সমগ্র দুনিয়া'র শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমি স্মরণে রাখা। স্মরণে রাখা প্রয়োজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মমত্ববোধ থাকলেও, একাত্মবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সে বিত্তের প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পারেন খুব কম লোকই—ধূর্জটিপ্রসাদ তো পারেনইনি। ফলে তাঁর প্রগতিশীলতা থেকে গেছে ভাসা ভাসা। তিনি রেখে যেতে পারেননি প্রগতির ইতিহাসের ধারায় কোন স্থায়ী অবদান।

নায়কের ব্যর্থ সন্ধানে ধূর্জটিপ্রসাদ

গুণময় মান্না

সংশয় ॥ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ধরা খুবই মুস্কিল, পিছলে বেরিয়ে যান। 'উল্টা কথা বলা আমার অভ্যাস। অনেক সময় ডিগবাজি খেয়ে পৃথিবীকে দেখতে হয়।' ('আমরা ও তাঁহারা') তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে, তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে দেখতেন: 'অর্থনীতির প্রয়োগে মার্কসীয় পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন।' ('বাঙালী চরিতাভিধান')—হয়তো, কিন্তু সবটাই নয়—'একবার মনে হচ্ছে কার্ল মার্কসের বাণী মর্মে আঘাত করেছে, যদিও আর্থিক স্বার্থের ভেতর দিয়ে আবার দেখছি অত্যাচারী ও প্রপীড়িত দুই-এ মিলে অন্যের ওপর অত্যাচার করছে, সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করছে, ব্যক্তিত্বকে ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা না করে।' (আমরা ও তাঁহারা') আবার, 'কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্য ক্ষেত্রে তো দূরের কথা।' (চিন্তয়সি') নিজের মনের এই গঠন সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ পুরো মাত্রাতেই সচেতন ছিলেন।

> 'সূক্ষ্ম সমালোচনার দৃষ্টিতে আমার মতামতের মধ্যে একাধিক বৈষম্য ধরা পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু সেজন্য আমার চিত্তবৃত্তির গতিকে দায়ী করাই ভাল। মনের প্রকৃতি স্থিতিপ্রবণতার প্রতিকূল।' 'আমার মন গন্তব্যস্থানে এখনও উপস্থিত হয় নি। [হায়, কখনো হবে না] অতএব কোন বিষয়েই আমার মন্তব্য আমার কাছেই শেষ কথা নয়। পরের কাছে ত দূরের কথা। 'অনিশ্চিতের অনুধ্যানে যাঁদের শঙ্কা নেই তাঁরাই আমার সগোত্র।' (ভূমিকা, 'চিন্তয়সি')

তা হোক, অনিশ্চিতের অনুধ্যানে আমরা তাঁর সহযাত্রী হতে রাজি হলেও এক আধটা প্রস্থানভূমি তো দরকার। জানি সেটা আস্ত পাওয়া যাবে না। তবে তাঁর মনের পুনঃপুনঃ ফিরে আসা—যাকে ঝোঁক বা মানসপ্রবণতা বলে, ঠাট্টা করতে চাইলে অবসেসনও বলতে পারেন, তার থেকে দুটো জিনিস হাতে তুলে নেওয়া যায়। একটা হচ্ছে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এটির কথা পরে আসবে।

অন্তর্দৃষ্টি, ঐতিহাসিক দৃষ্টি। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, চিন্তায়ন ও সংস্কৃতির উদয়-বিলয় পরম্পরা তিনি ইতিহাসের বহমান ধারাতে ফেলেই দেখতে চান, যদিও তার প্রবাহকে তিনি যান্ত্রিক অবিচ্ছিন্নতায় দেখেন না, 'আপনার মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী লোকের মুখে আকস্মিকতার দোহাই শুনতে রাজি নই।' ('আমরা ও তাঁহারা') Emergence বা উদ্গতি তিনি স্বীকার করেন, করেনও না। একটা মোটা কথা বলা যায়, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিই তাঁর কাছে গ্রাহ্য, 'আমি ও রকম ভাবপ্রবণ ইতিহাস শোনাব না। আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, আপনাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই শোনাব…' ('আমরা ও তাঁহারা') অতএব তাঁকেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

প্রেক্ষাপট॥ উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁস যতই খণ্ডিত হোক, রেনেসাঁসই বটে। তার যাত্রা শুরু হয়েছিল চিন্তার মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণায়, পরিণতি হয় সমাজবন্ধনস্বীকার্য মানবতার উপাসনা এবং প্রবল আশাবাদের মধ্যে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জীবনচর্যা এবং পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ সীমাহীন লুণ্ঠন জাতিকে নির্মমতম আঘাত করে নতুন চৈতন্যের আলোকে জাগ্রত করেছিল। র‍্যাশনালিজ্‌ম্ বা যুক্তিবাদ এই নতুন আবির্ভূত মানুষের হয়েছিল জীবন-দর্শন। বেকনের আনুগত্য দিয়ে এঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন, তারপর ক্রমে বেন্‌থাম, মিল পেরিয়ে পৌঁছেছিলেন কোমতের কাছে—একই মৌল উপলব্ধির বিবর্তনক্রমে। এদিকে জাতীয় ঐতিহ্য থেকে প্রথম যে দর্শনকে এঁরা টেনে আনলেন, তা হল বেদান্ত। বেদান্তের বস্তুকে নতুন কালের উপযোগী করে এঁরা রূপ দিলেন যুক্তিবাদ, গতি ও বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে। এরই সমান্তরালভাবে—বলা যাক এরই পরিপূরকরূপে দেখা দিল এ যুগের ভক্তিবাদ, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্ব, পরিশোধিত কৃষ্ণচরিত্র এবং রামকৃষ্ণের সমন্বয়-দৃষ্টি, যত্র জীব তত্র শিব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্মকটি এখানে স্মর্তব্য। কিংবা স্মরণীয় যে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণের মণ্ডলী—প্রতি-বিন্যস্ত পরিপূরকত্ব. রামকৃষ্ণ-দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ, ব্রাহ্মকে স্বীকার করে নিয়েই তার পরের কথাটা রামকৃষ্ণ।

এই অনিবার্য অমোঘ প্রক্রিয়াটি কিন্তু সাধিত হচ্ছিল একটি নতুন শ্রেণীর দ্বারা, সেটি হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। এরাই ছিল প্রকৃত অর্থে সমাজশক্তি, প্রগতিশীল, নবসৃষ্টির শক্তি ও আশাবাদে দীপ্যমান, স্ববিরোধের (contradic-

tion) কোনো ম্লানতা তখনও এঁদের স্পর্শ করেনি। কত দিকপাল মনীষীর শোভাযাত্রা এই কালেই—রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সব। এবং সে জ্যোতির্ময়তা সর্বাঙ্গীণতার অভিমুখে উৎসুক। সমগ্র মানব এঁরা খুঁজে বেড়িয়েছেন, হয়ে উঠতে চেয়েছেনও। ভোগে-ত্যাগে, ধনার্জনে এবং ধনৈশ্বর্যের সংগঠনী নিয়োগে, জ্ঞানার্জন ও সৌন্দর্যচর্চায়, পুরাতন সমাজ ভাঙা এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার আগ্রহে ছিলেন এক একটি ডাইনামো, শক্তির উৎস। প্রতি দেশে অনুরূপ লগ্নে এই আশ্চর্য দৃশ্যটিই দেখা গেছে—যখন যূথজীবনের থেকে ব্যক্তি-মানবের নিঃসারণ ঘটেছে, তখনই সেই বিচ্ছিন্নতা বা এ্যালিয়েনেশনের প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো এই সব সম্পূর্ণ মানবের ক্রিস্টালাইজেশন সংঘটিত হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমেই কিন্তু দৃশ্যপট বদলে গেল। বুর্জোআ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হল পুঁজিবাদে। বিদেশি ক্যাপিট্যালিজমের সমান্তরাল, সহযোগী অথচ বিরোধী রূপে দেখা দিল ভারতীয় ক্যাপিট্যালিজম্। আর সেই মুহূর্তে ভারতীয় ক্যাপিট্যালিস্টদের সামনে যে জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিল, সংক্ষেপে তা এইভাবে সাজানো যায় : ক. ইংরেজের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে এবং বাজার কেড়ে নিতে হবেই, কিন্তু শক্তি কম, কাজেই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রতি এদের মনোভাব কখনো নরম কখনো গরম ; খ. ক্যাপিট্যালিজমের অমোঘ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় দৃশ্যপটেই সৃষ্ট হল ছিন্নমূল কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী, যাদের সঙ্গে ভারতীয় ক্যাপিট্যালিস্টদের সম্পর্ক হল একই রকম, সহযোগ ও বিরোধের ; গ. স্ব-শ্রেণীগত অনিবার্য বিরোধ ও সহযোগিতা।

যখন রঙ্গক্ষেত্রে প্রধান তিন শক্তি—ইংরেজ ক্যাপিট্যালিস্ট ও শাসক, ভারতীয় ক্যাপিট্যালিস্ট (১৯৪৭-এর পর এরাই শাসক), এবং ভারতীয় জনগণ (উনিশ শতকে জনগণ শক্তি ছিল না)—যখন এদের সবার সঙ্গেই সবার সহযোগ ও বিরোধের সম্পর্ক, তখন নানা বিভ্রান্তিকর (হাস্যকরও) দৃশ্য দেখা দিতে থাকল। বিশ শতকের প্রথম থেকেই বিপ্লববাদ, আধ্যাত্মিক রাজনীতি, নরমপন্থা প্রভৃতি অজস্র প্রক্রিয়া আবির্ভূত হতে থাকল, যাদের পারমিউটেশন এবং কম্বিনেশনের সংখ্যাও মাথা ঘুলিয়ে দেবার মতো। ভারত ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বাধীন হল দেশ বিভাগের পর, প্রেক্ষাপটে দেখা দিল শ্রমিক-কৃষকের মার্কসবাদী সংগঠন নামের ফের এবং বিভিন্নতা সমেত, সঙ্গে সঙ্গে ঘটল নতুন বুদ্ধিজীবী এলিট সম্প্রদায়ের বিকাশোন্মুখ দৃশ্যমানতা—যদিও উনিশ শতকের সে আত্মবিশ্বাস, আশাবাদ এবং

মুক্তিনিষ্ঠা কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল কখন।

আবর্তনশীল ইতিহাসের এই মঞ্চেই ধূর্জটিপ্রসাদের। ভূমিকা।

শ্রেণীচরিত্র॥ ভূমিকাপালনে চরিত্রের রূপরেখা দরকার। আর ধূর্জটিপ্রসাদের contour বেশ স্পষ্ট—মধ্যবিত্ত বুর্জোআ বুদ্ধিজীবী, জীবনের শেষাংশে একটি মর্যাদায় উন্নীত।

বুর্জোআ বুদ্ধিজীবীর ত্রিশঙ্কুত্ব, সমস্ত সার্থকতা-ব্যর্থতা, আদর্শবাদ-স্ববিরোধ ধর্জটিপ্রসাদের জন্মক্ষণ থেকে শুরু করে সমস্ত জীবনেই প্রতিফলিত। আধুনিক যুগের বাণিজ্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে তাঁর জন্ম ও শৈশব: এ্যাটিচ্যুড বা দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্জটিপ্রসাদের সর্বদাই উপকণ্ঠ-ভাব, sense of belonging, তাঁরই স্বীকৃতিতে, থেকেও নেই। সে কালের এক এলিট ব্যবহার-জীবীর পুত্র। বারাসতের আশেপাশে গ্রামের দৃশ্যপট কিন্তু উন্মুখতা কলকাতার প্রতি। কী রকম ছাত্র ছিলেন?—যদিও ইংরেজি ও সংস্কৃতে প্রথম, তবু প্রবেশিকা পাশ করলেন দ্বিতীয় বিভাগে সম্ভাবনার মাঝখানে খুঁত থেকে গেল না কি। ইংরেজিতে অনার্স, সঙ্গে গণিত আর রসায়ন, রসায়নে আবার ফেল। ইকনমিক্সের এম-এ, আইনের পাঠও নিয়েছেন, পরে সোসিওলজির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তত্ত্ববিদ—বিশ শতকে সমাজসচেতন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী। নেশা সংগীতে, সমঝদারির অপূর্ব দক্ষতা, যদিও তত বড় শিল্পী নন। পেশায় অধ্যাপনা, কর্মস্থল হতে পারত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ছিটকে যেতে হল প্রথমে লক্ষ্ণৌ, পরে আলিগড়ে। প্রবাসী অস্তিত্ব। ঠিক কবি-বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের এ্যালিয়েনেশন, কিংবা অমিয় চক্রবর্তীর মতো, বিশ্বের নগর-পরিক্রমণের পথে যাঁর ঘরে ফেরার হার্দ্য আকুতি। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ১৯৩৮-৪০'এ উত্তরপ্রদেশের ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন হয়েছেন, ১৯৪৭-এ কেন্দ্রীয় লেবার ইনকুইরি কমিটির সদস্য, ১৯৫২তে রাশিয়ায় অর্থনীতি কমিশনের প্রতিনিধি, ১৯৫৩-৫৪ হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ-এ Institure of Social Studies এর উদ্যোগে Sociology of Culture' এর আমন্ত্রিত অধ্যাপক, সর্বশেষ বান্দুং সম্মেলনে এশিয়ার দেশগুলোর আর্থনীতিক সহযোগ সভার সম্মানিত থিওরিস্ট। ধর্জটিপ্রসাদ লেখক, অজস্র না হলেও নেহাৎ কম নয়—লিখেছেন ইংরেজিতে আর্থনীতিক সন্দর্ভ, 'রিয়ালিস্ট', আবর্ত', 'অন্তঃশীলা', 'মোহানা'-র মতো গল্প উপন্যাস, 'আমরা ও তাঁহারা', 'চিন্তয়সি' 'বক্তব্য', 'মনে এলো', 'কথা ও সুর', 'সুর ও সঙ্গতি'-র মতো রম্যার্থদীপ্ত বহুমুখ মানসিক

পদচারণার কথা। কিন্তু তথাপি—সব কিছু আয়োজন উপকরণ, তীক্ষ্ণ মনীষা ও রম্য বাক্‌ভঙ্গি, আদর্শবাদ ও কর্মচারিতা সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ আত্মখণ্ডিত ও ক্লিন্ন। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীর বংশধর তিনি, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের গোত্রজ হয়েও তিনি খর্বকায় কুশীলব, অবমূল্যায়নী এই কালের উপযুক্ত প্রতিনিধি। এ কালের সংশয়, অস্থিরতা, অবিশ্বাস তাঁর মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি ব্যর্থকাম রোমান্টিক, 'He is a limb torn off from society. In possession of eternal youth and beauty he can feel no love, surrounded, tantalized and tormented by riches, he can do no good···He is thrown back into himself and his own thoughts. His is the solitude of the soul'—'Romantic Image'

অবক্ষয়॥ নিজের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীসংস্থিতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ পুরোমাত্রায় সচেতন, 'ইংরেজি সভ্যতা ও শিক্ষাই এই পরিবর্তন ও গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ।···উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীরা নতুন সমাজের ব্রাহ্মণ হয়েছেন।' এবং উনিশ শতকে যদিও এই শ্রেণীর ভূমিকা ছিল যুগপৎ বৈপ্লবিক ও সাংগঠনিক, বিশ শতকে এঁরা পশ্চাতের পটভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ম্লানতায়, 'কার্ল্ মার্ক্সের প্রত্যেক বাক্য বেদবাক্য না মেনেও সত্যের খাতিরে মানতে হয় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বর্তমান সমাজের মেরুদণ্ড কিংবা উত্তমাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায় না···সমাজসচেতন ব্যক্তিরা জানেন যে এ শ্রেণীর দম, জান্ এবং শাঁস ফুরিয়েছে।' (মুখবন্ধ, 'আমরা ও তাঁহারা') এখন শ্রেণীগত ভসংস্থানে অন্যান্য সম্প্রদায়ও দেখা দিয়েছে, যেমন পুঁজিবাদী, সর্বহারা, কৃষক ইত্যাদি, যদিও mass বা জনগণ বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ধারণা পরিচ্ছন্ন হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বেড়েছে, এমন কি একই শ্রেণীগত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে—'এ বড় কঠিন সমস্যা। আপনারা আমাদের কথা বোঝেন না, আর আমরা আপনাদের কথা বুঝি না, অথচ প্রত্যেকেরই ধারণা যে কোনো দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয় নি।' ('আমরা ও তাঁহারা') ধূর্জটিপ্রসাদ প্রাণপণে কিন্তু চাইছেন, 'কঠিন সমস্যা বটে, তবে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া চাই-ই চাই।' (ঐ) এবং তাঁকে সন্ধান করতে হয়, 'জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তাধারার সমাজতত্ত্ব'। (ঐ, মুখবন্ধ)

ধূর্জটিপ্রসাদের চোখে অধুনাতন বুদ্ধিজীবীর রঙ এমনই ধূসর মনে হয়েছে

যে, তাঁর পেশাগত এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পদমর্যাদার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা, তার সম্বন্ধেও একই সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব তাঁর। তিনি অধ্যাপক, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের নীতি-ব্যাখ্যাতা এলিট। কিন্তু কোথাও তাঁর স্বস্তি নেই, বিশ্বাস করতে গিয়েও ছিট্‌কে এসেছেন, সমস্ত সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করেও তাঁর মন ক্লান্ত।

অধ্যাপকদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা. 'কুঁড়েমি যে মহাপাপ তা আজকালকার অধ্যাপকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁরা সব বই লিখতে ও বই পড়াতে ব্যস্ত, লেখাপড়া করবার ফুরসৎ তাঁদের নেই।' ('আমরা ও তাঁহারা') বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন-বিচ্যুত রিসার্চ সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা, আবার নামকরা অধ্যাপকের পেশাদারি গাইডগিরি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—'আর নিজেকে জিজ্ঞেস করি, 'সমস্যা তো দিলাম ছাত্রটিকে, কটা বড়ি বেলাগর্গন সেবন করতে হবে সেই সঙ্গে?' নিজেই উত্তর পাই না। সহকর্মীরাও পান কি? বোধহয় না। নচেৎ কেন শুনি, 'আমার হাতে পঞ্চাশটা রিসার্চ স্কলার, অথচ আমিও গণ্ডাখানেক প্রবন্ধ কিংবা বই লিখেছি এই বছর, কিংবা গত দু'বছরে?' ধন্য ধন্য, হাততালি, মহাপণ্ডিত! এতটা ফাঁকির ওপর দেশ বড় হয় না।' ('মনে এলো')

ধূর্জটিপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত, দেশের গণ্ডি পেরিয়েও, তিনি অনেক পেপার লিখেছেন, অনেক কন্‌ফারেন্স ও সেমিনারে যোগ দিয়েছেন, জওহরলাল থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তবু তাঁর মানসিক হতাশা! তাঁর চিন্তা: প্ল্যানিং মানেই তার দৃঢ় ভিত্তি হওয়া উচিত পরিসংখ্যান, প্রশান্ত মহলানবিশের একক কৃতিত্ব সম্বন্ধেও তিনি উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্ল্যান যখন নিখুঁত, তখন মানুষ কোথায়? মানুষকে খুঁজতে গেলে বিজ্ঞান থাকে না। ওয়েলফেয়ার এবং সায়েন্সের মধ্যে কি মিল হবে না? বলে ফেলেন, 'মিথ্যা তিন রকমের: lies, d-d lies and statistics'! অর্থাৎ নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে তিনি ডুবতে থাকেন, নিজেকে খোঁচা মারেন, 'আমি আমার নিজের প্রচারিত মতগুলোকে সন্দেহ করি, তবে গভীর রাত্রে, আলো নিভিয়ে দিয়ে'। ('আমরা ও তাঁহারা') আর একই সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি দিয়ে অন্যকে ঠোক্কর মারতেও কসুর করেন না, প্ল্যানিং-সংক্রান্ত আমার চিন্তা সুবিখ্যাত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অথচ সাহস-ভরে কিছু বলতেও পারি না। মনে মনে কিন্তু জানি যে, মূলে আমার কোনো ভুল নেই। এ-এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা!' ('মনে এলো')

কলকাতার ইতিহাস সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁর ভালো লাগছে, 'অক্টোগুলি

বুদ্ধিমাখানো চেহারাও অনেকদিন দেখিনি।' কিন্তু তখনই উচ্চারণ করছেন, 'কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এতটা কেন ভালো লাগছে?' তৎক্ষণাৎ বলেও ফেললেন, 'যাঁরা অনুষ্ঠানকে নিজেদের হাতে রাখতে চান, তাঁরা নীরবে স্বনির্বাসিত হয়ে যাচ্ছেন। কনফারেন্স না ছাই! সব 'পাওয়ার'-পলিটিক্সের রকমফের।' ('মনে এলো') নিজের জীবনে, স্বাধীন ভারতে অন্যদের ক্ষেত্রেও নানা চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস লক্ষ করেছেন তিনি। সব কিছু মেনে নিয়েও, উৎসাহী হয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়, কিছুতেই কিছু হয় না: 'এস. আর সি. রিপোর্ট পড়ে পর্যন্ত আমার প্রাণ টৃগ বুগ করছে। রাধাকমলবাবু রিজিয়নালিজম্ নিয়ে অনেক কিছু লিখলেন, বইএর পর বই লেখাই সার হলো, তাঁর নিজেরই উপকার হলো।' ('মনে এলো')

ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজসচেতনতা ও পর্যবেক্ষণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, বিশ শতকে যে নতুন এলিট শ্রেণী গড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে তিনি পুরো মাত্রায় সজাগ কিন্তু হতাশ্বাস। অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমে যেমন ইংরেজের তল্পিবাহক বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি আর এজেণ্ট তৈরি হয়েছিল, তেমনি এ-যুগে জেল-ফেরতের পাসপোর্ট-পাওয়া নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখছেন, 'তাঁদের কী দিয়ে তুষিব, পুজিব ভেবে উঠতে পারছি না। গায়ে খদ্দরের কোর্তা, পরনে খদ্দরের আট হাত ধুতি, পায়ে চাপলী, মাথায় গান্ধী টুপি, তার ওপর আবার স্বরাজপতাকা অঙ্কিত রয়েছে। সিগারেট দূরে থাকুক, চা, কফি, কোকো, লেমনেড দিতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে। চেয়ার-টেবিলের কাপড় সেই পুরাতন বিদেশী ছিটের। আমার গায়েও খদ্দর নেই। গা হাত পা চুলকোয় বলে খদ্দর পরা হলো না।' ('আমরা ও তাঁহারা') ১৯৪৭-এর পর আবারও এঁদের চরিত্র বদলাতে দেখেছেন তিনি, 'স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থত্যাগের আবেদন দুর্বল হয়েছে কে না জানে স্বেচ্ছাসেবক এখন কর্মচারী।' (বক্তব্য)

স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পরীক্ষা-বিমুখতা কমেছে এটাতে ধূর্জটিপ্রসাদ খুবই খুশি, যন্ত্রপাতি কলকারখানার অগ্রগতি তাঁকে উৎসাহিত করে। 'নীরবে একটা টেকনিক্যাল বিপ্লব চলছে, অনেক দিন থেকেই, এখন পরিবর্তনের মাত্রা বেশি বেড়েছে। নন্ ভায়োলেন্স কি কলকারখানা মানে, না তার মালিকরাই মানছে? ফ্যাক্টরীর চারপাশ দেখলে, শহরের উপনগর দেখলেই বোঝা যায় যে, যা হচ্ছে তা নন ভায়োলেণ্ট বিপ্লব নয়। আপাতত অন্তত আমাদের টেকনিক্যাল বিপ্লব বেশই ভায়োলেণ্ট।' কিন্তু এই বিপ্লবের নায়ক যে এলিট শ্রেণী, তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল, 'রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী অন্তর্গত—রাজত্ব এজ্ঞাতীয়বাদের, তাদের

মূল্যবোধের এখন জয়জয়কার। বরাবের গ্রেট হাল্লারের এঞ্জিনীয়ার নয়—মাত্র টেকনিশিয়ন। চাকরি মিলবে আর কি চাই! ('মনে এলো')

উনিশ শতকে নারীর মুখে প্রথম ভাষা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, সেদিন সে ঘটনার কতই বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ছিল। এ যুগে নারীরা বাধামুক্ত হচ্ছে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে। ধূর্জটিপ্রসাদ দারুণ উৎসাহিত. 'শ্রীমতী সুমতি মুতাৎকারের... সাধনা অদ্ভুত। স্বামীপুত্র ছেড়ে লক্ষ্ণৌ-এ সঙ্গীত শিখতে এলো, সাত-আট বছর প্রাণপণে শিখলো। তারপর ডক্টরেট অব মিউজিক নিলে। আমি একজন পরীক্ষক ছিলাম। এই না হলে মেয়ে! এই না হলে শেখা।' ('মনে এলো') এরা প্রগতিবাদিনীও –'সাতটি মেয়ে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। বুরখা পরে এলে ক্লাশে ঢুকতে দেবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। হেসে বুরখা খুলে ফেললে।' (ঐ) খুব ভালো কথা, এই রকম নিষ্ঠা আর মুক্ত মনই তো চাই মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু ভালো আর থাকে কই। ছাত্রীদের কারো কারো ইচ্ছে 'পড়াশুনা নিয়েই থাকবে, আইডিয়া রিসার্চ নিয়েই জীবন কাটাবে।...একটি ছাত্রী বলতো, 'ও-সব' আমার দ্বারা হবে না, অর্থাৎ বিবাহ সংসার ইত্যাদি। অবশ্য বিয়ে হলো—বিয়ের সময় সে কী কান্না! ওমা, দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতে দেখি কি না স্বামীকে নাকে দাড় দিয়ে ঘোরাচ্ছে। একদিন আমার বাড়ি নিয়ে এলো স্বামী বেচারীকে। কি ধমকানিটাই আমার সামনে তাকে না দিলে!' (ঐ)

ওই একই যুগের ইন্টেলেকচুয়াল কবি সুধীন্দ্রনাথের কিছু কথা এখানে আনা যাক:

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী, মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

'যযাতি', 'সংবর্ত' সুধীন্দ্রনাথের ছিল নঙর্থক জীবনদর্শন, যদিও ক্ষণবাদ ও অস্তিত্ববাদ পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন কর্মের সংকল্পে: 'বৈনাশিক বলেই আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনি আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎসংসারের মূলাধার।' (মুখবন্ধ, 'সংবর্ত') পক্ষান্তরে, ধূর্জটিপ্রসাদ শুরু করেছিলেন, নঙর্থকতায় নয়, সংশয়বাদে। যদিও তিনি বিহ্বল হয়ে ছুটেছেন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, সামাজিক দ্বন্দ্বের (social

distance) তত্ত্ব থেকে এগিয়েছেন কোনো আপাতগ্রাহ্য সমাজদর্শনের অভিমুখে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা থেকে খুঁজেছেন 'পুরুষ' বা সৃষ্টিধর্মী Personality-কে (কতকটা রবীন্দ্রানুকরণে), কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, অবলম্বন ভেঙে-ভেঙে যায়। সুধীন্দ্রনাথ যেখানে তুষার কঠিন স্বরে উচ্চারণ করেন, 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা/ যাতনা কেবল যাতনা সুচিরসাথী' ('অর্কেস্ট্রা')—সেখানে ধূর্জটিপ্রসাদকেও স্বীকার করতে হয়, 'শুনেছি প্রতি মানুষের বিশেষত্ব আছে, সেটা তার নিজস্ব, একান্ত unique…মানুষের যে টি নিজস্ব সম্পত্তি যন্ত্রণা, তার অংশীদার কেউ হতে পারে না।' ('মনে এলো')

বিজ্ঞানের পাদপীঠ ॥ তবু ধীরে ধীরে মনোযোগের সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদকে অনুসরণ করলে দেখা যায়, কখনো তিনি হাল ছেড়ে দেন নি, তিনি আজীবন বিচিত্র-জটিল পথে পথে ভিত্তির সন্ধান করেছেন যার ওপর পা রেখে দাঁড়ানো যায়। সব কিছু ফেলে দিতে বাধ্য না হয়ে অর্জন ও সংগঠন করা যায়। এটা বিশ শতকের বিশৃঙ্খলতা, অমূল্যায়ন এবং বিনষ্টির দিশাহারা নৈরাজ্যের মধ্যে অনেক মনীষীই অনুসন্ধান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও। সবুজপত্রে পরিকল্পনা ও প্রকাশের আগেই প্রমথ চৌধুরীকে এই দৃঢ় মানদণ্ড অনুসন্ধানে তিনিই উৎসাহিত করেছিলেন,'… তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' (পত্র) আর আমরা জানি, ধূর্জটিপ্রসাদের লেখকজীবনের শুরুতে রয়েছে দুটি পত্রিকা, 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়'—একটি মননশাসিত, অন্যটি বিশ্বমনীষার দ্বার-উদ্‌ঘাটনে তৎপর।

ধূর্জটিপ্রসাদ যে পাদপীঠের সন্ধানে ছিলেন, তার অন্যতমটি হচ্ছে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ। যদিও তা উনিশ শতকের জিনিস, তবু সেখান থেকেই শুরু করেছেন তিনি। উনিশ শতকের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মূল প্রস্থানভূমি ছিল লক, হিউম, টম পেইনের সঙ্গে বেকনের জ্ঞানের সার্বভৌমতা, এবং বেন্থাম-মিলের হিতবাদ পেরিয়ে, তাঁরা পৌঁছেছিলেন কোমতের দৃষ্টবাদে। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ ও মানবকল্যাণ এঁদের মৌল প্রেরণা। তারপর বিজ্ঞানেরই নানা রূপান্তর শুরু হল, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ ও কামতত্ত্ব প্ল্যাঙ্ক আইনস্টাইনের কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ—একটা আর একটার বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। তবু ধূর্জটিপ্রসাদ rationalism বা যুক্তিবাদকেই মৌল প্রস্থানভূমিরূপে ধরেছেন। এজন্য বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে

তিনি অতিমাত্রায় সচেতন—'বুদ্ধিবিস্তার অসীমতাই আমার শিক্ষা। দুরাশা পোষণ করেই ক্ষান্ত হইনি, সেজন্য খোটওছি।' ('মনে এলো')—যদিও প্রমথ চৌধুরীর সতর্কবাণী তাঁর মনে সর্বদাই ছিল, 'কোনো কিছুতে ডুবে যেতে নেই'। যুক্তিবাদ-নির্ভর কতকগুলি দার্শনিক মতবাদকে তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়েছেন, যেমন হিতবাদের greatest good for the greatest number-এর তত্ত্ব: 'আমাদের আনন্দ বেশিসংখ্যক লোক উপভোগ করতে পারে' ('আমরা ও তাঁহারা')—এই গ্রন্থেই জনগণ, বিপ্লব, মানবকল্যাণের ধারণাগুলিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আর, ধ্রুববাদের ধার ঘেঁষে যান, যখন তিনি বলেন,'আদর্শ অটুট রাখার জন্য একটা মিস্টিক হয়তো চাই।' ('মনে এলো') এবং পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের উপস্থাপনায় যখন তিনি তৎপর হন, 'যাঁরা আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আমাকে গোটা মানুষ হতে শিক্ষা দেন।' ('মনে এলো') এজন্য যেমন চাই, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়, মার্কসীয় দর্শনেরও লক্ষ, তেমনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দীক্ষা ও তাদের সমন্বয়। পরিহাস-তরল কণ্ঠে এক জায়গায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, 'প্রমথবাবু . আমাকে বের্গসঁর রচনায় দীক্ষিত করেন। পরে বের্গসঁর খপ্পর থেকে বাঁচান। আবার পড়লাম হাসেলের গর্তে। সেখান থেকেও উদ্ধার করলেন। ক্রোচে পড়তে বললেন—পড়লাম যা পেলাম। এবার কিন্তু নিজেই নিজেকে উদ্ধার করি। মার্কস্ তিনি জানতেন না—ওটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। এখনো নতুন ঘাসের খিদে যায় না।' ('মনে এলো')

কার্যক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রয়োগরীতিও ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক। শ্রমিক-কল্যাণ, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা—এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি চাইছেন বিজ্ঞানকেই মুখ্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে। সংখ্যাবিজ্ঞান এজন্য তাঁর কাছে 'অবশ্য', প্রশান্ত মহলানবিশের নামোল্লেখ তিনি আবেগোত্থ। সামাজিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয় তাঁর কাছে একই অর্থ বহন করে। 'যদি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র—যেমন কোনো একটি গ্রাম—নির্বাচন করে তার ভূমি, আবহাওয়া, আর্থিক জীবন, আশা-ভরসা, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন প্রভৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই ব্যাপারে সব বিজ্ঞানই এসে পড়বে। একালে এটা একার কাজ নয়, তখন সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিকের সহযোগ চাই। সেই কনক্রীট সহযোগের ফলে বিবিধ বিজ্ঞানের সীনথেসিস সম্ভব। ভূমির বেলা সয়েল কেমিস্ট ও ভৌগোলিক, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, আশা-ভরসার ক্ষেত্রে

মনোবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজব্যবস্থার বেলা সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, খাদ্যের বেলা বায়োকেমিস্ট, অর্থনৈতিক ; এই ধরণের সহযোগে বিবিধ জ্ঞানের আন্তরিক সম্বন্ধ ঠিক ঠিক বোঝা যায়, আর জ্ঞানের সমন্বয় হয়।' ('মনে এলো') বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবাদ-নির্ভর অনুশীলন-তত্ত্বের এটা নতুন সংস্করণ নয় কি ? কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্র নন, সে বর্ধিষ্ণু কালেরও নন, বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু যুগের মানুষ তিনি, সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী, তাই জ্ঞানার্জন ও তার সংগঠনী সমন্বয় সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে ধ্রুব প্রত্যয় ছিল, তাঁর তা নেই। আজকাল হামেশাই জীববিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যার এ্যাটমের আদর্শে cell বা জীবকোষের বর্ণনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন, ধূর্জটিপ্রসাদের মন সায় দেয় না। অন্যত্র তিনি বলছেন, 'অন্য উন্নত বিজ্ঞান থেকে প্রত্যয় ধার করার বিপদ আছে। ফোর্স, রেসিস্টান্স কিংবা ফ্রিকশন, ইকুইলিব্রিয়ম, প্রোসেস প্রভৃতি অঙ্ক কিংবা ভূতবিদ্যার প্রত্যয়গুলি কি অর্থনীতির বেলায় খাটে ?' ('মনে এলো') অগত্যা তাঁর কথায় অসহায়তার সুর লাগে, 'আমার কপালে বিশ্বাস টিঁকে না।' (ঐ)

দ্বন্দ্বময় ইতিহাস॥ ধূর্জটিপ্রসাদ চরমতাতে বিশ্বাসী নন, তিনি দেখেন চলিষ্ণুতার মধ্যে অভিব্যক্তিকে। কোনো একটি দৃশ্যকে বিচার করতে হলে—তা সে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা বা সমাজভাবনা, যাইহোক না কেন—ইতিহাসের বহমান ধারাতেই সেটিকে স্থাপন করে দেখতে চান। এ দৃষ্টিতে কোনো 'ভ্যালু'ই চূড়ান্ত হতে পারে না। তিনি মন্তব্য করেন, গান্ধীকে'...গত চল্লিশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস, ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস, আমাদের দারিদ্র্যের ইতিহাস, এমন কি ইংরেজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রভৃতি বাদ দিয়ে·· বুঝতে পারি না'। ('আমরা ও তাঁহারা')

যা হোক, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসের পরিবর্তন এবং নতুনের অভিব্যক্তিকে কোন আলোকে দেখতে চান ? মনে হয়, এক্ষেত্রে তিনি সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান নন। যদিও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রয়োগে তাঁর মনে 'কিন্তু' আছে, তবু পরিবর্তন-পরম্পরাকে তিনি থিসিস-এ্যান্টিথিসিস-সিনথেসিসের প্যাটার্নেই দেখতে ইচ্ছুক। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ঐতিহ্যগত ধ্রুপদ ও রাগসংগীতের সম্পর্ক বোঝাচ্ছেন তিনি। 'সঙ্গীতের কথা' প্রবন্ধে প্রথমেই তিনি বলে নিচ্ছেন, 'আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, আপনাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই শোনাব।' ('আমরা ও তাঁহারা') তারপর তাঁর সূত্রটি প্রয়োগ করলেন।

ভারতীয় সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত আছে ধর্মের চেতনা, এটি একটি তথ্য। বৈদিক ধর্মের অবসানে বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াল, আবার বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইমারত গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও পৌরাণিক দেবদেবীর। রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি দেবতা তখন সর্বত্র পূজিত হতে থাকল। এই সময় প্রসারিত হল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিরসাত্মক গান—বাংলাদেশে কীর্তন, পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে ভজন, মহারাষ্ট্রে আভঙ্গ: চৈতন্য নানক কবীর মীরাবাই প্রভৃতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। ধূর্জটিপ্রসাদ বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন, এই সব গানের সুর ছিল দিশি, মার্গসংগীত নয়। অন্যধারে আমীর খুসরু মার্গ সংগীতের বিশুদ্ধি নষ্ট করলেন ফার্সী 'মাকাম' দিয়ে। তারপর গোয়ালিয়রের রাজা মান এই নৈরাজ্যের যুগে কতকগুলি সূত্র বেঁধে দিলেন সংগীতের, একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচনা করেছিলেন তিনি। 'রাজা মান যে চাল বেঁধে দিয়ে গেলেন এবং আদিল শা ও সমসাময়িক ওস্তাদেরা যে চালকে প্রচলিত করলেন তারই নাম ধ্রুপদ।' ('আমরা ও তাঁহারা') ধূর্জটিপ্রসাদ সিদ্ধান্ত করছেন, 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যে সঙ্কীর্ণ সুরকে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম ধ্রুপদ—যে ধ্রুপদকে এখন শুদ্ধ সুরের খনি মনে করা হয়, এবং যে ধ্রুপদের দোহাই দিয়ে রবিবাবুর গানকে অশুদ্ধ বলা হয়।' (ঐ) তাহলে ধ্রুপদ কেবল একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি, চিরন্তনও নয়, তথাকথিত 'শুদ্ধ' ও নয়, অথচ ওটাই সিনথেসিসের একটা ফল। ক্রম হচ্ছে এই রকম: মার্গ সংগীত > মার্গ সংগীতের সঙ্গে দিশি ও ফার্সী সংগীতের মিশ্রণ ও বিকৃতি > ধ্রুপদ।

ধূর্জটিপ্রসাদ সেইরকম সিনথেসিসের সৃজ্যমান আলোকেই রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তিনি সুরকে বিকৃত করেন বাদী স্বরকে শ্রদ্ধা না করে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট করে। সঞ্চারীতেও তিনি surprise note বসান। ধূর্জটিপ্রসাদ উত্তর দিচ্ছেন, 'ও আপত্তি হচ্ছে begging the question মাত্র। রবিবাবু ঐ সব বেপর্দা ব্যবহার করেছেন বলবার কী অধিকার আছে আপনাদের? তিনি কি গানের মাথায় স্বাক্ষর দিয়ে লিখে দিয়েছেন 'ভৈরবী'? আর যদি দিতেনও, তা হলে প্রমাণ হতো যে তিনি সুরের নাম জানেন না—সে ভুলে সঙ্গীতের কী ক্ষতি হতো?' ('আমরা ও তাঁহারা') সংগীতের বহমান দ্বান্দ্বিক ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে মিশ্রণের ফলেই নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে—'শুদ্ধ টোড়ীর সঙ্গে ললিতের শুদ্ধ মধ্যম মিলিয়ে যদি বিলাসখানী টোড়ী হয়, তা হলে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' কেন ঠাকুরী টোড়ী হবে না?' (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি আর এক অভিনব সৃষ্টির উদাহরণ। কথার সঙ্গে সুর, এবং এ'দুয়ের সঙ্গে নৃত্যের যোগসাধন করেছেন রবীন্দ্রনাথ—কোন পদ্ধতিতে? ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্বাস, এখানেও একই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সক্রিয় হয়েছে, unity of opposites। 'কথা ও সুর' গ্রন্থে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি কৌতূহলী পাঠক তা সাগ্রহে অনুসরণ করবেন। এখানে কেবল তাঁর সিদ্ধান্তটিই উপস্থিত করছি: 'আমি নৃত্যের স্বরাজসাধনের বিবরণ দিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরাজলাভের পর যে আন্তর্জাতিক মিলন ঘটে সেই প্রকৃত মিলন। তখনই হয় দেশে দেশে বন্ধুত্ব, কারণ, কেউ কারুর অধীন নয়। শুদ্ধ নৃত্যকলার উদ্ভাবন অর্থে সংগীতকে পদানত করা নয়। সব জ্ঞানের, সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষের ইতিহাসে দুটি গতি আছে; ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধি, এবং শুদ্ধির পর সমানে সমানে, পূর্বপরিত্যক্তের সাথে পুনরায় মিত্রের সম্বন্ধ স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে নৃত্যের শুদ্ধতায় আরোহণ করে সম্বন্ধে অবরোহণ করেছেন, তাই চারুকলার সমন্বয় 'চিত্রাঙ্গদা'য় সর্বাঙ্গীণ হয়েছে।' ('কথা ও সুর')

এখন, এই যে সিনথেসিস, বা বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয় ও নতুনের আবির্ভাব, সর্বত্রই কি তা ভালো? এখানে 'ভ্যালু'র প্রশ্ন ওঠে, ধূর্জটিপ্রসাদের মনেও সংশয় দেখা দেয় 'না হয় সংখ্যা গুণে পরিণত হলো কোনো না কোনো ক্ষণে, কিন্তু সে গুণ বেগুণও হতে পারে।' ('মনে এলো')—এ উদ্ধৃতিটি অন্য প্রসঙ্গে বর্তমান রচনাতেই নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের মিশ্রণ সম্বন্ধেই এই রকম প্রশ্নের অবকাশ আছে বলে স্বত্বত স্বীকার করছেন ধূর্জটিপ্রসাদ:

'তাঁহারা—মিশ্রণ হয় মানি, রবিবাবুর প্রতিভা স্বীকার করি, আমরা ওস্তাদ নই তাও জানি, কিন্তু যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত বলি কী করে?'

'আমি—আপনাদের কে বলতে অনুরোধ করছে?' (আমরা ও তাঁহারা')

সমস্যা আছে। 'ভালো' কিনা এটা নির্ধারণের ভার দিয়েছেন তিনি দুটি জিনিসের ওপর, সংগীতের সৃজনধর্মী প্রতিভা এবং শ্রোতার শিক্ষিত কান। একটু এ্যাবস্ট্র্যাক্ট হয়ে গেল, নয় কি?

পার্সন্যালিটি ॥ ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের একনিষ্ঠ ছাত্র। এই দুই শাস্ত্রের দ্রুত পরিবর্তনশীল ধারণা ও সমস্যা সম্বন্ধে তিনি পুরো মাত্রায় অবহিত, এমন কি নিজের আপেক্ষিক অক্ষমতা সম্বন্ধেও, 'যতই ইকনমিক্স পড়ছি, ততই নেশা হচ্ছে ও ততই মূর্খ হয়ে যাচ্ছি সন্দেহ হচ্ছে।' ('মনে এলো') সমাজতত্ত্বের

চিন্তাতেও তিনি একই গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েছিলেন, 'তা দেওয়াও চাই, ডিমও চাই। ব্যক্তিও চাই সমষ্টিও চাই।' ('মনে এলো') কল্যাণের জন্ত আবার অঙ্কশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্ব-অর্থনীতিকে মেলাবার প্রয়োজন আছে, যদিও ও-দুটি শাস্ত্র তেল ও জলের মতোই। অর্থনীতি ক্রমেই অঙ্ক-নির্ভর হয়ে উঠছে, পরিসংখ্যান ক্রমেই ছুটেছে এ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে, পক্ষান্তরে সমাজতত্ত্ব চাইছে গোটা মানুষকে খাড়া করতে। সমস্যা হচ্ছে এই রকম—'শুমপীটার চাইতেন ইকনমিক্স পদার্থ-বিদ্যার মতন শুদ্ধ ও সাধারণ বিজ্ঞানে পরিণত হোক।...প্রকৃতিবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্যের কথা...মানুষ কোথায়? মানুষ ধরলে অনিশ্চিত, vague অথচ বাস্তব; মানুষ বাদ দিলে নিশ্চিত, বিশুদ্ধ অথচ অবাস্তব।...কী আশ্চর্য! পড়ছি অর্থশাস্ত্র আর ভাবছি মানুষের কথা।'•('মনে এলো')

এই সমস্যার জটিল অরণ্যে প্রবেশ করেও নিজের কৃত্য সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ একটুও সাহস হারান নি, পরিচ্ছন্ন ভাষায় সে আদর্শটি সামনে রেখেছেন, 'আমার ব্যবসা সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে, সংস্কারের ব্যাপ্তিতে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা।' ('চিন্তয়সি') কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বা জীবসত্তার প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আবার একই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েছেন। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদ একদা চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু তিনি এমন কতকগুলি premise-এর ওপর তাঁর তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যে, পরবর্তী অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেগুলি ধোপে টেকে নি। তার ওপর তাঁর তত্ত্ব পরবর্তী অনুগামীদের হাতে পড়ে আরো জটিল ও পরস্পর-বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। আধুনিক জীববিজ্ঞান ক্রমেই একদিকে সংখ্যাতত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ছে ও mechanistic হয়ে উঠছে, অন্য দিকে vitalist তত্ত্ব সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করতে উদ্যত। ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, 'Mind is an emergent বলাও যা, মানুষকে দেবতা বলাও তা।' ('চিন্তয়সি') মেণ্ডেল, মর্গান, ম্যাটস্, হল্ডেনের মতবাদের আলোচনা শেষ করে তিনি অগত্যা বলছেন, '...বিচার এখনও চলছে, রায় বেরোবার আগে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা নিয়ে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করলে Contempt of Reason হবে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্তে না আসা ভদ্রমনের চিহ্ন মনে করে আত্মতৃপ্ত হওয়া যাক।' ('চিন্তয়সি')

ধূর্জটিপ্রসাদের কিন্তু সত্যই আত্মতৃপ্ত থাকার মন নয়, তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে বুঝবার জন্য অন্য শাস্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন। ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, বিপ্লববাদ,

সমাজতন্ত্র—এগুলি অবলম্বন করেই তিনি রচনা করতে চেয়েছেন, 'নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা'। যা করতে গিয়ে তিনি সমকালীন ভারতের নতুন পরিস্থিতিকেই সোজাসুজি সামনে রেখেছেন, 'ইয়ুরেনীয়াম যুগ লোহা-ইস্পাত যুগের দ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে, ভারতবর্ষের আত্মশক্তির পরীক্ষা শুরু হয়েছে, দ্রুতগতিতে কৃষিপ্রধান জীবন-যাত্রা যান্ত্রিক সভ্যতার সামনে হটে যাচ্ছে, সামন্তশাসন মুমূর্ষু প্রায়, ধনিকতন্ত্র জাগ্রত ও জীবন্ত, পুরাতন সমাজবিন্যাসের শক্তি হ্রাস পেয়েছে ও সেই সুযোগে নতুন সমাজ-বিন্যাসের ছায়া পড়েছে জনসাধারণের মনের পর্দার উপর।' ('বক্তব্য') এই পরিস্থিতিকে তিনি ভাববাদী স্বপ্নিল দৃষ্টিতেও দেখতে চান না, যেমন গান্ধীবাদীরা করেছেন। গান্ধী যে মানুষের innate goodness-এর ধারণার ওপর তাঁর সমস্ত সমাজদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তা ধূর্জটিপ্রসাদ প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করেন না, ধনিক শ্রেণীর মুনাফা লুঠ ও কালোবাজির মধ্যেই অছি-তত্ত্বের অপ্রামাণ্যতা আছে। আবার, বিজ্ঞানবাদীরা যে মনে করেন, মানুষ ক্রমেই তার সর্ববিধ মোহ, ধর্ম ও সংস্কারের থেকে মুক্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন সুসভ্য হয়ে উঠবে, তার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যেও দেখা যায় না। রুশো সর্ববিধ বন্ধনের থেকে মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন এবং সেই মুক্তির ওপর স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর সৌধ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। মানুষের সামনে তিনি মটো রেখেছিলেন, প্রকৃতিতে ফিরে যাও, তাঁর অভিষ্ট মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন 'নোব্‌ল্ স্যাভেজ' রূপে। এ তত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদের মন সায় দেয় না, 'নব্য সমাজদর্শনের মানুষ 'নোব্‌ল্ স্যাভেজ', বৈজ্ঞানিক, কিংবা অপরিণত দেবতা হতে পারে না। মানুষ হবে পুরুষ; সে একক ব্যক্তিসত্তা বা ইণ্ডিভিজুয়াল হবে না,—হবে 'পার্সন'।' ('বক্তব্য')

এই পার্সন বা পুরুষের ধারণাটি ধূর্জটিপ্রসাদের বহুচর্চিত, বহুপোষিত—এটি মধ্য-জীবন থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত সমানভাবে তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। এবং আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'Creative Unity' এবং 'Personality'-র ধারণার সঙ্গে এটি আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটিকেই তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন, কোনো বিশেষ ধরণের রূপান্তর বা স্বীকরণ ছাড়াই। এমনকি তাঁর 'ছোট-আমি'-'বড়ো-আমি'র যুগ্মকটিকেও, কতকটা যান্ত্রিকভাবেই, তিনি গ্রহণ করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ আরম্ভ করেছেন কিন্তু রেনেসাঁসের কাল থেকে, যখন ব্যক্তিত্ব বা individuality'র আবির্ভাব ঘটেছিল। এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়, কেননা লেখক নিজেই ব্যক্তিত্ব-সাধক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সমাজে যুবতা থেকে

ব্যক্তিমানুষের আবির্ভাব অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, এবং সেই একই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি রূপান্তরিত হয়েছে পুঁজিবাদীতে, পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে শ্রমিক শ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষককে, শেষোক্তরাই আবার শ্রেণীহীন সমাজ গড়বে। এ ব্যাখ্যা মোটামুটি তিনি মানেন, যদিও একটু সংশয় প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন না, যেমন, 'না হয় সংখ্যা [quantity] গুণে পরিণত হলো কোনো না কোনো ক্ষণে, কিন্তু সে গুণ বেগুণও হতে পারে।' ('মনে এলো') সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণী থাকবে না এটাও তিনি হজম করতে পারেন না। কেননা, বুদ্ধিজীবী এলিটকে তিনি অনস্তি বলে ভাবতেই পারেন না, রাশিয়াতেও তার ভূরি উদাহরণ দেখেছেন। উপরন্তু আজকের কোনো বিপ্লবই চিন্তানায়ক ছাড়া সম্ভব নয়—'এক কালে হয়তো না পড়ে, না ভেবে বিপ্লব হতো, কিন্তু মূর্খতার সাহায্যে আজকালকার শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সে রাষ্ট্রের প্রভু ধনিক সম্প্রদায়কে টলানো যায়, একথা মার্কস্-লেনিনের পর বলা দুঃসাহসেরই পরিচয়, বুদ্ধির নয়।' ('আমরা ও তাঁহারা') যাই হোক, পরবর্তী সমাজ-সংস্থানে, তার রূপ যাই হোক না কেন, শ্রেণী থাকছে, ব্যক্তিও। কিন্তু ব্যক্তিকে থাকতে হবে 'পুরুষ' হিসেবে। সেই ধারণাটি মোটামুটি বিবৃত করা যায় এই ভাবে: ব্যক্তি তার স্বধর্মে স্থিত থাকবে, এবং প্রতি মুহূর্তে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তার বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধবে, কেননা ব্যক্তিত্বের মৌল শর্তই হচ্ছে তাই। তথাপি সেই স্বধর্মের সৃষ্টিশীল বিকাশের ফলে সে সমস্ত বিরোধকে আত্মসাৎ করতে পারবে এবং একটি চলিষ্ণু সমন্বয়ের মধ্যে আনতে পারবে। 'জীবনের ভেতরে বাইরে নব নব শক্তির কাজ চলে। তাই ভারসাম্য সামলাতে সামলাতে, হার্মনি সৃষ্টি করতে করতে চলার নামই উন্নতি।' ('আমরা ও তাঁহারা') আবার, 'এই তথাকথিত ভেতর ও বাইরের মধ্যে, বাইরে, পেছনে, সামনে, ওপরে, নীচে একটা continuum ওতঃপ্রোত হয়ে আছে, যেটি ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে concrete, কিন্তু যার স্বভাব হচ্ছে universal'। (ঐ) এই সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্বের সীমাতিক্রমণকেই তিনি বলছেন Personality, ব্যক্তিত্বের 'মুখশ্রী'। 'মুখশ্রী ফোটানোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। Personality কথাটি এসেছে persona অর্থাৎ মুখোস থেকে।' ('আমরা ও তাঁহারা')

এই রচনাতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছি। বিবাদী স্বরকে আত্মসাৎ করা কিংবা কথা সুর ও নৃত্যের বিভিন্নতাকে সমন্বিত করা নিশ্চয়ই Personality'র কৃত্য।

পার্সন্যালিটি সম্বন্ধে যে তত্ত্ব ধূর্জটিপ্রসাদ দিনে দিনে ভেবেছেন এবং রূপ দিয়েছেন,

সাহিত্যের জগৎ থেকে তিনি তারই কতকগুলি: উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। 'হার্মনি আছে বলেই সত্যকারের মুক্তপুরুষের মধ্যে কোন খিচ্ নেই—যেমন গোরার পরেশ বাবু, ঘরে বাইরের মাস্টারমশাই, ডস্টয়েভস্কির আলিয়শা, ফ্রান্সের আবে কয়নার্ড, সেক্সপীয়রের প্রস্পেরো প্রভৃতি। বিবাদী সুরকে কয়েদ করা চাই, মশাই, নচেৎ সুর খেলে না।' ('আমরা ও তাঁহারা') ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে এই রকম যন্ত্রণাদিগ্ধ অথচ বিরোধ-সমন্বয়কারী নায়ক-চিত্র অঙ্কনও করেছেন তাঁর 'রিয়ালিষ্ট' গল্পসংকলন এবং 'আবর্ত' 'অন্তঃশীলা' 'মোহানা' এই উপন্যাসত্রয়াতে। খগেন এই বিশাল উপন্যাসের নায়ক। আধুনিক মানুষের আত্ম-অতিক্রামী সমগ্রতা, তার বুদ্ধি ও মনীষার যন্ত্রণাদীর্ণ চিত্রই এখানে উপস্থাপিত। 'আবর্ত' ব্যক্তিমানবের বিরোধ ও আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপ্রকাশ, 'অন্তঃশীলা'-তে তার বেগবান মুক্তি ও অগ্রগতি, এবং 'মোহানা'-য় সে ব্যক্তির বিশ্বসত্তায় বা সম্পূর্ণতায় উত্তরণ। লেখকের কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'অন্ততপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন, এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনি বুদ্ধিও দ্বিমুখী—এক দিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্যদিকে সংকলনে নিরত।' সুধীন্দ্রনাথ যাকে 'সংকলন' বলছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ তাকেই হার্মনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও, 'বিশ্বসাথে যোগে' বিহার। এটি মার্কসীয় তত্ত্বেরও আভাস আনে—সমাজ ও ব্যক্তি ক, খ, গ—এই সব স্তর বেয়ে অগ্রসর হয়, এমনভাবে যে ক, খ-কে আত্মসাৎ করে গ'এর সিনথেসিসএ উপনীত হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ ধন্যবাদার্হ এই জন্য যে, তিনি মনে করেন, আমাদের সামনে যে সাম্যবাদী সমাজের কল্পনা বিদ্যমান, তাতে ব্যক্তি ও এ-যুগের সমস্ত শুভ মূল্যবোধ থাকবে এবং সমন্বিত হবে।

উপন্যাসের চরিত্র তাঁর 'পুরুষ'-এর উদাহরণ হয়েছে দেখলাম। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর চারপাশের জগতে এই রকম পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন কি? লক্ষ করি যে, তাঁর প্রথম যুগের রচনায় এ জিনিষ পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষ জীবনের রচনা, বিশেষ করে 'মনে এলো'-তে এই রকম বেশ কিছু 'পুরুষ'-চিত্র উপস্থিত করেছেন। যেমন প্রশান্ত মহলানবিশ, নরেন্দ্র দেব, ব্রজেন শীল, রামেন্দ্রসুন্দর, এই সব। জ্ঞান, মনীষিতা, কর্মচারিতার সমন্বয় যেখানেই দেখেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ সেখানেই উৎসুক হয়ে উঠেছেন। লেখার ছোট বড় নানা আয়তনে এই সব 'পুরুষ'-চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে, এখানে সংক্ষিপ্ত দু'একটি উদাহরণ নিচ্ছি :

'এক চুমুকে অমলের (হোম) 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' শেষ করলাম। গলার

কষ্টটা বেঞ্জামিন ভেপারে যাচ্ছিলো না, হঠাৎ চলে গেল।' ('মনে এলো')

ব্রজেন শীল নানা বিদ্যার ভাণ্ডারী ছিলেন, সেসবের সমন্বয়ও করেছেন। যেমন, কীটসের কবিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেলেনিক-ভারতীয়-চৈনিক-মাজদীন সৌন্দর্যতত্ত্বের পটভূমি বিশ্লেষণ। আবার, কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা নির্ধারণে ভাষাতত্ত্বকে টেনে এনে তাকে ত্রিকোণমিতির সঙ্গে মিলিয়েছেন। এই রকম আশ্চর্য সব উদাহরণ উদ্ধৃত করে ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করছেন, 'এমন জ্ঞান-স্পৃহা, জ্ঞানের এমন বিশালতা, একটি বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার যোগ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা, আর এমন বিনয় ও শিশুসুলভ সরলতা বর্তমান পাণ্ডিতদের মধ্যে আছে কি?' ('মনে এলো')

এই রকম ভাবে তাঁর লেখায় এসেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, শরৎচন্দ্র, তাঁর ছাত্রী ডঃ সুমতি মুতাৎকার, লণ্ডনের আর এক চীনা ছাত্রী, যে পড়াশুনো তেমন করত না, চুপ করে থাকত, খাওয়াত ভালো, এবং বিদায়ের সময় তাৎপর্যপূর্ণ একটি বই উপহার দিয়েছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন, 'এ মেয়ে চীনে, পেকে ক্ষীর।' কেন পুনঃপুনঃ খ্যাত-অখ্যাত মানুষদের সামনে আনছিলেন তিনি?—অবশ্যই বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এই অবমূল্যায়নের যুগে মানুষ দেখবার জন্য।

তবে কি, পার্সন্যালিটি বা পুরুষকে পেয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের সব সংশয় কেটে গেছে, আদর্শের সুখস্বপ্নে আত্মতুষ্ট হয়েছেন তিনি? মোটেই না, ধূর্জটিপ্রসাদ ওই সব পুরুষকে সামনে এনেছেন ঠিকই, কিন্তু যুগনায়ক বা মহাপুরুষের কেন আবির্ভাব হয়, Personality কি dictator'এ পরিণত হবে—এসব প্রশ্ন অবিরত তাঁকে খুচিয়ে মেরেছে। একবার প্ল্যান-ফ্রেম নিয়ে বিধান রায়ের কক্ষে বড় বড় অর্থনীতিবিদের আলোচনা ছিল, প্রশান্ত মহলানবিশ ছিলেন, ধূর্জটিপ্রসাদও ছিলেন। 'বিধান রায়ের থেকে 'উত্তরই শুনলাম, আলোচনার গন্ধ পর্যন্ত পেলাম না। অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।' শেষে মন্তব্য করছেন, 'এক এক সময় মনে হচ্ছিলো, আমরা ছোট বলেই অন্যে এতটা বড় হয়।' ('মনে এলো') অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'আমাদের অনেক মহারথী এমন সব প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন যেখানে তাঁরাই সর্বেসর্বা, তাঁদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাটাও অভিজ্ঞান্স। আমাদের যুগেই তার দৃষ্টান্ত একাধিক—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আশুবাবু, যাঁর আশ্রয় ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।' ('আমরা ও তাঁহারা')

শান্তি॥ ধূর্জটিপ্রসাদের একটা উল্টো ধরনের মন্তব্য সামনে আনছি:

'যেদিন থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে মেশবার সুবিধা পেয়েছি সেই দিন থেকে আর গান সম্বন্ধে তর্ক করি না।' ('আমরা ও তাঁহারা') ধুরন্ধর তার্কিক তর্ক বন্ধ করলে সেটা স্বধর্মচ্যুতি হবে না? কিন্তু এটাও ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে সত্য।

ধূর্জটিপ্রসাদ নানা শাস্ত্রের গহনে প্রবেশ করেছেন, সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি জেগেছে, তত্ত্ব ও উদাহরণ খাড়া করেছেন, উল্টে সে সম্বন্ধেই সংশয় প্রকাশ করেছেন, সিদ্ধান্তে বাঁধা পড়তে তাঁর দারুণ ভয়। 'জীবনের অন্তে সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে ধস্তাধস্তি, ঝগড়া-ঝগড়ি। খেটে যাও আর ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হও। ব্যস! কাদার পাওয়ার বলতেন, who cares!' ('মনে এলো')

চিন্তা ও কর্মের গতিশীলতা চেয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ, ঐতিহাসিক ও জৈবনিক গতিবেগে উদ্ভূত সৃজ্যমান হার্মনিও তিনি চেয়েছেন। কিন্তু সেটি তো তরঙ্গের একটি শীর্ষবিন্দু, ঢেউ আবার ভেঙেও যায়। এ হল অশান্তির মধ্যে শান্তি—'মতামতের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিভৃত ও নিশ্চিত, প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র রয়েছে। তাকে আবিষ্কার করাই আমার প্রতি সুবিচার, আমার শ্রেষ্ঠ উপকার।' (ভূমিকা, 'চিন্তয়সি') এই অবিচলতার বিন্দুটি আবির্ভূত হবে অশান্তির সিঁড়ি বেয়েই, পূর্ণতার নৈষ্কর্ম্য কর্মের মাঝখানেই, এক এক জায়গায় কর্ম ত্যাগ করেই কর্মের শ্রেষ্ঠ ফলটি পাওয়া যায়: 'The pursuit of book-learning brings about daily increase. The practice of Tao brings about daily loss. Repeat this loss again and again and you arrive at inaction. Practise inaction, and there is nothing which cannot be done.' ('মনে এলো')

ধূর্জটিপ্রসাদ, এতক্ষণে বলা যায়, মনীষী, তাত্ত্বিক কিন্তু তিনি বোধ হয় সর্বোপরি শিল্পী, যদিও তিনি নিজেকে আর্টিস্ট বলতে রাজি ছিলেন না, বলতেন artistic। যামিনী রায়ের ছবি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'যামিনীদার ছবিতে শান্তি আছে। শান্তিরসপ্রধান কিংবা শান্তিরসাত্মক বললে অন্য রসের অভাব মনে ওঠে। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'পয়েজ' 'ডিগনিটি' মানুষিক নয়, মনুষ্যোচিত—আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, গাম্ভীর্য।' ('মনে এলো')

আধুনিক বুদ্ধিজীবীর শান্তি, গাম্ভীর্য ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে চেয়েছেন। পেয়েছেন কি? হয়তো পান নি, হয়তো পেয়েছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস-চিন্তা

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

১.

আমাদের অতিবিশেষীকরণের যুগে ক্রমেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং অন্যান্য, এমনকি নিকটবর্তী বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞানতা জাহির করাটাই সাধারণ হয়ে পড়েছে। তার নিরিখে আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে প্রকৃতই যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের চিন্তা কত সহজভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ত, তা মাঝে মাঝেই আমাদের বিস্মিত করে তোলে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে একথা খুবই প্রযোজ্য।

ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসে এম এ. পাশ করেন। অর্থনীতির শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা। সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন তিনি। একাধিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল সেরকম কয়েকজন বলেছেন, তিনি জমিয়ে গল্পও করতেন। অর্থাৎ, ধূর্জটিপ্রসাদ স্ব-লব্ধ জ্ঞানের ভারে বেসামাল হয়ে পড়েন নি।

বিভিন্ন বিষয়ে কমবেশী অধ্যয়ন করার আর একটা ফল ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর রচনায় বিভিন্ন বিষয়ের যোগাযোগ ঘটাতে পেরেছিলেন। ইতিহাস সম্বন্ধে লিখতে বসে তাই তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছিলেন, তিনি ইতিহাসকে দেখছেন সমাজতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে। ('On Indian History—A Study in Method'-এর Preface দ্রষ্টব্য।)

ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসের বই লেখেন নি। সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি ভারতীয় সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতীয় ইতিহাসবিদরা ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির মৌলিক শক্তিগুলিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখেন নি, এবং তার বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তাকে যুক্তিপরম্পরার ধারায় ব্যাখ্যা করেন নি।

On Indian History বইয়ের দীর্ঘতম প্রবন্ধটি তাই ভারতীয় ইতিহাস-বিদদের এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে, এবং এমন একটি বিশ্লেষণ-

পন্থার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছে, যার মাধ্যমে ইতিহাসবিদরা তাঁদের যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করতে পারেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ভবিষ্যত ইতিহাস গঠনের প্রক্রিয়ায় হাত লাগানো। এজন্য দরকার ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক শক্তিগুলিকে উপলব্ধি করা। ইতিহাসবিদরা এ কাজ করতে পারেন নি দুটি কারণে: তাঁরা ইতিহাসকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুঝতে চান নি, এবং তাঁরা ইতিহাসের এক সঠিক দর্শন বেছে নিতে পারেন নি। ইতিহাসবিদদের ব্যর্থতার এই দুটি কারণকে একটি মাত্র কারণ রূপে দেখা যায়, যদি সমাজতত্ত্বকে ইতিহাসের দর্শন বলে দেখানো যায়।

এই সঠিক বিশ্লেষণ-পন্থা গ্রহণের পথে বাধা দুটি। প্রথমত, ইতিহাসের যুক্তিপরম্পরাকে সমাজজীবনের আভ্যন্তরীণ গতির মধ্যে না খুঁজে জীববিদ্যা, ভূগোল মনোবিদ্যা, ইত্যাদির মধ্যে ইতিহাসের সূত্র আবিষ্কার করার তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। এর ফলে, ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় নৈর্ব্যক্তিক একরাশ তথ্যের সমাহার। তার মধ্যে মানুষের সচেতন অংশগ্রহণের কোনো স্থান থাকে না। অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র চিহ্নিত করে কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতকে গড়ে তোলা যে ইতিহাসের ধারার প্রয়োজনীয় অংশ, এই 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাসবিদরা তা বুঝতে পারেন না।

দ্বিতীয় যে-বাধার কথা ধূর্জটিপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন, তা আজকের দিনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বাধা হল, তথ্য অনুসন্ধানের দোহাই পেড়ে ঐতিহাসিক সামান্যীকরণ করতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতির অর্থ সচেতনভাবে কোনো ইতিহাসের দর্শন বেছে না নেওয়া। কিন্তু ইতিহাস তাতে সন্তুষ্ট থাকে না। লেখক ইতিহাসকে ভাববাদী দর্শনের দাসে পরিণত করেন। ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে কার্যত যুক্তিপারম্পর্যের স্থলাভিষিক্ত করা হয় এক ধরণের দৈবশক্তিকে। এরই চূড়ান্ত বিকাশ হেগেলীয় ইতিহাস-দর্শনে। ভারতীয় ইতিহাসবিদদের অবশ্য কর্তব্য এই ভাববাদী দর্শন পরিহার করা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন নিরপেক্ষতার পিছনে অবাস্তব দৌড় থামিয়ে ইতিহাস বদলানোর, ইতিহাস সৃষ্টি করার কাজে নামা।

২.

ইতিহাসবিদ, তথা সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতে নিযুক্ত গবেষকদের কর্তব্য

ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার জন্য অতীত ও বর্তমানকে নতুন করে দেখা, এটাই ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্যের মূল সুর। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় বিদ্যা ভবনে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় তিনি বুদ্ধিজীবীর এই কর্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবীদের দুটি কাজের সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমত, অতিবিশেষীকরণের প্রবণতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন সমাজজীবনের মূল ধারা উপলব্ধি করার পথে বাধাস্বরূপ বলে। দ্বিতীয়ত, তিনি বুদ্ধিজীবীদের সমাজবিমুখতাকে তিরস্কার করেছেন।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তিনি তিনটি প্রশ্ন তোলেন: (১) ইতিহাসের কাছে আমাদের কোন প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে, যা কেবল দর্শনই মেটাতে পারে, (২) ভারতীয় ইতিহাস রচনার কোন কোন ত্রুটি দর্শনের মাধ্যমে অপসারণ করা সম্ভব? এবং (৩) ইতিহাসের কি আদৌ কোনো দর্শন থাকতে পারে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, ইতিহাস রচনা করার জন্য দরকার একটি বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে বিচারপদ্ধতি থেকে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ বিকাশের এক একটি নতুন পর্যায়ে বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর তা থেকে জন্ম নেয় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব। নতুন দর্শন যখন জীবন্ত সমস্যার সমাধান খোঁজে, তখন তাকে ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। সাধারণ মানুষ চায় যে ইতিহাস তার নিজের সমস্যা বিশ্লেষণ করার এমন পথ বাতলে দেবে, যাতে সে ঐ সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং আরো ভালভাবে, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবে। ভারতীয় ইতিহাসবিদরা এ কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ইতিহাসচর্চাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথম আসে ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনা। বিদেশী প্রশাসকরা ভারত শাসনের প্রয়োজনে ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। বহু ভ্রান্তি সত্ত্বেও, তাঁরা একটা কথা পরবর্তী ইতিহাসবিদদের চেয়ে ভাল করে বুঝেছিলেন। তা হল, ভারতের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ইত্যাদি পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত, এবং ভারতের অতীতের ধারাবাহিকতার ফলেই ভারতের বর্তমান গড়ে উঠেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। বিদেশী প্রশাসকরা অবশ্যই অনেক সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজন করেছিলেন (যথা হান্টারের "দ্য ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্")। কিন্তু তাঁরা ভারতের

ইতিহাসে যে ঐক্য, বা যে ধারাবাহিকতা খুঁজেছিলেন, তা ছিল অতিমাত্রায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। অনেক পরবর্তী কালে রচিত একটি পাঠ্যপুস্তক থেকে এই উদ্দেশ্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পাঠ্যপুস্তকটি ভিন্সেন্ট স্মিথ রচিত ভারতের ইতিহাস। স্মিথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সাম্রাজ্যের ভূমিকাকে বিশাল করে দেখিয়েছিলেন। এর পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হল, সাম্রাজ্যই যে ভারতীয় ঐতিহ্যের বড় কথা, এবং সেই নিরিখে ইংরেজ সাম্রাজ্য যে একটা ন্যায্যতা লাভ করে, এ কথা প্রমাণ করা। ধূর্জটিপ্রসাদ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার সমালোচনা করেছেন ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে তার অবজ্ঞার জন্য। কিন্তু, কিছুটা তার ফলেই, ভারতীয় কৃষ্টির গুণগান যাঁরা করেছিলেন তাঁদের ইতিহাসচর্চার গলদকে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই এড়িয়ে গেছেন।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ভারতীয় ইতিহাস রচনার দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায় সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ পাঁচটি সমালোচনা করেছেন। তাঁর এই সমালোচনা অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বহুলাংশে তাঁর সমালোচনার বিষয়বস্তু আজও বিদ্যমান। যে-ভারতীয় বিদ্যাভবনে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমালোচনা ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেখান থেকেই প্রকাশিত হয় ঐ সমস্ত দোষে দুষ্ট বহু খণ্ডের ভারতীয় ইতিহাসের বই। আরো সাম্প্রতিক কালে জনতা সরকারের আমলে আমরা দেখেছি প্রগতিশীল ইতিহাসবিদদের উপর সরকারী হামলা, বা বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের স্কুলস্তরের ইতিহাসের সিলেবাস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথমেই পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর তিনি এর ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন।

(১) প্রাচীন ভারতের সমস্ত কৃতিত্বকে বাড়িয়ে দেখা এবং হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ ও "হিন্দু যুগের" প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া।

(২) এরই উল্টোপিঠ—তথাকথিত "মুসলিম যুগ"-এর ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা।

(৩) রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়ে সমাজগঠন প্রক্রিয়া, ধর্ম, আচার ইত্যাদির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবহেলা করা।

কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান যেহেতু এদেশে সীমিত, তাই বিভিন্ন উপজাতির সম্মিলন, উচ্চতর স্তরের সংগঠন সৃষ্টি, সামাজিক কাঠামোকে মজবুত করা, এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

আজকের ভারতকে বুঝতে হলে এ সবের দিকে তাকানো আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসবিদরা এ কাজ করেন নি। (কলেজ স্তরে কোসাম্বীর বইয়ের প্রতি বহু শিক্ষকের অনীহা এমন কি তীব্র বিরোধিতা দেখিয়ে দেয়, আজও এই প্রবণতা কত শক্তিশালী।)

(৪) ইংরেজ সৃষ্ট প্রশাসনিক ঐক্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরা অনেকে গড়ে তুললেন ভারতের চিরন্তন ঐক্যের তত্ত্ব। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন জাতির ঐক্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার বদলে কল্পনা করলেন এক স্থিতিশীল ঐক্যের কথা। তার ফলে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বাস্তব ঘটনাকে বিচার করা হল না, তার শক্তি ও দুর্বলতা, তার ভবিষ্যত, সবই থেকে গেল "ইতিহাস"-এর বাইরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কেবলমাত্র পেশাদার ইতিহাসবিদরাই এই দোষে দুষ্ট ছিলেন না। ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা ভারতীয় জাতির ঐক্যের তত্ত্ব খাড়া করতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন জাতির প্রকৃত অবস্থা বিচার করেন নি (বা করতে রাজি হ'ন নি)। সবসময়ে এটা তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিও করে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাধীনতার অল্পকাল পরে যখন অধ্যাপক ভেরিয়র এলউইন ও অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নাগাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের যৌক্তিকতার কথা বলেন ও সতর্ক করে দেন যে এ কাজে দেরী হলে নাগারা ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে আদৌ থাকতে অস্বীকার করতে পারেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সতর্কবাণীকে অবহেলা করে। সরকারী দমননীতি নাগাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরেই নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

(৫) রাজনৈতিক বিশেষত্ব ও জাতীয় ঐক্যের খোঁজে দৌড় লাগিয়ে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা ভারতীয় সমাজের সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করেছেন, যেগুলি কিন্তু প্রকৃত সামাজিক ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল যেমন বর্ণভেদ প্রথা, পরিবার, গ্রামসমাজ ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তাঁরা কোন এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের দর্শন গড়ে তুলতে পারেন নি। অরবিন্দের ইতিহাস-দর্শন ঐশ্বরিক জীবনের প্রতি মানুষের যুগযুগান্তের মিছিল মাত্র। তবে, অরবিন্দের দর্শনে কিছুটা, এবং রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দর্শনের প্রধান অংশই ছিল ভারতের ইতিহাসকে তার স্বকীয়তার মাধ্যমে ধরার প্রচেষ্টা, কিন্তু "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাস রচনার যুগে এসে এ সমস্ত প্রচেষ্টা ভেসে গেল।

ভারতীয় ইতিহাস রচনার তৃতীয় পর্যায় ঐ "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা। "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাসের প্রধান অবদান ইতিহাসের উপাদানকে অনেক খুঁটিয়ে, অনেক বেশী বিশ্লেষণাত্মকভাবে ব্যাখ্যা করা, এবং পূর্বাহ্ণে কৃত ধারণার সঙ্গে তথ্যকে মেলাবার চেষ্টা না করে তথ্যের নিজস্ব গতিকে স্বীকার করে নেওয়া।

কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক" ইতিহাসের একটি বড় ত্রুটি হল যান্ত্রিকভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার আদর্শে যে নক্শা তৈরী করে ইতিহাস রচনা করা যায় না, এটা "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাসবিদরা বুঝতে পারেন নি। বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে মনে করেন তাঁদের কাজ মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (value-neutral)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সামাজিক পরিস্থিতি বিজ্ঞানের মূল্যবোধ স্থির করে দেয়। বাস্তবের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের চিন্তার এই যে ফারাক, সেটা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। মতাদর্শের' প্রতি সন্দেহ কার্যত ইতিহাসবিদদের ঠেলে দেয় যুগপৎ ভাববাদী দর্শন এবং যান্ত্রিকভাবে কার্যকারণ ব্যাখ্যার দিকে।

ধূর্জটিপ্রসাদ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পূর্ববর্তী বক্তব্যের জের টেনে। ইতিহাসলেখক সবসময়েই কিছু না কিছু ভেবে ইতিহাস লেখেন। কিন্তু সজ্ঞানে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করলে দৈববাদ, বা অন্য নানা অনৈতিহাসিকতত্ত্ব ইতিহাসের দর্শনে পরিণত হবে। মানবজাতির গোটা অভিজ্ঞতাটাই তার ইতিহাস। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা এই তিনটিকে সূত্রবদ্ধ করা, এবং ভবিষ্যতকে গড়তে শেখানোই ইতিহাসের প্রকৃত কর্তব্য।

৩.

একমাত্র ঐতিহাসিক বস্তুবাদই ধূর্জটিপ্রসাদের ঈপ্সিত কাজগুলি করার দাবী করে থাকে। তিনি তাই "On Indian History"তে আলোচনা করেছেন, ভারতীয় ইতিহাস রচনায় মার্কসবাদী পদ্ধতির সুবিধা কি কি।

বিদেশী ইতিহাসবিদরা অনেকেই ভারতীয় ইতিহাসকে বিচার করতে চেয়েছেন ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুরূপে। ধূর্জটিপ্রসাদের চোখে মার্কসের ইতিহাস-দর্শন এখানেই জিতে গেছে, কারণ এই দর্শন কোনো সম্পূর্ণ, এককালীন ব্যাখ্যা দিয়ে দেয় না। বরং মার্কসীয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এজন্যই যে তার সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাসের স্বকীয়তা, তার গতি, এবং তার সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্ণয় করা যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদের মধ্যে তাঁর নিজের চাহিদা মেটাতে গিয়ে এক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তিনি সেই সমস্ত ইতিহাসবিদদের উপর বিরক্ত যাঁরা ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে, তার কোনো একটি দিক বেছে নিয়ে তার ভিত্তিতে বিশ্বইতিহাসের ঐক্য খোঁজেন। এই "ঐক্য" নানা রকমের হতে পারে। কারো চোখে ইউরোপের ইতিহাসটাই আদর্শ—বাকিদের পাশফেল নির্ভর করছে ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য কতটা, তার উপর। অথবা কখনো বা টয়েনবীর মত কেউ প্রতিটি সমাজের ইতিহাসকে একই ফরমুলায় ফেলে দেন। প্রতিটি সমাজের উত্থান-পতন একই নির্দিষ্ট পথে ঘটেছে, এ কথা প্রমাণ করতে গেলে প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি যথেষ্ট অসম্মান দেখাতে হয়।

কিন্তু মার্কসীয় পদ্ধতি প্রতিটি দেশের ইতিহাসের স্বকীয়তাকে স্বীকার করে, এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে বিশ্বইতিহাসের কোনো রকম ঐক্যই মার্কসবাদ স্বীকার করে না। ধূর্জটিপ্রসাদ এ কথা বুঝতে পারেন নি, বা বুঝতে চান নি, অথবা মার্কসবাদের যে ব্যাখ্যা তিনি নিজে পেয়েছিলেন, তা তাঁকে একথা বুঝতে দেয় নি।

"On Indian History"-র ভূমিকায় তিনি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন ভারতীয় ইতিহাস অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে বৃহত্তর কিছু কারণ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দীর্ঘ জীবন এদেশে মতাদর্শকে অনেক বেশী স্বাধীনতা দিয়েছে। এই বক্তব্যের পিছনে যে চিন্তা রয়েছে, তা হল, স্তালিনকথিত ইতিহাসের চারটি স্তর (আদিম সাম্যবাদ, দাস ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা) পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ইতিহাসেই অমোঘভাবে পরপর এসেছে। একদিকে, এই যান্ত্রিক চিন্তা তাঁর নিজেরই সতর্কবাণীকে অবহেলা করে। অন্যদিকে, এর ফলে আধুনিক বিশ্বইতিহাসের যে প্রকৃত (এবং দ্বান্দ্বিক) ঐক্য, তিনি তাকে অস্বীকার করেন। অথচ তিনি ভারতীয় ইতিহাসবিদদের কাছে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই দাবী করে চেয়েছেন "a method which would pay due regard to the relativity of Indian history and yet put it in the perspective of the evolving world history."

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন যে তিনি Marxist ন'ন, Marxologist। বহুল ব্যবহৃত এই পদটির কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা কোথাও পাই নি। একটা কাজ চালানোর মত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—যিনি মার্কসবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা করেন কিন্তু নিজে মার্কসবাদী ন'ন, তিনিই Marxologist। এই

Marxologist-দের একটা বড় অসুবিধা কি, তা ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদ-ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যায়। মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, প্রয়োগ মার্কসবাদের মূল কথা। কিন্তু আধুনিক "মার্কসবাদী"র (যথা আলথুসার) দাবী সত্ত্বেও তথাকথিত "তত্ত্বগত প্রয়োগ"কে প্রয়োগ বলে মানা যায় না। Marxologist-দের তত্ত্বগত কাঠামোও তাই "cotemplative" স্তরেই থেকে যায়।

কিন্তু সময়ে সময়ে মার্কসলজিস্টরা অন্য ভূমিকাও নিতে পারেন—ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও। স্ব-ঘোষিত মার্কসবাদীরা সংশোধনবাদের পথ ধরলেও তাঁদের রেখে ঢেকে কথা বলতে হয়। কিন্তু মার্কসলজিস্টের সেরকম কোনো দায়দায়িত্ব নেই। স্তালিনীয় মেকী মার্কসবাদকে খাঁটি ধরে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ তাই তাকে সমর্থন করতে গিয়ে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ জানিয়েছেন, ইতিহাস-চিন্তার দিক থেকে ট্রটস্কি মার্কসবাদ ত্যাগ করেছিলেন। তার প্রমাণ ট্রটস্কির বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্ব। স্তালিনবাদী অভিযোগ অনুসরণ করে তিনি লিখেছেন, ট্রটস্কি ইতিহাসে ঐক্য খুঁজেছিলেন সমস্ত দেশ ও যুগের নিয়ম, ঐতিহাসিক বস্তু এবং পন্থাকে এক করে ফেলে। এই অভিযোগের তাৎপর্য বোঝা যায় যখন তিনি লেখেন, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বাস্তব বিকাশ ঘটে সংঘাত ও পরিপক্বতা, এই দুটি বর্গ অনুযায়ী। সংঘাত ঘটে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনের শর্তের মধ্যে কিন্তু পরিপক্বতার হিসেব নেওয়ার সময়ে উৎপাদন-সম্পর্কের যে- মানবকেন্দ্রিক চরিত্র, তাকে তিনি ত্যাগ করেন। তিনি স্বীকার করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী সামাজিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই স্বীকৃতির গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়, কারণ তাঁর সমগ্র রচনায় সুস্পষ্টভাবে অর্থনীতিবাদের ছাপ থেকে যায়। তিনি মার্কসের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। "No form of society can perish before all the forces of production which it is large enough to contain are developed, and at no time will outworn conditions be replaced by new higher conditions as long as the material necessities for their existence have not been hatched in the womb of the society itself." এই বক্তব্যের সঙ্গে কোনো বিরোধিতা থাকত না, যদি না ধূর্জটিপ্রসাদ এর অর্থ করে নিতেন: প্রতিটি দেশে একটি পূর্বনির্ধারিত স্তর পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি আবশ্যক।

তার আগে ঐ দেশের বিদ্যমান সমাজ বদলানোর কথা বলা যায় না, এবং (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহু তাত্ত্বিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে) তারপর বিদ্যমান সমাজ ধ্বসে যাবে, আর তার গর্ভে নিহিত উৎপাদনের নতুন শর্তসমূহ ঐ দেশে কায়েম করা যাবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই পরিপক্বতা তত্ত্বের উৎস কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী। ঐ কর্মসূচীকে সমালোচনা করে ট্রটস্কি যা লিখেছিলেন, তার একাংশ এখানেও প্রযোজ্য : The above-outlined sketch of the development of the world revolution eliminates the question of countries that are 'mature' or 'immature' for socialism in the spirit of that pedantic, lifeless classification given by the present programme of the Comintern. Insofar as capitalism has created a world market, a world division of labour and world productive forces, it has also prepared world economy as a whole for socialist transformation.

Different countries will go through this process at different tempos Backward countries may, under certain conditions, arrive at the dictatorship of the proletariat sooner than advanced countries, but they will come later than the latter to socialism.

মার্কসের যে-বক্তব্য ধূর্জটিপ্রসাদের ভিত্তি, তা সীমিতভাবেও প্রতিটি দেশের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজ্য ছিল ততদিনই, যতদিন (১) ধনবাদের বিকাশের ফলে বিশ্বধনবাদী বাজার গড়ে ওঠে নি, (২) পশ্চাদপদ দেশের প্রাক-ধনবাদী উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়নি এবং (৩) ঐ দেশগুলির প্রাক-ধনবাদী শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ণ মীমাংসা না হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী মূলধন রপ্তানীর ভিত্তিজনিত শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইটুকু উপলব্ধি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কাজ চালানোর মত ছিল। নারোদনিকবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্লেখানভ মার্কসবাদের এই ব্যাখ্যাই প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু একচেটিয়া ধনবাদ ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের ফলে ঐ উপলব্ধি অকেজো হয়ে পড়ল। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব দেখিয়ে দিল, অগ্রসর

দেশের মুকুরে পশ্চাদপদ দেশ নিজের ভবিষ্যতকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। রাশিয়া বা বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় ধনবাদ "পূর্ণমাত্রায়" বিকশিত হওয়ার আগেই (এখানে "পূর্ণমাত্রা" কথাটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে পশ্চিম ইউরোপীয় ও মার্কিনী ধনবাদের সমান) বিদেশী মূলধন লগ্নীর ফলে এক শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণী জন্মগ্রহণ করছে। ১৯০৫-এর বিপ্লবের সময়ে লেনিন বলছেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, কৃষকদের সঙ্গে আঁতাত গড়তে হবে এবং "উদারনৈতিক" ধনিকদের বিরুদ্ধে গিয়েই ঐ বিপ্লব সফল করতে হবে। ১৯১৭-র এপ্রিল থীসিসে ও অন্যান্য রচনায় তিনি ঐ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে উঠবে তার বিকাশের সূত্র মেনে নিয়ে বলছেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ শেষ করা যাবে। বিশ্বইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট দ্বান্দ্বিক ঐক্য ব্যতীত এই বিশ্লেষণ সম্ভব হত না—রুশ বিপ্লবই সম্ভব হত না। এই ঐক্যকে অস্বীকার করার অর্থ ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের বৈধতাকে অস্বীকার করা। ১৯১৮-য় কার্ল কাউটস্কি সে কাজই করেছিলেন "শাস্ত্রীয় মার্কসবাদের" নাম নিয়ে। ধূর্জটিপ্রসাদ ঐ পথে পা বাড়ালেও পুরোপুরি যেতে পারেন নি। তিনি তাই লেনিনকে বাদ রেখে ট্রটস্কির সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন চতুষ্টয়ের অভ্রান্ত দৈববাণীর প্রতি তাঁকে নতজানু হতে হ'ত না এবং তাই তিনি তাঁর যুক্তিকে আরো অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মার্কসের পদ্ধতির প্রধান কথা প্রযোগ, এ কথা স্বীকার করার পর মুহূর্তেই তিনি মার্কসের অন্যতম প্রধান দুটি কাজকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কমিউনিস্ট লীগের পক্ষে মার্কস ও এঙ্গেলস যে বিখ্যাত হস্তাহার লিখেছিলেন, তার চূড়ান্ত আহ্বান—"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও"—ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, অনৈতিহাসিক, কারণ তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেছিল!! আর এক মার্কসলজিস্ট মার্কসের জীবনীকার শ্রীম্যাকলেলান এই একই "দোষ" স্বীকার করে মার্কসকে দোষমুক্ত করতে চেয়েছেন এই বলে, যে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" মার্কস লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর দলের উগ্রপন্থীদের চাপে পড়ে—তিনি নিজে উদারনৈতিক ধনিকদের সঙ্গে আঁতাতের স্বার্থে বইটি আটকে রাখতে চেয়েছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসের যে দ্বিতীয় ভ্রান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, তার চরিত্র একই

রকম। প্রথম আন্তর্জাতিক নিয়ে মাতামাতি করে মার্কস যে খুব অন্যায় করেছিলেন, এবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

একই গ্রন্থে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে লেখক তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে নিজের বক্তব্য পরিবর্তন করেছেন। "History and personality" প্রবন্ধে তিনি দাবী করেছেন, তত্ত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ প্রয়োগে, এই ধারণা ভুল, এবং মার্কস কখনো এ কথা মনে করেন নি, অর্থাৎ মার্কসের সমস্ত প্রয়োগ ভুল হলেও মার্কসীয় পদ্ধতি অভ্রান্ত হতেই পারে, কারণ "the remoter the connexion, the more tenour the correlation"

ভারতীয় ইতিহাসের স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য ভাল করে বোঝা দরকার, এই সম্পর্কে সঠিক চিন্তা এবং মার্কসীয় পদ্ধতি গ্রহণের শুভাকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে ধূর্জটিপ্রসাদ তাই যে জায়গায় এসে পৌঁছলেন, তা হল: (১) মার্কসীয় পদ্ধতি থেকে প্রয়োগের, বিশেষত বিপ্লবী প্রয়োগের কেন্দ্রিকতাকে বাতিল করা দরকার; (২) ইতিহাসে কোন ঐক্য নেই—সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্বধনবাদী ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় না রেখেই তাই এক একটি নির্দিষ্ট দেশের ইতিহাস রচনা করা যায়। তবু তিনি দাবী করলেন, তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাস কেবল অতীতের রোমন্থন নয়, ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির নিয়ামক।

এই দুই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি এক তৃতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তা হল, মার্কসবাদ রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে জনপ্রিয় হওয়ায় এবং তার প্রবক্তাদের অ-গবেষকসুলভ অসহিষ্ণুতার ("unscholaly impatience") ফলে (অর্থাৎ "অবজেক্টিভ" প্রক্রিয়ার হাতে, কোনো এক অজানা "পরিপক্কতার" মুখ চেয়ে, বিপ্লবী প্রয়োগ বন্ধ করতে অস্বীকার করার ফলে) মার্কসীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা করার অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ইতিহাসবিদদের উচিত, এই অসহিষ্ণুতা, সমাজকে এক নির্দিষ্ট গতীর ছকে ফেলার এই প্রবণতাকে এড়িয়ে গিয়ে মার্কসবাদের প্রকৃত তত্ত্বগত প্রয়োগ করা। অর্থাৎ বিপ্লবী প্রয়োগের পরিবর্তে ইতিহাসবিদের ব্যাখ্যা দেখা দেবে সমাজ বদলের প্রধান হাতিয়ার রূপে।

ইতিহাসের কর্তব্য ও পন্থার ধূর্জটিপ্রসাদ কৃত ব্যাখ্যার অবশ্যম্ভাবী ফল, ভবিষ্যত ইতিহাস গড়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা। ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসবিদের কর্তব্য কি, তা বারংবার বললেও, স্ব-নির্দিষ্ট পথে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন নি। এটা খুব আকস্মিক নয়, কারণ তা করতে গেলে তাঁরই তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁকে সমাজ বদলের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হত। সেই নেতৃত্ব তখনই দেওয়া যায়, যখন বিদ্যমান শ্রেণী-

সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি বুঝে বিপ্লবী সংগঠন গড়া হয়। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মার্কস-লেনিনের সহস্রহস্ত দূরে। তাঁর ইতিহাস-চিন্তার এই দিকটি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমরা আগেই দেখেছি, প্রয়োগের সার্থকতাই তত্ত্বের যাথার্থ্য নিরূপণ করে, এ কথা ধূর্জটিপ্রসাদ মানেন নি। সুতরাং তাঁর কাছে "contemplation" এবং "action"-এর পার্থক্য বোঝা কঠিন। নতুন সমাজ গড়ার জন্য বিদ্যমান সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। কিন্তু ঐ ত্রুটি অপসারণের জন্য, ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তার সমাধান করার জন্য প্রয়োগেরও দরকার। ধূর্জটিপ্রসাদ দ্বিতীয় বিষয়ে মার্কসবাদের এক ক্যারিকেচার খাড়া করেছেন। "আমরা ও তাঁহারা" গ্রন্থে তাঁর মত শ্রমিক-কৃষকের নিজের জোরে বেশীদূর এগোনো যায় না। তাই অগ্রগতির দিক নির্ণয় করবে পার্টি, যার মধ্যে "বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী উভয়েই থাকবে"। যাদের মধ্যে কেবল রাগ, ক্ষোভ ও ঈর্ষা থাকে, তারা নিশ্চয় এই দুটি বর্গের কোনোটিতেই পড়েন না। পার্টি বিপ্লবের ছক কাটবে, হুকুম দেবে, আর "বিপ্লবের majority," অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় বিপ্লবের অনুমতি দেবে...অবশ্য লিখিত-পড়িত নয়, এমন কি অনুমতি দিয়েছে তা না জেনেই। ধূর্জটিপ্রসাদ তাই শ্রেণীর ও শ্রেণী-বিরোধের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে, শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী বিজয়ই যে মানবজাতিকে প্রকৃত ইতিহাসের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে, এ কথা তিনি স্বীকার করেন নি। মার্কসের কথাতেই বলতে হয়, মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য এই নয় যে মার্কসবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেছিল। শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতি গিবনের রোম সাম্রাজ্যর পতনের ইতিহাসেও ছিল। মার্কসের অবদান ছিল সর্বহারা একনায়কত্ব এবং তার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের তত্ত্ব যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠা করা। এই স্বীকৃতি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসীয় ইতিহাস বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বা মার্কসীয় ইতিহাস-দর্শন আত্মস্থ করতে পারেন নি। বুঝতে পারেননি, যে ভারতীয় বিপ্লব তার সমস্ত স্বকীয়তা সত্ত্বেও, বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গরূপেই বিজয়ী হতে পারে। বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবীর অভ্রান্ত নেতৃত্ব (নাকি কর্তৃত্ব) নয়, প্রলেতারিয় গণতন্ত্রই তার ভিত্তি হবে। তিনি তাই মনে করেছিলেন, শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকদের জয় এবং শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপর একাধিপত্য খর্ব হওয়াটা পথ নয়—বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উৎপাদনের উপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে শ্রেণীবিরোধের ভীষণতা থাকবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হয়ত শিশুপাঠ্য গল্পলেখা যায়, কিন্তু ভবিষ্যত ইতিহাস রচনা করা যায় না।

বৈচিত্র্যের ঐক্যভাবনায় স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব

সুজিৎ ঘোষ

ধূর্জটিপ্রসাদের নানা ভাবনার ইংরেজী প্রবন্ধ সংকলন Diversities—১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা স্থানে প্রকাশিত প্রবন্ধ অথবা বক্তৃতার সমাহার। তাঁর শেষ বাঙলা প্রবন্ধ সংকলন 'বক্তব্য' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু 'বক্তব্যে'র প্রবন্ধগুলিও দীর্ঘ একটি পর্বের, নানা বিষয়ে এবং নানা স্থানে রচিত। 'আমরা ও তাঁহারা' পুরনো বই, ১৯৫৬ সালে পুনঃপ্রকাশিত।

এই ধরনের প্রবন্ধ সংগ্রহের পাঠককে সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা, ১৯২৬ সালে রচিত প্রবন্ধের রচয়িতা, সময় ও সমাজের পরিবর্তনে, ১৯৫৬ সালে উপনীত হয়ে ভিন্ন ভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভাববেন। মনন ও চিন্তায় এ-ধরনের পরিবর্তন দ্রুত পরিবর্তনশীলতার যুগে প্রত্যাশিত, তাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই গ্রন্থের প্রবন্ধের সূচনায় ও সমাপ্তি-প্রবন্ধে লেখকের মতামতের দীর্ঘ বা হ্রস্ব ব্যবধান থাকলে, ভাবনার উচ্চাবচতা পাঠককে ভাবিয়ে না তুলে, বিভ্রান্ত করতে পারে।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার বৈচিত্র্যের বহুধা রূপ সত্ত্বেও, প্রবন্ধের গঠনে ও বক্তব্যে পরিণতির ছাপ সুস্পষ্ট প্রথমাবধিই।

ধূর্জটির প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'আমরা ও তাঁহারা' এবং শেষ প্রবন্ধ সংকলন 'বক্তব্যে'র মতামতে তাঁর চিন্তাচেতনার এই পরিণত রূপের স্থায়িত্বের দিকটি উপলব্ধ হবে। 'আমরা ও তাঁহারা'-র বৈঠকী মেজাজ অবশ্য পরবর্তী প্রবন্ধ সংকলনে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'আমরা ও তাঁহারা' সংকলনের সঙ্গে ১৯৫৭-তে প্রকাশিত 'বক্তব্যে'র আলোচ্য মূল বিষয়গুলির মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি বক্তব্যের ধারাটিও অপরিবর্তিত। কি এই ধারাটি? ধারাটি না বলে, ধারাগুলি বলাই মনে হয়, উচিত হবে। কেননা, ধূর্জটির মধ্যে স্পষ্টত দুটি মানুষ বা মনকে প্রত্যক্ষ করা চলে। প্রথম ধূর্জটি, যিনি শিল্প সাহিত্যের সঙ্গীতের সচেতন রসিক এবং যাঁর বিশ্বাস এই রসবোধ শেষপর্যন্ত ব্যক্তির স্বীয় চেষ্টা ও সামর্থ্যে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে এবং সে আস্বাদন-প্রয়াস একান্তই ব্যক্তিগত। শুধু তাই নয়, আস্বাদনের ফলও একান্তই এককের, ব্যষ্টির। শিল্পরসবোধ সম্পর্কে তাঁর এই

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা ধূর্জটির সামাজিক ভাবনার রূপটি থেকে স্বতন্ত্র। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ শিল্পবোধের ক্ষেত্রে বোদ্ধাকে 'সহৃদয় সামাজিক' বলেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষার সাধারণ-বন্ধনটি ব্যক্তিসমূহের মধ্যে সামাজিক বন্ধনকে বিস্মৃত হতে দেয় না। কিন্তু বিমূর্ত শিল্পের ক্ষেত্রে ভাষার এই 'সামাজিক' উপস্থিতি থাকে না—যেমন সঙ্গীতে ও চিত্রকলায়। ধূর্জটি বিশেষ ভাবে এই শিল্পমাধ্যম দুটিতে স্বীয় রসবেত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভাষার বন্ধনাতীত এই দুই মাধ্যমে তাই, প্রাকৃত অর্থে, 'সামাজিক' রীতি মানতে তিনি ছিলেন নারাজ।

অথচ, দ্বিতীয় ধূর্জটি নিজেকে অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ বলে মনে করেছেন। এবং অর্থনীতি তাঁর অধিতব্য ও অধ্যাপনার বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর নিজস্ব আগ্রহ সমাজতত্ত্বে। সমাজতাত্ত্বিক ধূর্জটি আবার সাধারণ মানুষ ও দেশের মঙ্গল-কল্যাণ ভাবনার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ'কে পাশে সরিয়ে রেখে, সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নে ব্যষ্টির ক্ষয়ক্ষতিও স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। মূলত এই ভাবনার গোড়ায় রয়েছে উপযোগবাদীদের greatest happiness of the greatest number-এর ধারণা। এবং এই ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশী। বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, উদারনৈতিক বুর্জোয়া চেতনার এই সমষ্টির কল্যাণের ধারণার মধ্যে মার্কসবাদের নৈতিকতার বীজটি লক্ষ্য করা যাবে। ধূর্জটিও 'সবুজ-পত্র' গোষ্ঠীর উদারনৈতিক আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠায়, সমাজ বিবর্তনের প্রশ্নে মার্কসবাদকে স্বীকার করেছেন উদারনৈতিক মানবতাবাদ রূপেই।

কিন্তু যখনই শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিতে তাঁর পদচারণা, তখনই দেখা যাবে যে ধূর্জটি মার্কসবাদী নন। অবশ্য, তিনি যে মার্কসবাদী নন, এবিষয়েও তার বক্তব্য স্বচ্ছ, তিনি 'নিজেকে Marxologist বলা চলে' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও ভান নেই। কেননা, ধূর্জটি নিজেকে কখনও খুব ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে চান নি।

বরং, তাঁর নিজেকে প্রক্ষেপে যে সঙ্কোচ, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, ভারত তথা বাংলাদেশের উদারনীতিবাদী যুগটির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের সীমা সম্পর্কে অত্যন্ত বিনম্র। যেমন, Diversities-এর মুখবন্ধেই তিনি বলেছেন, 'There is one more point I want to make. My readers think that my interests are more than onesided, that they are lost in their manifoldness, and that it could have been better if they were limited to one or two. But that is exactly my difficulty

I was trained to think in large terms. It made me look closely into details, but it made me search for the wood behind the trees. My professors, friends and people I have met made me feel that largeness of the canvas. ..Right from the start I had accepted the synthesis of the social sciences, and it has followed me ever since. Perhaps, my generation is over by now. .'

এই ধরনের বিনীত বক্তব্য তাঁর অন্য রচনায়, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাধর্মী রচনা 'মনে এলো' এবং 'ঝিলিমিলি'-তেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যের আপাত-বিনম্রতার নির্মোক মোচন করলে বক্তব্যটির আত্মশ্লাঘার দিকটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কেননা, অতিক্রান্ত যে-যুগের দিকে তাকিয়ে তিনি বিশালতা দেখতে পান সেখানে "আমার তিলমাত্র আফশোষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎ চাটুয্যে, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির সঙ্গে তুল্যমূল্য হিসেবে মিশতে পারতাম, কোনো তফাৎ থাকত না।" (ঝিলিমিলি পৃ. ৬৫) তাছাড়াও, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুধীন দত্ত প্রভৃতিরা তো ছিলেনই। সেই যুগের পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রজন্মের সবকিছুকেই বামনাকৃতি ও অবমূল্যায়িত মনে হতে পারে তখনই, যখন অতীতকেই আরাধ্য মনে হবে, ইতিহাসের চলমান গতি চেতনায় অনুপস্থিত থাকবে। যে-বক্তা বলেন যে synthesis of the social sciences-এর ধারণাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি এটা কিন্তু স্বীকার করেন না যে, মার্কসবাদ সেই 'সমন্বয়'কেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। অথচ, ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি অচেতন তিনি নন, কেননা, তিনিই লেখেন "Perhaps, my generation is over by now"। একটা ঐতিহাসিক পর্ব সমাপ্ত হতে চলেছে, তিনি যে অন্য প্রজন্মের মানুষ, এই বোধ সর্বদা তাঁর অবচেতনে ক্রিয়াশীল ছিল। যুগের এই ক্ষয়িষ্ণুতার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তথা মার্কসবাদী ব্যাখ্যা তিনি কোথাও বিস্তৃতভাবে করেন নি। ফলে, স্বীয় দেশকালের যে ব্যক্তিবর্গকে নৈকট্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের মতাদর্শের শ্রেণীগতরূপ এই সমাজতাত্ত্বিকের চোখে স্বচ্ছ হয় নি। গান্ধী, আজাদ বা নেহেরু সম্পর্কে তাঁর বিক্ষিপ্ত মতামতগুলি এ-বক্তব্যের প্রমাণ। সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা প্রশ্নাতীতভাবে সত্য নয়, যেমন "ডালেস নীতিপ্রধান লোক, ক্যালভিনিষ্টিক, ক্রুশ্চেভ বিশ্বাস করেন ঐতিহাসিক নিয়তিতে"

...(ঝিলিমিলি পৃঃ ১৫)—এ ধরনের উক্তি ১৯৫৮ সালের ; কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে সেই 'বিশালতা-সম্বলিত' প্রজন্মের দূরদর্শিতা প্রমাণ করে না। এবং সে কারণেই তিনি যখন লেখেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাই ভাবতে যে জওহরলালের আশীর্বাদে কংগ্রেস ধনকুবেরদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিলে !' (ঐ-১৫)—তাঁর এই আশ্চর্য হয়ে যাওয়া, বিস্ময়বোধ synthesis of social sciences-এর ধারণা-জাত মনে হয় না। একই স্থানে তিনি লেখেন, "সম্পূর্ণানন্দ যথার্থ কৃষ্টিমান আর জওহরলাল দোষেগুণে পুরো মানুষ।" (ঐ-১৫) অথচ এই বিশ্লেষণ মার্কসবাদী বিশ্লেষণও নয়, সমাজতাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও নয়।

অবশ্য তিনি লিখেছেন, "আমি পোলিটিক্যাল জীব নই, কেবল ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই। সব পার্টির সঙ্গেই আমার যোগ আছে।" (ঝিলিমিলি পৃ. ৫৩) কিন্তু, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই অ-রাজনৈতিকতার ঘোষণা কার্যত রাজনৈতিক, একধরনের উদারনৈতিকতার রাজনীতি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধূর্জটির বক্তব্যগুলির বিশ্লেষণ করলে, পূর্বোক্ত তাঁর আত্মশ্লাঘার সঙ্গে তাঁর দীনতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—গতায়ু যুগের যখনই তিনি প্রতিনিধিত্বের দাবিদার, (Perhaps, my generation is over by now) সমস্ত বড় কিছুর সৃষ্টি তখনই হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীরা, যারা 'trained to think in large terms' নয় তাদের জন্যে নতুন করে কিছু করার কথা তিনি ভাবেন না। কেন ? কারণ কি এই যে ক্ষয়িষ্ণু যুগ কর্ম থেকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সরে আসে, পুরাতনের মনোহারী ব্যাখ্যা করে, আত্মরোমন্থন করে ? বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এড়াতে চায় বা দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব দেয় ?

"...I shall like to say that my living has been more or less integrated. First books, then ideas and lastly, experience—that has been my way. It is that of many others, but it is mine also."—তাঁর এই মননবৃত্ত বিশ্বকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে তৎপর হয়েছে, পরিবর্তিত করতে প্রয়াসী হয় নি।

ধূর্জটি দুই যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে—দেশপ্রেমের ও জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের তুঙ্গকালে তিনি যৌবনে উপনীত এবং তাঁর পরিণত প্রৌঢ়ত্বের যুগে জাতীয় নেতাদের আপাতরম্য আবরণ উন্মোচিত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু, সেখানে সুনির্দিষ্ট কোনও মতাদর্শ নিয়ে বা কোনও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে প্রত্যক্ষভাবে তিনি দাঁড়ান নি। তিনি ভারত-ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে

কোশাম্বির মতো ইতিহাস বা পুরাতত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু ইতিহাস বিষয়ে ব্যাখ্যায় এগিয়ে এসেছেন, সমগ্র ইতিহাসের ধারণাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আকার দিয়েছেন : (১) ইতিহাসের কাছে প্রার্থিত অপূর্ণ প্রত্যাশা কি এবং কোন দর্শন শুধুমাত্র তা পূর্ণ করতে পারে? (২) ভারতের লিখিত ইতিহাসের ত্রুটিগুলি কি এবং যা ভারতীয় বা পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা দূর করা যাবে? (৩) সত্যিই কি কোনও ইতিহাসের দর্শন সম্ভব? (Diversities—১০৭)—ধূর্জটি-প্রার্থিত ওপরের তিন প্রশ্নের উত্তর ভারতের ইতিহাসকে কোনও ভাবেই প্রভাবিত করে নি—এটাই রূঢ় বাস্তব।

ধূর্জটি বলেন, "...when a society is undergoing revolutionary change, the emphasis is on the side of history. Then all thinking men look to the past for guidance or glorification, for continuity or confidence, for the support of the triumph of experience over tradition."—এ চিন্তা বুর্জোয়াদের বিপ্লবগুলিতেই দেখা গেছে; গ্যারিবল্ডি বা নেপোলিয়ান যখন যুদ্ধে এগিয়েছেন তখনই তাঁরা অতীতের গৌরবের কথা তুলে ধরেছেন। এদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারাও তা করেছেন। কিন্তু অকটোবর বিপ্লবের লেনিন বা চীন বিপ্লবের মাও, নির্বিচারে কখনই অতীত রাশিয়া বা চীনকে গৌরবান্বিত করেন নি। এতে ধূর্জটির খণ্ডিত ইতিহাসবোধই প্রমাণ হয়।

বাস্তববোধের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মিলন না ঘটার ফলে, ধূর্জটির চিন্তায় "দেশে কেবল পলিটিকস আসা মানেই কালচারের ক্ষতি। পলিটিকসের অর্থই হোলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে কারবার এবং তার বেশি নয়।"—এই চিন্তাই তাঁকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ করে তোলে, যা কার্যত প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার সক্রিয় বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। সমকালের ভারতীয় অর্থনীতির ধারাটি তাঁর লেখাগুলিতে খুব স্পষ্ট নয় এবং নিজেকে Marxologist বললেও, ভারত-ইতিহাসের কোনও পর্বের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাতেও তাঁর প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। বরং স্বীয় সুবিধা অনুসারে তিনি নিজেকে কখনও সমাজতাত্ত্বিক, কখনও বা অর্থনীতিবিদ বলে আখ্যা দেন। মার্কসবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে এই লুকোচুরি খেলার সুযোগ থাকতো না, বরং বিশেষ মুহূর্তে হয়তো তত্ত্বকে প্রধান করে দেখাতে হতো, অন্য মুহূর্তে প্রয়োগকে দিতে হতো প্রাধান্য।

অন্যান্য কতকগুলি ভাবনার ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা সমকালের সীমাবদ্ধতায় গণ্ডীবদ্ধ।

ভারতের কমিউনিষ্টদের অনুসৃত 'জনযুদ্ধের' লাইনের প্রতি তাঁর অব্যাহত আশাবাদ প্রায় পার্টি-লাইন-অনুগত অন্ধ সি-পি-আই-এর মতো। স্তালিনযুগের অনভিজ্ঞতাপ্রসূত অজ্ঞতা ও বিশ্বাসের তিনিও একজন শরিক, ধূর্জটির জীবৎকালেই নতুন ভারত-শাসকরা পরিকল্পিত অর্থনীতি (five year plan ইত্যাদি) শুরু করে, সেযুগের বহুজনের (স্তালিন বাদে) মতো ধূর্জটিও ভেবেছেন যে পরিকল্পিত অর্থনীতি সর্বরোগহর দাওয়াই,—কোন্ শ্রেণীর রাষ্ট্র এই অর্থনীতি কাজে লাগাচ্ছে, তা ভাবেন নি। পদ্ধতিকে তিনিও অন্য অনেকের মতো শ্রেণীনিরপেক্ষ বলেই মনে করতেন বলে মনে হয়।

ভারতীয় জীবনে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে ধূর্জটি আজীবন নিরত থেকেছেন। তাঁর কাছে সে ঐক্যের ক্ষেত্র সংস্কৃতি। নির্দিষ্ট স্থান-কালে তিনি সে সংস্কৃতিকে এক ও অখণ্ড মনে করেছেন। রাজনীতি সংস্কৃতিকে নষ্ট করে ফেলতে পারে. (Dive.sities-১০৬) এও তাঁর ধারণা। কিন্তু, অধীত অগণিত গ্রন্থের বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট। তাঁর অধ্যয়নের বিরাট ব্যাপ্তি চমক লাগায়। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর মতামত থাকলেও, ধূর্জটিপ্রসাদের নিজস্ব কোন মতাদর্শকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। আবার, মতামতের ক্ষেত্রগুলিতে তিনি মার্কসবাদের বিরোধীদের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেছেন—এ সত্যও ভোলা চলে না।

'আমরা ও তাঁহারা' থেকে 'Diversities', 'বক্তব্য' পর্যন্ত তাঁর চিন্তার, অধ্যয়নের বিস্তার ঘটলেও, সারাৎসারে তার বিবর্তন ঘটে নি। তাঁর এই চিন্তার মূলে থেকেছে উনিশ শতকী মঙ্গল ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণা।

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত-ভাবনা

অনন্ত কুমার চক্রবর্তী

"আমার লেখার একটা বদনাম আছে—তাতে কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না, এবং বোঝাও যায় না স্পষ্টভাবে।" বিশেষত আলোচনার ক্ষেত্র যেখানে কথা ও সুরের সামান্তপ্রদেশ সেখানে আলোচনার রীতিনীতিও সুশাসিত প্রদেশের মতো নয়। "আর কী সিদ্ধান্তে আসবো? আমিও খুঁজছি, আসুন আপনারাও খুঁজুন, কিছু পাওয়া যায়, ভাগাভাগি করা যাবে।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৬৪)। এই মনোভঙ্গি ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় সর্বত্র। সংগীত-ভাবনাতেও তারই প্রতিফলন। এই কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের কোনও মত চরম সিদ্ধান্ত নয়, কোনও কাটাছাঁটা ছকও তা থেকে টেনে বের করা কঠিন। চিন্তা ও অভিজ্ঞতার চলিষ্ণুতাই এর বৈশিষ্ট্য—ভারতীয় সংগীতে আলাপের মতো।

তথাপি এই চলিষ্ণুতা আকস্মিকতার সমাবেশমাত্র নয়। সমাজ ও ইতিহাসের কাছে তা বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। "সংগীতেও একটা ইতিহাস আছে।...আমি রবীন্দ্রসংগীতের দান বুঝতে চাই কালের প্রতিবেশে। সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান হলে রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারবো, এবং কীর্তন ও আধুনিক রচনার বিচার করতেও সক্ষম হবো। সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানি সংগীতপদ্ধতির চলিষ্ণুতাও ধরা পড়বে। ('কথা ও সুর', উপক্রমণিকা)। এই কারণেই তাঁর 'ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা' নামক ইংরেজি গ্রন্থে এবং অন্যত্রও একটা সমাজতাত্ত্বিক ঝোঁক স্পষ্ট দেখা দেয় এবং তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। উক্ত 'উপক্রমণিকা' গ্রন্থের প্রথম বাক্যেই তিনি বলে বসেছেন, "ভারতীয় সংগীত যেহেতু সংগীত সেহেতু তা ধ্বনিসমূহের বিন্যাসমাত্র, আর যেহেতু ভারতীয় সেহেতু নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসেরই ফসল।" কাজেই আমাদের সংগীতালোচনার ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ যে মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছেন—বিশেষত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর বিশেষত্বই হলো "ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় করা।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৩৫)।

স্পষ্টত, তাঁর আলোচনা তথাকথিত ওস্তাদদের জন্য নয়। ওস্তাদ ছুঁধরনের—

বড়ো ও ছোটো। সত্যিকার বড়ো ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের ঔদার্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁদের কাছে "নতুন কথা শোনাবার ধৃষ্টতা" তাঁর নেই। অপর পক্ষে ছোটো ওস্তাদদের গোঁড়ামি দেখে তিনি হতাশ। ('কথা ও সুর', পৃঃ ১৯)। (ক) যাঁরা যন্ত্রসংগীত ভিন্ন অন্য সব সংগীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, (খ) যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু সংগীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস, (গ) যাঁরা বলেন, দেশে বাংলা গানেরই ভবিষ্যত আছে, হিন্দুস্থানি ঢঙ্ অচল, কিংবা (ঘ) যাঁরা বলেন, হিন্দুস্থানি গানই চলবে, বাংলা গানের আয়ু দুদিনেই শেষ হবে—ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা তাঁদের জন্য নয়। "আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সংগীতে কথাকে সাপের বিষের মতো নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানি সুরপদ্ধতিটাই বাংলা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন, এবং তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৩৮)।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই সমস্ত আলোচনার পিছনে একটা সূক্ষ্ম কর্তব্যবুদ্ধিও কাজ করে গেছে। সেটি হলো, ভক্তি ও ভালোবাসাকে "শ্রদ্ধায় পরিণত করা"। "ভালোবাসি রক্তের টানে, শ্রদ্ধা করি নানা কারণে। বাংলা গান যদি না ভালোবাসতাম তবে শ্রদ্ধার দিক ও তার গুরুত্ব পরিবর্তিত হতো। যদি না শ্রদ্ধা করতাম, কেবল ভালোই বাসতাম, তবে আমার প্রাদেশিকতাই প্রমাণ পেতো। ভালোবাসা দেখানো মনের অসংযম, অতএব প্রবন্ধের বিষয় নয়।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৪৭)। "একবার সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের রবিঠাকুর আর কী চান বলতে পারো? মাথা বিকিয়ে দিয়েছি ওঁর পায়ে, তবু আশা মেটে না!' এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথ সমাজপতির চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাথার কেনা বেচা চান নি, যার মাথা তার কাঁধেই থাক চেয়েছিলেন। হৃদয় থাকলে মাথা থাকতে নেই?" ('বক্তব্য', পৃঃ ১৩০)। ধূর্জটিপ্রসাদ এই শ্রদ্ধারই কারণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন—ব্যক্তিগত রুচিকে একমাত্র মানদণ্ড না করে—বিচারের সামান্যভূমিতে। অবশ্য মার্জিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভালো লাগা না-লাগাও বিচারের একটা প্রধান কষ্টিপাথর।

এই বিচারের চেষ্টায় ইতিহাস ও সমাজের পরিপ্রেক্ষণী অপরিহার্য, আর তুলনামূলক আলোচনায় বুদ্ধি ও ঘটনার প্রাধান্যও একান্তভাবে স্বীকৃত।

১.

ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্যতায় ধূর্জটিপ্রসাদ খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন মনে হয়

-না। তাঁর মতে ভারতবর্ষ কখনোই বিশ্ব-ইতিহাসের অঙ্গন থেকে বাইরে থাকে নি, বরং অধিকাংশ সময় সক্রিয়ভাবে, কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে, তার অভ্যন্তরেই থেকেছে। সংগীত বিষয়ে বলতে গেলে, ধ্বনিবিন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ বেশ কিছু কাল পর্যন্ত কি ভারতবর্ষে কি ইউরোপে ছিল একই ধরনের—যতোদিন উভয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপট ছিল মোটামুটি এক। যদি উভয় দেশের পরিশীলিত সংগীতের দিকেই কেবল দৃষ্টি রাখি তা হলেও দেখবো, (ক) উভয় অঞ্চলেই ধর্মসংগীত ও লোকসংগীত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের অপরিহার্য পটভূমি, (খ) উভয় ক্ষেত্রেই ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত সংকটের মুহূর্তগুলোতে নবজীবনের জন্য জনগণের সংগীত থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে, অবসরমতো নিজেকে বিস্তার করেছে ও পরিশেষে ওরই ভিত্তিতে নানা পরিশুদ্ধ রূপ গড়ে তুলেছে, (গ) সমবেত জীবনযাত্রার নানা আচরণে সংগীত ছিল উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে স্বীকৃত। (ঘ) যতোদিন রাজসভা, পুরোহিততন্ত্র আর দৃঢবদ্ধ সংঘ-সংগঠনগুলো জীবনযাত্রার রীতিনীতিকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পেরেছে ততোদিন ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীত সমভাবেই স্বর (melody) ও স্বর-ঐক্যের (harmony) পরিচয়চিহ্ন বহন করে এসেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাজ ও সংস্কৃতির যুগসন্ধিকাল থেকে ইউরোপীয় সংগীত স্বর-ঐক্যের ওপর জোর দিতে সুরু করেছে। কিন্তু ভারতীয় যন্ত্রসংগীতেও অনেকগুলি স্বর ঐক্যগত প্রকরণ রয়ে গেছে যেগুলো যে কোনও ভালো যন্ত্রীই দেখাতে ভোলেন না—অবশ্য সেটা তাঁরা দেখান স্বরের মূল কাঠামো কায়েম হওয়ার পর। কাজেই তফাৎটা নিছক স্বর বনাম স্বর-ঐক্যের নয়, তফাৎটা আসলে ঝোঁকের। এই পার্থক্য ঘটেছে ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীতে 'টেম্পারড্' গ্রামের প্রযুক্তি-ঘটিত আবিষ্কারের ফলে। ভারতবর্ষে 'টেম্পারড্'-গ্রাম গৃহীত হয় নি, রয়ে গেল সেই পুরনো কড়িকোমলযুক্ত গ্রাম। এদেশে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে একটি মাত্র —প্রায় চারশ বছর আগে—যখন পুরনো স্বরগ্রামের জায়গায় আদর্শ হিশেবে, শুদ্ধ স্বরগ্রাম হিশেবে, দেখা দিয়েছে বিলাবল গ্রাম (অর্থাৎ পিয়ানোর 'সি' থেকে সুরু হওয়া সমস্ত সাদা পর্দাগুলি)। দুই ধারার সংগীতের মধ্যে যেটা সত্যিকার পার্থক্য সেটা হলো, ইউরোপে 'টেম্পারড্' গ্রামের ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে স্বরবিন্যাস যাতে দুই পাশাপাশি পর্দার মাঝখানে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ব্যবধান বর্তমান, আর ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে কড়িকোমলযুক্ত গানের ভিত্তিতে রচিত স্বরবিন্যাসরীতি যাতে মীড়ের অর্থাৎ এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। ('ভারতীয় সঙ্গীতের উপক্রমণিকা')।

এখানে তর্কের কিছু অবকাশ থেকে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের এই শেষের সিদ্ধান্তটি অবশ্যই মান্য। তাঁর এ-কথাও ঠিক যে ইউরোপীয় সংগীতে 'মেলডি' মোটেই উপেক্ষিত নয়, এবং ভারতীয় সংগীতেও 'হার্মনি' কোনও না কোনও ভাবে উপস্থিত। পার্থক্যটা কেবল ঝোঁকের। কিন্তু ঝোঁকের এই পার্থক্য থেকে কি প্রতিক্রিয়া ও অভ্যাসের এমন কোনও বড়ো প্রভেদ গড়ে ওঠে না যাকে বলতে পারি মৌলিক অথবা গুণগত? ভারতীয় সংগীত ইউরোপীয় কানে কেন এতো একঘেয়ে ঠেকে, ভারতীয় কানেও বা ইউরোপীয় সংগীত প্রায়শ কেন মনে হয় কোলাহল? ধূর্জটি-প্রসাদ যন্ত্রসংগীতে কিছু স্বর-ঐক্যগত প্রকরণের কথা বললেন, কিন্তু কণ্ঠসংগীতে? কাজেই এদেশীয় সংগীতের সব চর্চা ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সুর, এ-কথা বললে বোধহয় অন্যায় হয় না—মীড়ের প্রাধান্যও সুরেরই বিশিষ্ট বিন্যাস-প্রকরণ। অপর পক্ষে প্রধানত হার্মনির ওপরেই আধুনিক ইউরোপের সংগীত-সৌধটি সমুচ্চ হয়েছে, এ-কথা কি ঠিক নয়? ধূর্জটিপ্রসাদ আজ জীবিত থাকলে প্রশ্নটি সবিনয়ে তাঁরই সামনে হাজির করা যেতো।

ভারতীয় সংগীতের প্রবহমান ধারায় সবচেয়ে বড়ো একক দানটি দেখা দিয়েছিল পাঠান ও মোগল রাজত্বের সন্ধিক্ষণে। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ পাদে ও ষোড়শ শতাব্দের প্রথম পাদে ইউরোপীয় সংগীতেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। দুদেশের এই পরিবর্তনের চরিত্রে যে পার্থক্য সেটা প্রধানত দেখা দিয়েছিল উভয় অঞ্চলের রেনেসাঁসের চরিত্রগত বৈচিত্র্যের কারণে। ভারতবর্ষে পরিবর্তনটা এসেছিল ভক্তিমার্গ থেকে, যদিও এর সারবস্তু যতোটা ধর্মীয় ততোটাই সামাজিক বিচারে বৈপ্লবিক। ইউরোপে পরিবর্তনটা কিন্তু এলো একটা ধর্মনিরপেক্ষ, প্রোটেস্ট্যান্ট ও জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে। উভয় দেশেই ছিল প্রচলিত মতে অবিশ্বাস, মানবতাবোধ আর রাজসভার আনুকূল্য। উভয় দেশেই পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকায় ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণী। কিন্তু ভারতবর্ষে এই ব্যবসায়ী শ্রেণী নিজ অবস্থানে টিকে থাকতে পারলো না, যেমন পেরেছিল তাদের পশ্চিমী সমব্যবসায়ীরা। ফলে এদেশের ক্ষেত্রে বিরাট অভ্যুত্থান স্তিমিত হয়ে এলো করুণ আত্মসমর্পণে, প্রাচীন সংস্কারের কাছে ঘটলো নবীনের পরাজয়। এদিকে মুসলমান শাসকেরাও একটা সময়ে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, সমস্ত ঝোঁকটা তাঁদের গিয়ে পড়লো সাজসজ্জা আর অলঙ্কারপ্রিয়তার দিকে। ফলে সংগীতের নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তোলার দিকে তাঁদের যে আগ্রহ সেটা হারিয়ে গেল অতিমার্জনার গোলকধাঁধায়। এর পরেও সে অবশ্য বেঁচে থেকেছে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, তবে অধিকাংশ

পরীক্ষাই যেন কিছুটা গৌণ ধরনের। বিভিন্ন রীতির আদান-প্রদান আজও চলছে; কেবল একদিকে নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল রচনাগুলির মধ্যে দেখা দিচ্ছে স্বগোত্র-মিলনের পরিচয়-চিহ্ন, অন্য দিকে আধুনিক পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠছে নির্বিচার বাছাই-এর লক্ষণ। এতে সমাজের সেই দীর্ণ দশাই প্রকটিত হচ্ছে যা দীর্ঘকাল আড়াল করে রাখা হয়েছে। ভারতীয় জনগণের জীবন, তাদের মৌল চাহিদা আর সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামোটাই জড়প্রকৃতির। এর ফলে অবশ্য কিছু কিছু মূল্যবোধ সে আজও টিকিয়ে রাখতে পেরেছে যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যেগুলো স্বরকেন্দ্রিক।

২.

এ-কথা ঠিক নয় যে ভারতবর্ষে 'সংগীত-রচনা' (composition) অজানা ছিল। বরং সত্যি কথা এই, সংগীত-রচনা আর সংগীত-পরিবেশন একই লোকের দ্বারা সম্পন্ন হতো (আজও অনেকাংশে তা-ই হয়)। ঐ সমাজে সংগীত রচনা একটা বিশেষ পেশা হয়ে ওঠে নি, আর সে-রচনা লিপিবদ্ধও হতো না। ভারতীয় শিক্ষার অন্যান্য শাখার মতো সংগীত-শিক্ষাও ছিল মৌখিক, স্বরলিপির কোনও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি। মুসলমান ওস্তাদদের থাকতো হিন্দু ছাত্র, কখনও কখনও উলটোটাও। গানগুলোর বিষয় হতো প্রকৃতি বর্ণনা; রাজমহিমা বা হিন্দু দেবদেবী। "ভারতীয় সংগীতে অন্তত পাকিস্তান বলে কিছু নেই।" ('ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা')।

পরিবেশনের দিক থেকে বলা যায়, ওস্তাদ যে কোনও পর্দাকেই মূল স্বর হিশেবে বেছে নিতে পারেন। এখানেই তার আরম্ভ, এখানেই তার প্রত্যাবর্তন। ঝোঁকটা পড়ে মীড়ের ওপর যার প্রধান কথা হলো শ্রুতি, অর্থাৎ স্বরস্থান। সুরের সূক্ষ্মতা নির্ভর করে বিভিন্ন (২২টি) শ্রুতির শুদ্ধ ও নিপুণ ব্যবহারের ওপর। সেই জন্যে বিভিন্ন রাগে ব্যবহৃত একই পর্দা ঠিক একই জিনিস নয়। দ্রুত পরিবেশনে এই সূক্ষ্ম তফাৎগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু দ্রুত অংশ গাওয়া বা বাজানো হয় বিলম্বিত অংশের পরে, কদাচ আগে নয়। ততক্ষণে আসল রাগরূপটি হাসিল হয়ে যায়। ওস্তাদের কণ্ঠে বিলম্বিত রূপটি ফোটে সাধারণত গানের প্রারম্ভিক আলাপে যেখানে সুরকে প্রতিটি পর্দায় দাঁড়াতে হয়—সূক্ষ্ম মীড় ছাড়া অন্য অলঙ্কার সেখানে প্রায় অবান্তর। প্রতিটি রাগের একটা ধ্যানমূর্তি আছে যার আবাহন হয় ঐ আলাপ অংশেই। আলাপের সাহায্যেই ভারতীয় সংগীতের "যাবতীয় শুদ্ধ ও বিমূর্ত উপাদানগুলোকে দেখানো সম্ভব। কিন্তু নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংগীত পুরোপুরি

বিমূর্ত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, কণ্ঠে আলাপের পরেই থাকে গান, উত্তর ভারতে সাধারণত ধ্রুপদ, দক্ষিণ ভারতে কীর্তন। ('ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা')।

ভারতীয় সংগীতের সম্যক পরিচয় দিতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল, দাদ্‌রা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদির কিছুটা বিস্তৃত বিশ্লেষণেই এসেছেন যার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। যন্ত্রসংগীতকেও অনেকটা ঐ একই রীতিতে ভাগ করা যায়। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় তা হলো, ঐ বিভিন্ন গীতি-রীতির সহাবস্থানের পিছনে ছিল একটা সামাজিক তাগিদ। "আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, দাদ্‌রা, টপ্পা—এ যেন এক শোভাযাত্রা বিমূর্ত আর ঐশ্বরিক থেকে যা মূর্ত আর মানবিক সেই দিকে, সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রাধান্যও ক্রমবর্ধমান। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এ হলো অবক্ষয় আর পশ্চাদপসরণ। কিন্তু কথার বিন্যাসকে যদি খুঁটিয়ে দেখি, দেখবো নতুন বিষয়বস্তু দ্বারা সংগীত সমৃদ্ধ হচ্ছে। পল্লীবাসী নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাধারণ আবেগের কথা ভাবলে এই ঝোঁকটাকে কখনো-সখনো কেউ বলতে পারেন 'সাহিত্যিক', অসাংগীতিক, অবিশুদ্ধ। কিন্তু তার পর্যাপ্ত সাংগীতিক সাজসজ্জা দেখলে মনে হবে অশিক্ষিত জনগণের কাছে এখনও পর্যন্ত এর সাংগীতিক আবেদন যথেষ্ট। কিছু কিছু ঠুংরি গান নিঃসন্দেহে খুবই নাগরিক ও মার্জিত, কিন্তু আরও অনেক আছে যাদের সহজেই বিভিন্ন দেশি রীতির সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সেখানে সংগীতের ওপর দেখি 'অর্থে'র প্রাধান্য। ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থে তাদের যথেষ্ট কদর আছে···সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতীয় সংগীতে (পাশ্চাত্য সংগীতের মতোই) সামাজিক তাগিদটা প্রকাশ পেয়েছে বিমূর্ত পদ্ধতি সমূহের মানবিকীকরণে, তাদের সমষ্টিপ্রয়াসে, কারণ এই সব অশাস্ত্রীয়, তথাকথিত নিম্ন স্তরের গীতিপদ্ধতি দলবদ্ধভাবে গেয়, পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় সংগীত প্রায় অনন্যভাবে একক গুণপনার বিষয়।" "ইউরোপীয় সংগীতের মতো ভারতীয় সংগীতেরও একটা লক্ষণীয় সাধারণ আদর্শ রয়ে গেছে, রয়ে গেছে দু দিক থেকে, স্থাণুভাবে অব্যবহিত বিচারের দিক থেকে আবার জঙ্গমভাবে বিবর্তনের প্রেরণার দিক থেকেও।" ('ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা')।

৩.

ভারতীয় সংগীতে ঘরানার একটা স্থান আছে। এর জন্য বর্ণভেদ প্রথা দায়ী নয়, দায়ী মুখে মুখে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং বৃত্তিগত কারুশিল্পী-সঙ্ঘের প্রায়বৎ

শিক্ষাদানের রেওয়াজ। এটা ভারতীয় বা প্রাচ্যদেশীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নয়, প্রাক্-শিল্পযুগের সংস্কৃতিরই বিশেষ লক্ষণ। ঘরানার সাহায্যে শিল্পের উচ্চ স্থান ও বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয়েছে। ঘরানার অর্থ কেবল প্রথানুসরণ নয়, ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এ-জিনিস গড়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালেও কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের তিন চারটি বিশিষ্ট ঘরানার উদ্ভব হতে দেখা গেছে। তথাপি ভারতীয় রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো একই, ঘরানার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাগ বিশেষকে চিনে নিতে ও সংগীত পদ্ধতির মূলীভূত ঐক্য বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধে হয় না।

রাগপদ্ধতির মর্মবস্তু হলো শ্রেণীবিভাগ। গানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে বর্গ ও প্রজাতি নির্ণয়ের সাহায্যে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়। রাগ-নির্ণয়ের কয়েকটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা' গ্রন্থে। এ-ব্যাপারে তিনি প্রয়াত পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর নির্দেশিকাই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় রাগসমূহের মোটামুটি একটা কাল-পর্যায়ও দেখানো হয়েছে। "বিশেষ বিশেষ রাগের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সময়ের যে সম্বন্ধ সেটা সম্ভবত সামাজিক স্মৃতির খেলা।" তথাপি "কিছুটা প্রয়োগসিদ্ধ ব্যাখ্যা এ থেকে নিঃসন্দেহে টেনে বের করা যায়।" কিন্তু শ্রেণী বিভাজনের কোনও নীতিই শ্রোতাকে বিশেষ সাহায্য করবে না যদি না তিনি বিভিন্ন পর্দা'কে কী করে আলাদা আলাদাভাবে অথবা অন্যের সমবায়ে লাগানো হচ্ছে সেটা সম্যক অনুধাবন করেন। "সাধারণ ক্ষেত্রে গাইয়ে-বাজিয়েরা এ-সবের তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু একটা পদ্ধতির প্রকৃতি বুঝতে হলে একজন তৃতীয় শ্রেণীর কারুশিল্পী যা হাসিল করতে পারেন সেটাই যথেষ্ট নয়। এই কারণেই হারমোনিয়মে ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি সুবিচার হয় না, ও যন্ত্রটা বর্ণসংকর।" ('ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা')। তার চেয়ে বরং কোনও ঘাটহীন অথবা সচল ঘাটযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহারই প্রশস্ত (যথা সারেঙ্গি, এসরাজ, রবাব, অথবা বীণা, সেতার ইত্যাদি। সুরে বাঁধা তানপুরাতেও স্বরসঞ্চালনের প্রায় প্রত্যেকটি পথ-নির্দেশিকা ধরা পড়ে)। ভারতীয় সংগীতের একদিকে যেমন আছেন শিল্পী, অন্যদিকে তেমনি আছেন শ্রোতা। "শোনা কাজটাও একটা শিল্পকর্ম।" "ওস্তাদ আর শ্রোতা, অন্তত এই দুজন ধ্যানীর মিলন হওয়া চাই। তৃতীয় জন হলেন সংগতিয়া।" ভারতীয় ওস্তাদদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার গুণী তাঁরা তাঁদের ধ্যানমূর্তিটিকে লালন করেন, সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় শ্রোতার ধ্যানদৃষ্টিতেও তাকে মেলে ধরেন। প্রায়ই দেখা যায় ওস্তাদেরা চোখ বন্ধ রেখে গান করেন আর হাত নাড়েন—এ দ্বারা ঐ আবাহন, উদ্দীপন

আর বিনিময় ক্রিয়ারই সহায়তা হয়। "একালের ক্রেতারা ধ্যানী ওস্তাদকে প্রায়শ হতাশ করেন। সার্থক ওস্তাদও সর্বত্র দুর্লভ।" বিভিন্ন রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তির বিশদ বর্ণনা দিয়ে চমৎকার চমৎকার শ্লোক রচিত হয়েছে, চমৎকার চিত্রও আঁকা হয়েছে। "এরা আদি কল্পরূপকে মানবিক সৃষ্টরূপের নিকটতর করেছে, মানুষী সৃষ্টিকে আদি কল্পরূপের স্তরে উন্নীত করেছে। বিশিষ্টকে এরা আদলে পরিণত করেছে, আদল হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। সর্বোপরি, এরা সহৃদয় উপলব্ধির রস ও ভাবের দিকটার ওপর জোর দিয়েছে। আঙ্গিকগত বিচারের বাইজেনটিনীয় জটিলতা তো ভারতীয় বিদ্যায় স্বাভাবিক, কিন্তু এই জটিলতার বিপরীতক্রমে উক্ত উপলব্ধি যেন একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের কাজ করেছে।" উপলব্ধির এই গুরুত্বের কারণে শ্রোতার কাছ থেকে প্রত্যাশাটাও একটু বেশি। তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। 'ভারতীয় ওস্তাদেরা তড়িঘড়ি কিছু করতে নারাজ। তাঁদের পৌঁছতে সময় লাগে, সুর বাঁধতে সময় লাগে, আরম্ভ করতে সময় লাগে, বিস্তার করতে সময় লাগে, গুটিয়ে আনতে সময় লাগে।" অতএব অপেক্ষা করতে হবে। অথচ আধুনিক শ্রোতাদের কাছে অপেক্ষার কাজটা বড়ো ক্লান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো মানুষও এ ব্যাপারে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু "সংস্কার যখন ত্বরিৎগতিতে ছোটে তখন সেটা বাহবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ইদানীংকালে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের যে ঝোঁক সেটা প্রগতিশীলতার লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তা এমন কতকগুলি মূল্যবোধের বিপরীত যা এতোদিন ভারতবর্ষ ও তার সংগীতকে জীবন্ত রেখেছে।"

এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপত্তি অবশ্যই উঠতে পারে এবং আপত্তিটা নান্দনিক কারণেও যুক্তিযুক্ত। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, ওস্তাদ থামতে জানে তো? শিল্পী তার আধারটাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ করে তুলবেন। আজকের ভারতীয় শিল্পীরা যেন তাদের আধার চেতনা হারিয়ে বসেছেন। রবীন্দ্রনাথেরও প্রশ্ন ছিল, "একটি মেয়ে সব অলংকার পরে সামনে দাঁড়াবে কেন? এ হলো শিল্পে উৎকট প্রদর্শনবৃত্তি।" কিন্তু এ যুক্তিটা খুব দেখানো চলে। ভারতীয় সংগীত নারীর মতোই, তবে সেই নারী বিশেষ এক ধরনের নারী—'পঞ্চভূতে'র নির্ঝরিণীর মতো। "নদী কি কখনও তার স্রোতের অংশ নিয়ে লজ্জিত হয়?" [এ-নিয়ে পরে বিস্তৃততর আলোচনা আছে।] ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ভাষায়, "গান্ধর্ব মূর্তিটাই কেবল স্থায়ী, আর সব কিছুই আকারহীন, গানের পরিবেশনায় যা আকারহীন তা নিয়ত চেষ্টা করছে আকারকে পেতে, কিন্তু কখনোই তাকে ধরতে পারছে না।" কাজেই ধৈর্যের

প্রয়োজন। গ্রামের মানুষ কিন্তু আজও অনেক ধৈর্যশীল। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল রহস্য আজও তারা ধরে রেখেছে।

তথাপি আধুনিক যুগধর্মকে উপেক্ষা করা কঠিন। "সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতির সামনে বেমানান রকমে সংকুচিত।" আধুনিক শ্রোতা চাইছেন সেই আদি বিমূর্ত কল্পনাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাকে নির্দিষ্ট, বিশেষ, স্বতন্ত্র গানে পরিণত করতে, "সেই গান কোনও বিমূর্ত ভাবনার দ্যোতক হবে না, বরং সে হবে কথাবস্তুর সহায়তায় বিশেষ বিশেষ মেজাজের দ্যোতক।" আধুনিক সংগীতের ঝোঁকটা এই দিকেই। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বড়ো শিল্পীর কীর্তিকে এদিক থেকেও বিবেচনা করা উচিত। অন্যান্য দিকও নিশ্চয়ই আছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, ধূর্জটিপ্রসাদের সাংগীতিক আকাঙ্ক্ষা কি এ-ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত নয়? দুটি ধারাকে যদি ধরে নিই দুটি বিপরীত মূল্যবোধ তা হলে আধুনিক চিন্তানায়কের চিন্তায় উভয়ের সামঞ্জস্য হচ্ছে কীভাবে? এ কি কেবলই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান? অবশ্য পুরনো সংগীতও শিল্প, আধুনিক সংগীতও শিল্প—এ-রকম একটা বিবৃতির সাহায্যে আপোষ-রফা খুবই সম্ভব এবং সেটা যে সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক তাও বলা ঠিক নয়। শুধু মূল্যবোধের বৈপরীত্য রয়েই গেল।

৪.

ধূর্জটিপ্রসাদ একাধিকবার আক্ষেপ করেছেন যে হিন্দুস্থানি সংগীতের ইতিহাস আমাদের ভালো করে জানা নেই। [লোক-সংগীতের অবস্থা আরও শোচনীয়।] যতোটুকু জানা যায়, দেখছি পাঠান ও তার পরবর্তী যুগ থেকে মার্গ ও দেশি (লৌকিক ও আঞ্চলিক) সংগীত-পদ্ধতির মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে। "প্রাদেশিক অর্থসংগীত কথিত ভাষায় লেখা, তার উপর ভক্তর বন্যা দেশ ডুবে যাচ্ছে…মার্গ-সংগীতও মুখে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল নানা গায়কের নানা ঢঙে। এই অরাজকতায় আদান-প্রদান ও মিশ্রণের কার্য সহজ হয়ে ওঠে। তবে সেই সঙ্গে অনেক নতুন ধরনের সুর, তাল ও ভঙ্গির সৃষ্টি হয়।" ('কথা ও সুর', পৃ. ৩০)। গোঁড়া পণ্ডিতদের বিরুদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলো নতুন দরবারি রীতিকে প্রাচীন রীতির সঙ্গে সমান মর্যাদা দান করে। দরবারি হয়ে উঠল মার্গ অর্থাৎ ক্ল্যাসিক্যালের সমার্থক। ধ্রুপদও একটা প্রাদেশিক বা দেশি সুর-পদ্ধতি যার জন্মভূমি গোয়ালিয়র অঞ্চলে। ["ধ্রুপদ যে মার্গসংগীত নয় তার একটি প্রমাণ এই যে মার্গসংগীতের ঠাট মুসলমান যুগের কিছু পূর্বেও ছিল কনকাঙ্গী—যার পরিচয় খানিকটা পাওয়া

যায় দক্ষিণী সংগীতে। সকলেই জানেন যে বর্তমান [হিন্দুস্থানি] পদ্ধতির ঠাট শুদ্ধ বেলাওলের।...দক্ষিণী গায়কী চালে ধ্রুপদ গাওয়া হোক, এ-কথা ধ্রুপদের অতি বড়ো ভক্তরাও বলবেন না।" (পৃঃ ২০)।] ধ্রুপদের পর ক্রমে ক্রমে এলো হোরি, টপ্পা, ঠুংরি। লোকে বলে খেয়াল তার আগেই (আমীর খসরু: আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল ?) তৈরি হয়েছিল। শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন সুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ও প্রসার-পদ্ধতি দরবারি সংগীতে প্রবেশ লাভ করেছে; তালের বেলায়ও তা-ই। অনেক প্রাদেশিক সুরকেও গ্রহণ করা হয়েছে, রাগিণীর নামেই যার প্রমাণ। বড়ো বড়ো ওস্তাদদের রচিত সুর ও প্রকাশভঙ্গিও অভিনন্দিত হয়েছে। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও মসীদখানি ও রেজাখানি গৎ-এর পার্থক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। রাগরাগিণীর বহু ভাঙাগড়াও কালে কালে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু বিভিন্ন রাগের বিভিন্ন অঙ্গ থাকে যেগুলো দস্তুরমতো মিলনযোগ্য। রাগমিশ্রণের আর এক সংস্কারগত রীতি হচ্ছে রাগমালা। মোট কথা দেখা যাচ্ছে "আমাদের সংগীত একটি অচলায়তন নয়, তাতে কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, পরিণতি আছে।" ('কথা ও সুর', পৃ ৩১)।

হিন্দুস্থানি সংগীতের এই পরিবর্তমান পটভূমিতে বাংলাদেশের গত শতাব্দীর মানসিক ইতিহাসের পাতাটাও উল্টে দেখার চেষ্টা করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। গোড়ার দিকে ইংরেজরা ছিল রাজার জাত, তারা পশ্চিমী সভ্যতার বাহক হলেও প্রতিভূ হয়ে ওঠে নি। দেশি সংস্কৃতি ছিল সর্বক্ষণ বন্ধ-ঘরে আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর—শীর্ণা শীর্ণা শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবার মতো। রাজা রামমোহনের কৃপায় মুক্ত হাওয়ার প্রবেশ ঘটলো এবং তারই বার্তা পৌঁছলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। কলকাতার শহরে বড়োলোকেরা সৌখিন হলেন, মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলিসা'র দরবার তখনও সরগরম, মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন সংগীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সুরু করলেন। বাংলা দেশে মোটের ওপর ধ্রুপদ ও টপ্পারই চলন ছিল বেশি। বিষ্ণুপুর তো ছিলই, আর ছিল বেথিয়ার দান। সব মিলিয়ে পুরনো সংগীতের প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা অবশ্যই ছিল—বিশেষ করে কলকাতায়। কিন্তু মুক্তির ও সৃষ্টিলীলার সুরু হলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ের শুভাগমন, ছেলেমেয়েদের রীতিমতো সংগীত-শিক্ষা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা, দেশ-বিদেশি সব রকম সুরের মিশ্রণ—এ-সব অতি পরিচিত কাহিনী। "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 'অন্ধ অনুকরণের যুগের পর, সেই সভ্যতার যাথার্থ্য মর্মে গ্রহণ করার যুগে, মানসিক স্বাধীনতার ফলে পুরাতন-নূতনের বিবাহের শুভ

সন্ধিক্ষণে, সর্বতোমুখী সৃষ্টিপ্রেরণার আবেষ্টনে ও প্রভাবে. রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করতে আরম্ভ করেন।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৩১)। এই ঐতিহাসিক আবেষ্টনকে সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করতে কবিকে সাহায্য করেছিল বাংলা দেশের বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশি সুর পদ্ধতি। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে, ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। বাংলা দেশে যা ঘটছিল অন্য প্রদেশেও যে তার অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় নি এমন নয়। নিশ্চয়ই সেটা একই ধরনের সামাজিক শক্তির প্রকাশ, যদিও সংস্কারের পার্থক্যের জন্য প্রকাশের তারতম্য হবেই হবে। "রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রধানত ভাঙনে ও সৃষ্টিতে, ভাতখণ্ডেজীর প্রধানত রক্ষায় ও প্রচারে। প্রধানত বলছি এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানি পদ্ধতির একান্ত ভক্ত, এবং ভাতখণ্ডেজী পুনরাবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন না. তাঁকে কিছুতেই সনাতনী ভাবা যায় না।.. তাঁর কৃপায় উত্তর ভারতে উচ্চ সংগীতের প্রতি অনুরাগ বেড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু বড়ো বড়ো ওস্তাদ যে তাঁর ভীষণ বিপক্ষে এটাই তাঁর যথার্থ পরিচয়।" ('কথা ও সুর': উপক্রমণিকা)।

৫.

এর পর আমরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আসি। আমাদের আগের আলোচনা থেকে অনেকেরই মনে হবে এতোক্ষণ আমরা যেন রবীন্দ্র-প্রসঙ্গেরই প্রস্তাবনা করছিলুম। ব্যাপারটা অনেকটা তা-ই। ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-ভাবনার অনুসরণে সেটাই বোধহয় সংগত। তাঁরই কথায়: "হয়তো একজন বড়ো শিল্পী নিজের শিল্পী-জীবনে শিল্পের গোটা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটান, আবার তাকে বিকাশের পরবর্তী স্তরেও এগিয়ে দেন।" (শতবার্ষিকী গ্রন্থ, সাহিত্য আকাদেমি)। গোটা দেশের অভিব্যক্তি ব্যক্তির জীবনে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের ক্রমবিকাশটাও বুঝতে হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের মতে রবীন্দ্রসংগীতের চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে ছিল ভালো ভালো খানদানি 'ঘরোয়ানা চীজে'র সুরের আশ্রয়, যদুভট্ট রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির মুখে শোনা উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ ও খেয়াল গান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক সুরে কথা বসানো, শুদ্ধ তানমানলয়ে গান রচনা, যার অধিকাংশই ছিল ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্‌রা অর্থাৎ ঝম্প জাতীয়, কাঠামোও মূলত ধ্রুপদী। দ্বিতীয় যুগে কাঠামোটা পুরনোই রইলো, কিন্তু তারই মধ্যে এলো বিশেষ 'মুড্', খেয়াল বা

ভাবের প্রয়োজনে সুর ও তালের কিছু কিছু নতুনত্ব। কোনও বিশিষ্ট মনোভাবের দাবি ওস্তাদের মুখে পূরণ হয় না। ঐ দাবি স্বীকার করলে শিল্পীর পক্ষে সুরের কাঠামোর অদল-বদল প্রয়োজন হয়, আর সে অধিকারও তাঁর আছে—এই অধিকার অষ্টাদশ কানাড়ার অস্তিত্বের মধ্যেই প্রমাণিত। "আর্টের ক্ষেত্রে অন্তত জেনেশুনে পাপ করলে সেটা আর পাপ থাকে না।" অভ্যস্ত পদ্ধতিকে অত্যাচার না করে নতুন রসের সৃষ্টি করার অধিকার যুক্তিসংগত—অনেকটা "opposition within the constitution"-এর মতো। হিন্দুস্থানি সংগীতের ইতিহাসে এ-রকম প্রক্রিয়া বারংবার দেখা গেছে।

দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে দেখা গেল নতুন পরীক্ষা। এখন তিনি এমন এক উৎসে ডুব দিলেন যা একেবারে মাটির অন্তস্থল থেকে উৎসারিত। এই উৎস ছিল হাতের কাছে, দ্বারের পাশে, পল্লী গ্রামে। শিলাইদহ পর্ব বোধহয় তাঁর জীবনে সর্বাধিক সুখের কাল যখন "মাঠে ঘাটে, নদীর ধারে, তিনি বৈরাগীর বাউল ভাটিয়াল, মাঝিদের সারি গান, পল্লী উৎসবের ঐক্যসংগীত শুনে বেড়াতেন—তাঁর প্রাণে ঐ প্রকার গানের সুরের আবেগ, ভাবের সরল স্বাধীনতা ও গভীরতা সাড়া দিতো।" কাজেই তাঁর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়াল, বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারি সুরপদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়ালি বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। কেউ হয়তো বলবেন, 'এটা না হলো কেদারা, না হলো বাউল, হলো একটা খিচুড়ি।' কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য : "পোলাও খুব ভালো জিনিস, তবে খিচুড়ি বাঁধতে পারলে মন্দ হয় না। বর্ষাকালে কি শীতকালে খিচুড়ি খুবই উপভোগ্য খাদ্য।...আসল কথা, রান্নাটি ভালো হওয়া চাই।" ('কথা ও সুর', পৃ ২৬)। সংগীত-জীবনের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় পর্বের কাজটা অনুরূপ কাজ তো বটেই, তার চেয়েও বেশি, অর্থাৎ সর্বদেশের গোটা সংগীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি—লৌকিক সংগীতের সংযোগে সংগীতরীতির পুনরুজ্জীবন। এ হলো মানুষী সৃষ্টির মৌল নিয়মের স্বীকৃতি—লোকসংগীতের প্রাণময় ধারায় অবগাহন করে সংকটের উত্তরণ। এইখানেই তার প্রতিভা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণত্ব। তিনি এ ব্যাপারে সত্যিকার 'বিপ্লবী'। [স্মরণীয় সেই 'নেসেসিটি' ও 'ফ্রীডমে'র দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব।] এখন থেকেই তাঁর সত্যিকার স্বকীয় 'কম্পোজিশনে'র জন্ম যার লক্ষণ—নেওয়া ভাঙা গড়া।

এর পরেও আছে চতুর্থ যুগ। এই যুগের গানই তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—

সৃষ্টির দিক থেকে। "এর মধ্যে এমন একটি সংযম আছে, কথা ও সুরের মধ্যে এমন একটি মিল আছে, তার সৌষ্ঠব এতো হৃদয়গ্রাহী, তার আবেদন এক সঙ্গে এতো personal ও impersonal, যে তার থেকে আনন্দ না পেয়ে থাকা যায় না। লোকসংগীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চীৎকার যেমন এর মধ্যে নেই, তেমনি দরবারি সংগীতের অজস্র তানের ও তালের নিরর্থক গুণ্ডামিও এর মধ্যে নেই। অথচ তাদের সদ্‌গুণ সবই রয়েছে, আনন্দের সব উচ্ছ্বাসের উপাদানই রয়েছে, লোকসংগীতের ভাবসম্পদ এবং দরবারি সংগীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ভদ্রতা ও শালীনতা। তবে এগুলি খাঁটি লোকসংগীত নয় মনে রাখাই ভালো।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ২৬)। বিকাশের প্রক্রিয়ায় লোকসংগীতে নিছক প্রত্যাবর্তন সম্ভবই নয়। "সাধারণত যা সরল আর যা পরিশীলিত—তারা চলে দুটো পাশাপাশি ধারায়, কিন্তু উৎসের জল যখন উপ্‌ছে ওঠে তখন সৃষ্টির এক প্রবহমান বন্যায় সব কিছু একাকার।" ('টেগোর—এ স্টাডি', পৃঃ ৯৩ ; অনূদিত)।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে কেউ হয়তো সংগীতের এক বিশেষ প্রজাতি হিসেবে বর্ণনা করতে পারেন। আসলে কিন্তু এরা সংগীতের, বিশেষ করে হিন্দুস্থানি সংগীতের, বিকাশের মূল ঐতিহ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তবু বৈশিষ্ট্যও তাদের কিছু আছেই যা তাঁরই প্রতিভার স্বকীয়তায় ভাস্বর। অর্থাৎ তাঁর সংগীত-রীতি, পূর্বতন সাংগীতিক মহাপুরুষদের কীর্তির মতোই, একদিকে সামাজিক পরিবর্তনের চাপ অন্যদিকে মূর্ত মানবিক ব্যক্তিগত প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। কিন্তু "মৃত রোম্যান্টিকই জীবন্ত ক্ল্যাসিক"। সঙ্গে সঙ্গে, এই নতুনত্ব যথেষ্ট প্রাচীনও বটে।*

৬.

একদা রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের বিমূর্ত আদলগুলি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিজের গানে তাঁর স্বকীয় আদর্শই প্রতিফলিত। তাঁর অভিষ্ট ছিল যা মূর্ত, মানবিক, ব্যক্তিগত ও নির্দিষ্ট। সহজেই বোঝা যায় কেন তাঁর

---

* "হিন্দুস্থানি সুর পদ্ধতির abstract nature-কে concrete করে, এক কথায় সুরকে humanise করে, অথচ তাকে আর্ট থেকে artifice-এর নিচু পংক্তিতে নামতে না দিয়ে [তিনি বিচিত্র সুরের ও মিশ্রণের প্রয়োজন মিটিয়েছেন]। শুনেছি ও পড়েছি বিলেতে বাটোহ্বাফেন এই কার্য করেছিলেন। যদি সত্য হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই সঙ্গে তুলনা করা চলে, আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য composer জন্মায়নি।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ২৮)।

নাটকগুলি গানে গানে এমন ভরপুর,* কেন নানা স্তরের নানা মানুষ নানান মেজাজে তাঁর গান গেয়ে থাকেন বা গুণ গুণ করেন। মেজাজটা যতোই বিশিষ্ট অথচ ধরা-ছোঁয়ার অতীত ততোই মধুর তাঁর গানগুলি, ততোই তারা গভীরতর আর মহত্তর। এই মেজাজ একাধারে কাব্যিক ও সাংগীতিক, একদিকে তা অধরা অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট, একদিকে ব্যক্তিগত অন্যদিকে সৃষ্টিসংগীতের নিঃসীমতায় লীন। যদি প্রেমের কথাই ধরা যায়, কতো না তার বিচিত্র রূপ, এবং প্রতিটি রূপ কতো না স্পষ্ট। যখন মল্লার রাগে গান রচনা করছেন তখন বর্ষার প্রতিটি রূপ—তার নিরবচ্ছিন্ন শব্দঝংকার, তার বর্ষণের প্রাচুর্য, তার দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ—সব কিছুই ধরা পড়ছে। বর্ষার আবির্ভাব, তার পূর্ণ বিকাশ, তার বিদায়—সবই এখানে চিত্রিত। এক একটা গান এক একটা অখণ্ড সত্তা, গোটা গানে এক একটা 'মুড্'। ক্ল্যাসিক্যাল রীতিতে দেখেছি মেজাজটা প্রথম দেখা দেয় এক একটা ছাঁচ বা আদলের আকারে, তারপর, সম্ভবপর স্থলে, সেটা রূপ নেয় গানে; রবীন্দ্রসংগীতে কিন্তু মেজাজের সূত্রপাত হয় প্রতিটি গানে; শেষ হয়, সম্ভবপর স্থলে, কোনও এক আদলে। এখানেই উভয়ের পার্থক্য। (শতবর্ষ গ্রন্থ, সাহিত্য আকাদেমি, পৃঃ ১৮৫-৮৬)।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের বিভিন্ন আলোচনা, বিচার ও মন্তব্য ছড়ানো আছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে। তার একটা সংক্ষিপ্তসার দুরূহ হলেও অসম্ভব হয়তো নয়। 'বসুধারা' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৬৭) [রচনার তারিখ ২৩।২।৬০] 'রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে' শীর্ষক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি। সাহিত্য আকাদেমির 'শতবর্ষ গ্রন্থ-'ও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। আর 'কথা ও সুর' তো আছেই। এ-সব থেকে কয়েকটি বিষয় পর পর সাজিয়ে দেওয়া যায় (বিবর্তনের ইতিহাস মনে রেখে):

(ক) কিছু বাল্যরচনা ছেড়ে দিলে প্রথমে আসে ব্রাহ্মসংগীত। আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে ধ্রুবপদ্ধতির গানও বলা যায়। অর্থাৎ ধ্রুপদের চার তুক [সব গানে নয়], সহজ সরল অনাড়ম্বর গায়ন। তালও মোটামুটি সহজ, অর্থাৎ চৌতাল, ঝাঁপ, তেওরা, আড়া ইত্যাদি। তান নেই বললেই চলে এবং আছে কিছু মীড় ও

* শুধু নাটক নয়, নৃত্যনাট্যও। "রবীন্দ্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্য এতোই জীবন্ত যে তাকে নৃত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে তার ধর্মচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা বেশি।" অথচ নৃত্যনাট্যে, ধরাযাক 'চিত্রাঙ্গদায়' "মোটের ওপর সংগীতের ধারাটি নৃত্যলীলাকে সমর্থন করে, তাকে ফুটতে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না।" ('কথা ও সুর, পৃঃ ৬৯ ও ৭০)।

গমক। ভাষাও সরল, ধর্মের গান সহজ হতেই বাধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার প্রলেপও এসেছে। অবশ্য তার ফলে আঙ্গিকের ধর্মচ্যুতি হয় নি। শুদ্ধ ধ্রুপদ ছেড়ে দিলে অনেক পাকা খেয়াল এবং সামান্য টপ্পার ছোঁয়াচও আমরা পাই। খাঁটি বাংলা গান হিশেবে, যাকে রাগ-প্রধান বলা হয়, ব্রাহ্মসংগীতের অনেকগুলি গান সত্যিই অপূর্ব। এ-সংগীতে ভাবগুলি 'অ-বিশেষ' বা অ্যাবষ্ট্র্যাক্‌ট্‌ বলে হিন্দুস্থানি সংগীতের মতোই উপভোগ্য। ('বসুধারা')।

(খ) পরবর্তী রচনাগুলি বেশির ভাগই মিশ্রণ—সুরের মিশ্রণ এবং একত্রে ভাষা ও ভাবের মিশ্রণ। প্রায় হাজার গানে মিশ্রণ ঘটেছে, তার মধ্যে দেড় শ' দু শ' গানে এই ধরনের মিশ্রিত রাগের একটা সম্পূর্ণ গঠন বা স্ট্রাক্‌চার সহজেই পাওয়া যায়। আবার তারও মধ্যে গোটাকতক গান আছে যেগুলো মিশ্রিত হয়েও অ-মিশ্রিত, যেগুলি খাঁটি রাবীন্দ্রিক। ধূর্জটিপ্রসাদ এগুলির কিছু বিচার করেছেন। তিনি মূলত গোটা কয়েক 'জনক' রাগ নিয়েছেন। যেমন ভৈরবীতে যে-সব ধরনের রাগ রয়েছে সে-গুলোতে এক ধারে আশাবরী, তিন চার রকমের টোড়ি ও অন্য ধারে কিছুটা ভৈরোঁ। এই ধরনের মিশ্রণ প্রায় 'সমধর্মী' অর্থাৎ 'কগ্‌নেট'। এই কারণে তাতে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে নি। "অনেক বড়ো ওস্তাদ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি পাপী।" এদের মিশ্রণগুলি যদি একাত্ম হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের এক একটা রূপ ফোটে। এই রূপ ঠিক অ-বিশেষ নয়, আবার সব সময় স-বিশেষও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। এদের বলা যেতে পারে ঠাকুরী ভৈরবী। অবশ্য একাধিক ঠাকুরী ভৈরবী রয়েছে। তার পর ধরা যায় মল্লার। দেশ-মল্লার, নট-মল্লার, সুরঠ-মল্লার, মিঞা-মল্লার, শুদ্ধ মল্লার—এগুলো তো রয়েইছে প্রায় বিশুদ্ধ ভাবে। কিন্তু এ ছাড়া বর্ষার গানে অন্যভাবে পিলু বারোঁয়া এমন কি ইমন-কল্যাণও দেখা যায়। তবে হিন্দুস্থানি গানে মল্লারের বিস্তর রূপভেদ থাকায় রবীন্দ্রনাথের মল্লারে গোটা কয়েক ব্যতীত হিন্দুস্থানি মল্লারেরই রূপ বেশি। এর পর পূরবী, সেখানে পূরবী-কল্যাণই প্রায় সব। কোমল ধৈবত বোধ হয় নেই, কোমল রেখাবও কম, আছে দুই মধ্যম। তার পর বেহাগ! সেখানে কেদারার অন্য প্রকারের দুই মধ্যম, বিহাগড়ার কোমল নিখাদ ইত্যাদি। কেদারার অংশই সম্ভবত বেশি এবং তার মিশ্রণ সত্যিই অদ্ভুত। ('বসুধারা')। ভাবের বা মেজাজের কতো বৈচিত্র্যই না ফুটেছে এ-সব গানে!

(গ) এর পর আসছে বাউল ও ভাটিয়াল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাটিয়াল আর শুদ্ধ বাউল-ভাটিয়াল এক নয়। তিনি তাদের 'ঢেলে সেজেছেন'।

"অনেক গান এই রকম ঢেলে সাজা। তারই মধ্যে যেগুলি উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সেগুলি নতুন এবং চমৎকারের অধিক যদি কিছু বলা যায়, তা হলো পূর্ণ।" রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাটিয়াল মার্জিত ও ভদ্র। ভাষা তো ভদ্র বটেই ; তা ছাড়া স্বরবর্ণের সুদীর্ঘ টান, উচ্চারণের গ্রাম্যতা একেবারেই নেই। এর সঙ্গে তিনি হিন্দুস্থানি রাগও মিশিয়ে দিলেন। "যেমন ভৈরবীতে বাউল ও কীর্তন। এই মিশ্রণের সময় দেখা দিয়েছে প্রথমে রাগ ও পরে বাউল-ভাটিয়াল। কিন্তু তার পরে হলো প্রথমে বাউল-ভাটিয়াল ও পরে রাগ এবং শেষে হলো নিছক বাউল-ভাটিয়াল। সময়ের দিক থেকে আগে-পরে ঠিক নয়,—বলা যায়, notionally"। ('বসুধারা')। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কিছু আঙ্গিকগত পরিমার্জনা, যথা কোমল গান্ধারের সঙ্গে শুদ্ধ গান্ধার, কোমল মধ্যমের সঙ্গে তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবতের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবত, কোমল নিষাদের সঙ্গে শুদ্ধ নিষাদ, এমন কি শুদ্ধ গান্ধারের বদলে একমাত্র কোমল গান্ধারের ব্যবহার। তাল অতিশয় সহজ, বোলও সরল। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য—মীড়। ধ্রুপদী মীড় লোকসংগীতেও ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্রনাথেও এটা বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকেও বলতে হয়, তাঁর নতুনও বেশ প্রাচীন।

(ঘ) "রবীন্দ্রসংগীতে প্রত্যেকটি গান স্বতন্ত্র সত্তা, ফলে প্রতিটি সত্তা তার নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে, প্রতি রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন, আর প্রতিটি শাসনের নিজস্ব নিয়মকানুন। একটি ছায়ানটের ভিতর সমস্ত বা প্রায় সমস্ত ছায়ানটের রূপ গড়ে তোলার পরিবর্তে দেখা যায় অনেক রূপের অনেক ছায়ানট, যাদের প্রত্যেকটির চরিত্র গড়ে উঠেছে মূল ছায়ানটের স্বতন্ত্র গান অনুসারে।···ফলে একটা রাগ থেকে হলো অনেক গান, সকল গানেই রাগ-বিশেষের বিশেষ ধর্ম উপস্থিত। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমস্ত গীতিকবিতার বিশেষ গুণ এই স্বকীয়তা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার বিশেষত্ব তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ-স্বাতন্ত্র্যে. তার মীড় ও গমকে, তার সংযত ও সহজ গতিভঙ্গিমায়। এ-কথা ঠিক যে রাগের ক্ল্যাসিক বিকাশ দেখা যায় বিশিষ্ট ঠাটের চৌহদ্দির মধ্যে তার সমুদয় বা প্রায় সমুদয় অলঙ্কারের বিস্তারে ; কিন্তু গান-রচনার দৃষ্টিতে দেখলে একটা গানের স্বতন্ত্র সত্তা মানেই হলো এক বিরাট পরিবর্তন, যার সত্যিকার অর্থ দাঁড়ায়, গানটাই হলো রাজা। কথা নিঃসন্দেহে পথ দেখায়, কিন্তু নিছক কথাই শাসন চালায় না।" ('রবীন্দ্রসংগীত', শতবর্ষ গ্রন্থ, পৃঃ ১৮২-৮৩)।

এর পর স্বভাবতই আসে কথা ও সুরের প্রসঙ্গ। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-

ভাবনায় সেটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক যে তার জন্য স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ প্রয়োজন। [উদ্ধৃতির বাহুল্য মার্জনীয়।]

৭.

গানে, তথা সমগ্র সংগীত-ইতিহাসে, কথা বনাম সুরের বিতর্ক দীর্ঘ দিনের—বিদেশে এবং এ-দেশেও। আজও কোনও সিদ্ধান্ত হয় নি। বিভিন্ন গুণী ও নন্দনতাত্ত্বিক কেউ এটা কেউ ওটার ওপর জোর দিয়েছেন। আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সুর হচ্ছে যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীতের আলাপ এবং তেলেনা, যেখানে থাকে কেবল সুরসমন্বিত অর্থহীন শব্দ-সংগীত। খেয়ালে অবশ্য কথার গুরুত্ব কম। কিন্তু ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, ভজন, কীর্তন—কোথাও-ই কাব্য-মাহাত্ম্য একেবারে গৌণ নয়, বাংলা লোকসংগীতের তো কথাই নেই—"তার প্রাণ ছিল কথার অর্থাৎ খবরের।"* ('কথা ও সুর', উপক্রমণিকা)। এ-সবই অর্থসংগীত ও নিবদ্ধ সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু কোনও সংগীত একটিমাত্র শ্রেণী কিংবা গুর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ফলে, ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, "আমার মাথার মধ্যে তিনটি বিরোধী মত বসবাস করছে, সন্দেহ হয়। অবশ্য, বিরোধের মধ্য দিয়েই চিন্তার সমন্বয় সম্ভব।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ১)। এই বিরোধী মতগুলি কী কী?

(১) একটি মত হলো: গানে কথা, অর্থাৎ কবিতা, চাই। সুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। সেই মতো তাল ও লয়ও চলতে বাধ্য। (২) দ্বিতীয় মত হলো: "সুর হয় সুর, না হয় বেসুর।" সুরের একমাত্র কাজ নিজের তাগিদে বিকশিত হওয়া। কবিতা মনের এক স্তরের, এক ধরনের ভাব-সমাবেশের ভাষা, সুর অন্য স্তরের। সুর দিয়ে কবিতা কিংবা কবিতা দিয়ে সুর বোঝানো যায় না। সুর কবিতার তর্জমা নয়। (৩) তৃতীয় মতটি এর মাঝামাঝি। "সেই মতানুসারে, যেখানে—যেমন রবীন্দ্রনাথ কি অতুলপ্রসাদের গানে,—সুর ও কবিতা হরগৌরীর মতো অঙ্গাঙ্গীভাবেই মিলিত হয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্ট ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না-কেবল সুরের, না-কেবল কবিতার, অথচ দুয়ের মিলনের একটি আতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই ভালো—সংগীত।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৩)।

---

* রবীন্দ্রনাথের গান অবশ্য "কেবল কথার গান…নয়।" ('কথা ও সুর', পৃ. ৩৬)।

[এই দুটি উদ্ধৃতি একই গ্রন্থের দুজায়গায় আছে। বিষয়টির আর একটু ব্যাখ্যা পেলে ভালো হতো।]

অবশ্য সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার দৌরাত্ম্য সব দেশের সব আর্টের ওপরই দেখা যায়, কারণ মুখের ভাষাটাই সবচেয়ে পুরাতন ও কর্মজীবনে ব্যাপক। ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্বাস, "ধর্মের প্রভাব কমলে সাহিত্য, ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব কমলে চিত্রকলা, ধর্ম ও সাহিত্য ও চিত্রের প্রভুত্ব হ্রাসে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও সুর ক্রমিকভাবে স্বাধীন হয়। ..কিন্তু ..স্বাধীনতা অর্জনের পর পরিত্যক্ত সম্বন্ধের সাথে মৈত্রী স্থাপনের দিক আছে। সেটা চোখে পড়ে যখন 'বিশুদ্ধ' আর্ট জীবন থেকে বিযুক্ত হয়েছে লোকের ধারণা হয়।...সুরের রস কবিতার রস থেকে বিভিন্ন হলেও মহারথীরা মিশিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, যখন সুরের রস শুকিয়ে গিয়েছে, তখন সুরের প্রাণসঞ্চারের জন্য জীবনের সেই আদিম বিকাশবৃত্তির উৎস থেকেই জল নিয়েছেন। নবজীবন সঞ্চারের সময় আদিম অবস্থার সেই প্রাণময় অভিন্নতা* স্বীকার করাই সকল সৃষ্টির ধর্ম।" আর "তানসেন যেকালে পেরেছিলেন তখন ডেমোক্রেসির যুগে অন্য লোকের চেষ্টা করবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৪)। অধিকার যে আছে ইদানীংকালে তার প্রমাণ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ [নিশ্চয়ই কিয়দংশে নজরুলও]। তাঁদের গানে "সুরের ব্যঞ্জনা, কথা ও সুরের সংযম, কথা দ্বারা সুরের ও সুরের দ্বারা কথাগত ভাবের প্রকাশ যথার্থ হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই। এই সব গানে কোন্‌টি কাকে ব্যক্ত করছে বলা শক্ত, কোন্‌টি রূপ আর কোন্‌টি সত্তা ধরাই যায় না। অতএব সংগীতরসকে পৃথক ভাবাই উচিত মনে হয়।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ১১)। তথাপি এরা দেশি ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম নয়, এ-কথাও স্মরণে রাখা উচিত। পৃথক ভাবায় ঐতিহ্য-বহির্ভূত ধারণা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। [পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।]

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, সংকটের সময় আদিম অভিন্নতার উৎস থেকে জল নেওয়ার প্রয়োজনেই 'সংগীতে' রচনার তাগিদ দেখা দেয়। কিন্তু আরও অন্তত দুটি কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ বিভিন্ন আলোচনায় দেখিয়ে গেছেন। প্রথমত, এমন অনেক উপলব্ধি বা 'মুড্‌' থাকতে পারে যা কবিতায় প্রকাশ করা যায় না, সুরেও প্রকাশ করা যায় না, করা যায় একমাত্র 'সংগীতে'র অর্থাৎ কথা ও সুরের যুগল মিলনে। দ্বিতীয়ত, "আর্টের অন্তত একটি প্রধান কথা যখন ব্যক্ত করা, তখন ব্যক্ত

* অভিন্নতা নৃত্য, গীত ও কবিতার একত্র সমাবেশ? স্মরণীয় জর্জ টমসনের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত : "The three arts of dancing, music and poetry began as one."—Marxism and Poetry, PPH 1954

কথাটিকে সহজ করলে শ্রোতার আনন্দানুভূতির পথটি সুগম করা হলো, শ্রোতার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করা হলো না, ..সংগীতের ক্ষেত্রে সেই উপায়টি—কথা। কথার সাহায্য নেওয়াতে বিপদ আছে, কেন না কথার মূল্য আলাদা, তার নিজের রীতিনীতি, টেকনিক আলাদা। অতএব কথার সঙ্গে সুরের একটা বোঝাপড়া করা চাই, কথা যদি ভাবকে সাহায্য করে, তা হলে তাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করতেই হবে, কেন না এই মিত্র সংগীতের সম্পদ-বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কথা যখন স্বাধীন হয়ে উঠল, তখন তাকে বর্জন করতে হয়। সুরের সঙ্গে কথার সন্ধিসর্তগুলি ভালো করে draft করা চাই, না হলে alliance ভেঙে যায়।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ২৭)।

এই draft ভালোভাবে সম্পাদন করতে হলে ভাষার সঙ্গে সুরের গরমিল ও মিল স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। যন্ত্রসংগীতের দৃষ্টান্ত দিলেঃ বোঝা যাবে, যে-ভাববস্তু সাহিত্যের উপকরণ, সে ভাববস্তু সংগীতের উপকরণ নয়। উভয়ের উপাদান, গঠন ও উপভোগ আলাদা। সংগীতের ইঙ্গিত ও অভিজ্ঞতা অস্পষ্ট, অ-ব্যবহারিক, অকর্মণ্য ও সাধারণ। তার উপযুক্ত ভাষাও তেমনি সূক্ষ্ম হতে বাধ্য। "সেই ভাষার নাম সুর, তার অক্ষর স্বর, তার বিন্যাস লয়, তাল ইত্যাদি। সুর হলো imageless awareness-এর নতুন রূপ এবং উপযুক্ত প্রতিমা। এই হলো সুরের সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাগত প্রাথমিক পার্থক্য।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৫২)। মিলের দিকটা এইখানে যে, প্রথমত, মানুষ এক ও অখণ্ড, কথাগত, বস্তুগত, সুরগত অনুভূতি একই মানুষের সম্পদ ও স্বভাব। কাজেই তার মানসিক প্রক্রিয়ার বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবকে একত্রে ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত রয়েছে মানুষের স্মরণশক্তি ও পূর্ব পরিচয় বা অনুষঙ্গ (association)। এর সহায়তায় সুরস্রষ্টা তাঁর অস্পষ্ট অনুভূতিকে রূপ দেবার সময় যথাযথ কথাকে আশ্রয় ও গ্রহণ করতে পারেন, তাতে রসসৃষ্টিতে বাধা হবার কথা নয়। অবশ্য কথা যথাযথ হওয়া চাই, অর্থাৎ ব্যবহারিক অর্থ যেন সুস্পষ্টভাবে কোনও বস্তু বা অন্য কোনও শব্দ-সমাবেশের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলতে না যায়, কেন না এই ধরনের প্রতিবিম্বকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে দুরূহ। "এই জন্যেই বোধহয় শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দুর্বোধ্য কথার বদলে পুরাতন ও পরিচিত কথার প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রোতা-সাধারণের মানসিক প্রকৃতির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বোধগম্য যে শব্দ তাকেই আশ্রয় করতে হবে—তবেই সুরের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে না।" (ঐ, পৃঃ ৫৪)। তৃতীয়ত, কবিতায় অর্থের অতিরিক্ত একটা ব্যঞ্জনা আছে। যে সুরস্রষ্টা কবিতায়

সুর বসাচ্ছেন তিনি ব্যঞ্জনাকেই প্রকট করবেন, অর্থকে নয়—অর্থ তখন উহ্য। "যে শব্দ যতো পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সেই শব্দ ততো পরিমাণে গীতে সহায়ক, এবং সেই প্রকার শব্দবাহী, শব্দবিন্যস্ত কবিতাই ততোটা পরিমাণে সুররচনার উপযুক্ত বাহন।...গীতিকবিতায় অর্থ বোঝবার তাড়া নেই, কাজ করবার হুকুমও নেই। আছে খেয়াল, খামখেয়াল, যেটি গম্ভীর হলেও চলবে—কিন্তু সুগভীর চিন্তাধারা হলে চলবে না, হাল্‌কা হলেও চলবে, কিন্তু তার উত্তেজনায় নেচে উঠলে চলবে না। বিশুদ্ধ বাংলাতে বলি—থাকবে mood, proposition নয়, incentive to action কিংবা line of conduct নয়।" (ঐ, পৃঃ ৫৬)। গীতিকবিতা যেন সুরের জন্যই প্রতীক্ষা করছে। কবিতার মেজাজ দেখে বোঝা যাবে সেটি কোন শ্রেণীর রাগরূপ ধারণ করতে সমর্থ। তবে তার প্রত্যেক লাইনের সূক্ষ্ম ভাবের উপযোগী স্বরবিন্যাস করতে যাওয়া মানে সংগীতের অপমান। "তাতে সংগীত আর সংগীত থাকে না, অনুবাদে পরিণত হয়।" (ঐ, পৃঃ ৫৯)।

আমাদের সংগীতের সংস্কারগুলিতে মিশ্রণেরও কতকগুলি রীতি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। [ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার আলোচনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।] গোটা কয়েক রাগিণী আছে যারা কাছাকাছি থাকতে চায়। তাদের একটাকে প্রয়োগ করা না গেলে অন্যটাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কবিতায় দুটি স্থায়ীভাব থাকলে রাগ-সান্নিধ্য অনুসারে রাগমিশ্রণ বাঞ্ছনীয়। নিতান্ত বিপরীত ভাব থাকলে বোধহয় গীতিকাব্য হিসেবেই সেটা অসার্থক। রাগ-মিশ্রণের আর একটি মূলসূত্র পাওয়া যায় আমাদের সংগীত-পদ্ধতির কাল-বিভাগে। [ধূর্জটি-প্রসাদ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।] এছাড়া আছে কিছু সন্ধ্যারাগ, যাদের মিল সকলেরই কানে ধরা পড়ে। আর আছে রাগমালা। "বাদী সম্বাদীর সামান্য অদল-বদলে রাগমালা তৈরি হয় এবং মালা তৈরি হবার সময় সুতো ছেঁড়ে না।" (ঐ, পৃঃ ৬২)। আসলে কতোটা ভাঙন বরদাস্ত হয় তারই ওপর নতুন সৃষ্টির সার্থকতা।

কথা ও সুরের সার্থক মিলিত রূপকে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন 'সংগীত'। সংগীত রচনা ও পরিবেশনার সময় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হলো আমাদের স্বরোচ্চারণ পদ্ধতি। প্রথমত, বাংলা ভাষায় গুণবাচক বিশেষ্য কম, তাই কবিতায় বস্তুবাচক বিশেষ্যই বেশি ব্যবহার করতে হয়। অথচ বস্তুগত প্রতিমা ঠিক সংগীত-ধর্মী নয়। "সেই জন্য গান গাইবার সময় বাংলা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ

করা বোধহয় উচিত নয়।" (ঐ, পৃঃ ৬২)। [কিন্তু অন্যত্র রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: Technically, Tagore's words were to be clearly enunciated. The Hindi words of classical pieces were on the other hand extremely ill-defined. But Tagore's words were to be neatly pronounced." (Centenary Volume. p. 182).—এই উক্তির তিনি কারণও দেখিয়েছেন। এ-ধরনের অসংগতির, অথবা আপাত অসংগতির, ব্যাখ্যা কী হবে আমার ঠিক জানা নেই। 'অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ' করা আর 'clearly enunciate' বা 'neatly pronounce' করা কি আলাদা জিনিস? তবে মনে হয়, উচ্চারণটা কার্যত হওয়া উচিত কিছুটা আপোসরফার মতো—অর্থাৎ স্পষ্ট, কিন্তু আলুতো নয় আবার রূঢ়ও নয়।] দ্বিতীয়ত, আমাদের ভাষায় স্বরবর্ণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণের ও যুক্তবর্ণের ভিড় বেশি। সেই জন্য তানের স্থান সংকীর্ণ, ছোটো গমকের অবকাশ অবশ্য আছে, কিন্তু বড়ো গমকের স্থান মোটেই নেই। তৃতীয়ত, আমাদের স্বরবর্ণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের তারতম্য নেই। তাতেই বাংলা গান একটু একঘেয়ে মনে হয়। সেটা সামলানো যায় হ্রস্ব-দীর্ঘ মেনে চললে। চতুর্থত, ক্রিয়াপদ আমাদের নিতান্ত কম। সেগুলি বাদ দিলে স্বরান্ত শব্দ আরও কমে যায়। সবই প্রায় হসন্তান্ত। অতএব তানের স্থান বাংলা গানে আরও কম হতে বাধ্য। দিলীপকুমার অবশ্য মনে করেন যে বাংলা গানে তান খুব চলবে এবং রচনায় তান দেবার স্বাধীনতা থাকা চাই। কিন্তু ধূর্জটি-প্রসাদের মতে "ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুগ্ম ধ্বনির আধিক্যের জন্য বাংলা গান বোধহয় ধ্রুপদ ও ধ্রুপদ-ঘেঁষা খেয়ালেরই অনুকূল।" রবীন্দ্রনাথের বিন্যাস-আদর্শ ধ্রুপদী ধরে নিলে তানের ভূমিকা কী হবে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, "সংগীতে সংযমের অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন। যেখানে সেখানে তান সংগীতে অচল।" (ঐ, পৃঃ ১২)। "ততোটুকু তান সম্ভব যতোটুকুর সুযোগ breath-group-এর শেষে, অর্থের ইঙ্গিতে, এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে পাওয়া যায়।...তানের উদ্দেশ্য আর 'সংগীতে'র উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের এক প্রকার অভিব্যক্তি—সেটি রাগিণীর রূপ-উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস; সংগীত হলো পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিকটা তার মুখ্য নয়।" (ঐ, পৃঃ ৪৬)।

বিভিন্ন আলোচনার পর ধূর্জটিপ্রসাদ, কিছুটা কৌতুকের ঝোঁকে, তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলি সাজিয়েছেন নিম্নলিখিত প্রকারে:

"(ক) সংগীতের ইতিহাস আছে বলেই বাংলা গানকে অবহেলা করা যাবে না।

"(খ) সুরের জগৎ কথার জগৎ থেকে পৃথক।

'(গ) তবু এমন কথা আছে যাকে সাজালে সুরের রাজ্যে যাওয়া যায়।

"(ঘ) কবিতার স্থায়ী ভাব আছে।

"(ঙ) রাগ-রাগিণীরও সংস্কারগত ভাব আছে।

"অতএব কবিতার স্থায়ীভাব ও সুরের সংস্কারগত অনুভাবের মধ্যে রফা হওয়া চাই।" ('কথা ও সুর', পৃঃ ৮৫)।

সংগীতে কথার অতিরিক্ত বাঁধন রয়েছে, এবং সেই বাঁধনের সঙ্গে সুরের বাঁধনের ফাঁস লাগিয়ে ফুটোকেস কাটাতে হবে, তবেই সংগীত-গায়ক মৌলিক, স্বাধীন ও মুক্ত হবেন। "সংগীতের নিয়ম আরও কড়া। দুঃখ এই লোকে ভাবে অতি সোজা।" (ঐ, পৃঃ ১৭)। সংগীতের আপাত সারল্য কিছুটা প্রতারক সন্দেহ নেই।

এইসব বিভিন্ন বিচারের মানদণ্ডে বলতেই হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা অনবদ্য ঐক্যবদ্ধ পরিপূর্ণ 'সংগীত'। যে কোনও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রচয়িতার তুলনায় তাঁর দান কম সমৃদ্ধ ও কম বৈচিত্র্যময় নয়। আর কাব্যাংশে তো তিনি সকলের উর্ধ্বে! [পৃথিবীর কোনও দেশেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মতো এতো বড়ো কবিকে সংগীত-'রচয়িতা' হিশেবে দেখা যায় নি।]

৮.

রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য একত্র করলে এ-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা রবীন্দ্র-সংগীতে তান-ব্যবহার ও বাণী-উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর কিছু মতামত লক্ষ্য করেছি—পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে [দেখছি, সাহানা দেবীরও একই মত ছিল] স্বরলিপির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কিন্তু তার অন্ধ আনুগত্য কদাচ কাম্য নয়। এ রকম আনুগত্যের বশে অনেক গায়ক-গায়িকা স্বরগত বিশুদ্ধির "উনিশ বিশ" বাঁচাতে 'গয়ে গানের আসল প্রাণটাকেই নষ্ট করে বসেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন গাইতেন সে ছিল অন্য এক অভিজ্ঞতা। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রসাদে শিল্পী আর শিল্প একাকার হয়ে যেতো। তখন তাঁর কথাগুলোই গান গেয়ে উঠতো, পর্দাগুলো যেন কথা কইতো। ('আমার শোনা মহান শিল্পীরা' ইংরেজি প্রবন্ধ)। রবীন্দ্রনাথকে কেউ বড়ো গায়ক বলবে না, যদিও এককালে তাঁর গাওয়া গানের চাহিদা ছিল প্রচণ্ড। কণ্ঠে তাঁর যে গভীরতার

অভাব ছিল তার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হতো মাধুর্য আর ব্যাপ্তি দিয়ে। তাঁর কণ্ঠস্বরে ত্রুটি ছিল অনেক, লয়জ্ঞান নিখুঁত ছিল না, শিক্ষারও কিছুটা অভাব ছিল। কিন্তু সবার ওপর ছিল তাঁর দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব। অন্যে বড়ো জোর রবীন্দ্র-ভক্ত, কিন্তু কেউই রবীন্দ্রনাথ নন।

রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায় যে হিন্দি গানের পর আসরে এই গান আর তেমন জমে না। কারণ হিশেবে দেখা যায়, অনেক গায়ক গলা ছেড়ে গান করেন না। অজুহাত হিশেবে কেউ কেউ দেখাতে চান যে 'মাইক' ব্যবহারের প্রয়োজনে এটা করতে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ এই যুক্তি পুরোপুরি মানেন না। [বর্তমান লেখকের দৃঢ় অভিমত, এটা কণ্ঠের দৈন্য ঢাকবার অপকৌশল। প্রমাণ—একদিকে ফৈয়াজ খাঁ, জ্ঞান গোঁসাই, অন্যদিকে ভীষ্মদেব।] হয়তো শিক্ষা-পদ্ধতিতেই কিছু দোষ থেকে গেছে। দিনেন্দ্রনাথ কিন্তু "প্রাণ দিয়ে গাইতেন—জোরে, ফূর্তি করে, যে জন্য শিক্ষার্থীরাও নিদ্রালু হতে পারতেন না।" সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় (মিত্র) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "মেয়েটির গলায় জোর আছে, টপ্পার দানা আছে, আর ভাবও আছে, এবং প্রত্যেকটিরই সংযত ব্যবহার করতে সে জানে।" ('বক্তব্য', পৃঃ ১৩০)। অপরপক্ষে, অনেক যুবকযুবতীর দুর্বল কণ্ঠ ও উচ্চারণের অস্পষ্টতা সম্পর্কে তিনি কিছু কৌতুকামিশ্রিত কটু মন্তব্যও করে গেছেন।

রবীন্দ্রসংগীত আসরে না জমার কতকগুলি সাধারণ কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন, যথা ব্যক্তিগত মনোযোগ ও রেয়াজের অভাব, এদেশীয় কণ্ঠসাধনা-পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিকতা, ওজসের পরিবর্তে তথাকথিত মাধুর্যের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ, ইত্যাদি। কিন্তু হয়তো কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে যেগুলি রবীন্দ্রসংগীতের চরিত্রের মধ্যে নিহিত। 'হিন্দুস্থানি গানে সুরের সাতত্য, অবাচ্ছিন্নতা প্রায় অটুট, এক তালের প্রয়োজন ছাড়া। রবীন্দ্রসংগীতের চমৎকার শব্দ ও অর্থগুচ্ছ গায়নকে সুরবলয় থেকে বিচ্যুত করে। হিন্দুস্থানি সংগীতের সুর 'তৈলধারাবৎ'। রবীন্দ্র-সংগীতে স্বরকে কথার উপলখণ্ড অতিক্রম করতে হয়। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীতে 'আ' করে, মুখ খুলে উদাত্ত স্বরে গাওয়া চলে না, তালের বৈচিত্র্য ও মর্যাদা রাখা যায় না।" ('বক্তব্য', পৃঃ ১২২-২৩)।

এ গেল সুরের দিক থেকে। শ্রেণী-বিভাগের দিক থেকে দেখলে, হিন্দুস্থানি সংগীতের রাগরাগিণী ও গায়ন-পদ্ধতি ব্যক্তি-নির্বিশেষ ও সাধারণ। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান, যেমন ধরা যাক বর্ষার গান, "বিশেষ specific মনোভাব ব্যক্ত" করে। "এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা,—এই বিশেষ, অ-সাধারণ specific গুণের

জন্যই রবীন্দ্রসংগীত নির্জীব মনে হয় সাধারণ সভায়। যেটি রবি-বাসরে শোভন, সেটি সাধারণ আসরে শোভা পায় না।" ('বক্তব্য', পৃঃ ১২৪)। এক রবীন্দ্রনাথই স্বীয় প্রতিভার জোরে বিশেষকে নির্বিশেষ ও সাধারণে পরিণত করতে পারতেন। অন্যে যেহেতু তা সম্ভব নয় সেহেতু ধূর্জটিপ্রসাদের এই উক্তি আরও সত্য হয়ে ওঠে যে "সংগীতের নিয়ম আরও কড়া। দুঃখ এই, লোকে ভাবে অতি সহজ।" এমতাবস্থায়, ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধন, অর্থাৎ স্বর-সাধনা, ভালো গায়কের গান শোনা, স্বর-বিন্যাস শেখা, তারপর তার বিচার—রসানুভূতিকে বাঁচানো ও রক্ষা করা। একটু আধটু ধ্রুপদ খেয়াল শিক্ষাও দরকার। সঙ্গে সঙ্গে "এখন বোধহয় পুরাতন ও হিন্দুস্থানি পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তাল ও লয় সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালো।" ('বক্তব্য', পৃঃ ১২২)।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ যা-ই বলুন বা ভাবুন, এদেশে ইতিমধ্যে যেটুকু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তার বাইরে অন্য কোনও প্রকার স্বাধীনতার কথাই কোনও কোনও কানে আর তেমন সুখশ্রাব্য নয়। কাজেই তাঁর প্রস্তাব রবীন্দ্রসংগীতের তথাকথিত একচেটিয়া ভাণ্ডারীরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন মনে হয় না। আর তাঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত যে সব রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষক আছেন তারাও সম্ভবত প্রচলিত ছকের বাইরে এক পা-ও অগ্রসর হবার দুঃসাহস দেখাবেন না, পাছে তাঁদের 'রাবীন্দ্রিকতা'র রঙ কিছু ফিকে হয়ে যায়। রেকর্ডে গাওয়া দিনেন্দ্রনাথের গানও যথেষ্ট রাবীন্দ্রিক নয় এমন মন্তব্য শোনার সৌভাগ্য, বা দুর্ভাগ্য, বর্তমান লেখকেরই হয়েছে। (অবশ্য মন্তব্যটি যাঁর তিনি আগেভাগে জানতেন না যে রেকর্ডটি দিনেন্দ্রনাথের, পরে নাম শুনে আঁতকে ওঠেন।) ধূর্জটিপ্রসাদের মতো বুকের পাটা কার। এর পরিচয় পাওয়া পরবর্তী পরিচ্ছেদে।

৯.

গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও অন্তত দুটি বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি—এর পরিচয় 'সুর ও সংগতি'র কয়েকটি পাতায় বিধৃত। [বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সুর ও সংগতি'-র বাইরে স্বতন্ত্র বই আকারে এটি দেখা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি।] এখানে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনাটাই আমাদের আলোচ্য। (প্রধানত দুটি চিঠি নিয়ে আমাদের আলোচনা—প্রথমটির তারিখ ২৫ মার্চ, ১৯৩৫; দ্বিতীয়টির ৪ জুলাই, ১৯৩৫।

প্রথমটির বিষয়, সংগীতে খামার অনিবার্যতা এবং উপাদান প্রয়োগের সংযম; দ্বিতীয়টি বাঙালির জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি)। লক্ষণীয় যে এই বিতর্ক ধূর্জটিপ্রসাদের সমগ্র সংগীত-ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সেনেট হাউসের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে গায়কের কণ্ঠে সংযম ও রচনা পদ্ধতিতে সুসংগতির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এটা করতে তিনি বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেন। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন সকল দেশেই সত্য, তার সঙ্গে বিশেষ করে বাংলা দেশের সংস্কৃতির সম্পর্ক কী? "কোনও দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না।" সংস্কারকে অস্বীকার করতে তিনি পারেন না, "কিন্তু সংস্কারও তো নির্বাচিত হতে হতে বর্তমানের আকার ধারণ করছে?" আর তর্কের খাতিরে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারকে মেনে নিলেও, "নতুন culture trait-কে নির্বাচন করে নিজের মতো রূপ দেবার জন্য তাকে অন্তত জীবন্ত হতে হবে।" "ধরাই যাক—বাংলাদেশে যাত্রা গানে, তর্জায়, জারি ভাটিয়ালি কীর্তন আগমনীতে, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানে কথারই ছিল প্রাধান্য—সুরের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু সে ধারাও তো শুকিয়েছে? কেন তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে?" রবীন্দ্রনাথও যেমন সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এই নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তেমনই। তবে কেন এদের হাতে এমন অদ্ভুত কাণ্ড হতে পারছে? আর "তাঁদের না হয় বাদ দিলাম—কিন্তু পাঁচালির সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের গানের সম্বন্ধ নেই, যাত্রার জুড়ি গানের সঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের কোনও যোগসূত্র নেই—এটুকু আপনাকে মানতেই হবে।" আসলে বাংলার সংগীত-পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। 'হিন্দুস্থানি গায়কী পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক দিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইলো যাত্রা-কীর্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে—এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিক।" অতএব সিদ্ধান্ত হলো: "সুরে সংগতি-রক্ষা ভদ্রমনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়।" ('সংগীত-চিন্তা', পৃঃ ১৭০)।

"সুরে সংগতি-রক্ষা ভদ্রমনের কাজ"—ধূর্জটিপ্রসাদের এই উক্তিটি অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, সাধারণভাবে ভদ্রতা এক বস্তু, আর ভদ্রতা প্রকাশের

দেশগত ভিন্নতা আর এক বস্তু—এটা সত্য কিনা। ইংরেজের ভদ্রমন আর বাঙালির ভদ্রমন কি এক? অথবা বাঙালির, এবং পঞ্জাবী অথবা মাদ্রাজীর? সুরে সংগতি-রক্ষা সব দেশের সংগীতেরই সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু কীভাবে সেই সংগতি রক্ষিত হলো তার বিশিষ্ট চেহারাটা তো দেশে দেশে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। নব্যতন্ত্রের ছিন্নমূল রচয়িতারা কোনও বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে (এই কারণ বা কারণগুলি নিশ্চয়ই বিশ্লেষণযোগ্য) দেশের ঐতিহ্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন—কিন্তু তাই বলে কি সংস্কৃতির বিশিষ্টতাকেই অস্বীকার করতে হবে? না কি এটাই বলা উচিত যে, এই বিশিষ্টতা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন—এটা তাদের ট্র্যাজেডি। এ-কথা ঠিক যে একটা দেশ বা একটা জাতির সংস্কৃতি পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, তাকে অর্জন করতে হয়। এইজন্যেই তো অনুসন্ধান ও অনুশীলনের প্রশ্ন বারংবার ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতো অনুসন্ধানীর অভিজ্ঞতাকে বোধহয় অতো সহজে অপ্রমাণ করা যাবে না। ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্যেই দেখেছি, মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর, এবং সে মাটি নিশ্চয়ই বাংলার মাটি। অবশ্য তাতে এটাও অপ্রমাণিত হয় না যে বাংলার সংগীত-পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। কিন্তু বিভিন্ন ধারার মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কটিও ধূর্জটিপ্রসাদই আমাদের দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এ-দুয়ে ঠিক সমান্তরাল গতিতে চলে নি। ধূর্জটিপ্রসাদই বাংলাদেশে ধ্রুপদ ও কীর্তনের প্রাধান্য বহুস্থলে দেখিয়েছেন। তিনিই আবার অন্যত্র বলেছেন ('কথা ও সুর', উপক্রমণিকা): "বাঙালি বোধহয় কখনও অন্ধ অনুকরণের রাস্তায় চলে নি, স্বভাবের দোষে নয়, ইতিহাসেরই আশীর্বাদে।" স্বভাবও কিন্তু ক্রমান্বয়ে গঠিত হয় ইতিহাসের নানা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ধূর্জটিপ্রসাদকে অনুসরণ করে আমরা দেখেছি, গোটা সংগীতের বিশ্বপট থেকে ভারতীয় সংগীত কখনোই একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, অথচ কালে কালে তার মধ্যে এক স্বতন্ত্র মূল্যবোধও গড়ে উঠেছে, অনুরূপভাবে বাংলা গানও ভারতীয় সংগীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু কালের প্রবাহে তারও মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার দানা বেঁধেছে। একালের প্রগতিশীল ধারা এ-সবকে আত্মস্থ করেই ক্রমান্বয়ে আগামীদিনের যুগধর্মকে রূপ দিতে অগ্রসর হবে—ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে এরকমই একটা সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যাশিত ছিল। তাছাড়া, ১৯৩৫ সালের মতের তীব্রতা হয়তো পরবর্তীকালে কিছুটা স্তিমিত হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত আমরা আগেই কিছুটা লক্ষ্য করেছি।

এর পর অন্য বিষয়টি। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই বলেছেন, সমস্ত আর্টের মতো সংগীতেও চলার চেয়ে থামতে জানার গুরুত্ব কম নয়। তিনি আরও বলেছেন,

"একটি মেয়ে সব অলঙ্কার পরে সামনে দাঁড়াবে কেন ? এ হলো উৎকট প্রদর্শন-বৃত্তি"। এ-সব কথা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি এবং ধূর্জটিপ্রসাদের উত্তর কী তাও আংশিকভাবে জেনেছি। ১৯৩৫ সালের ২১ মার্চ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "Art is never an exhibition but a revelation। [শিল্প কখনোই প্রদর্শনী নয়, প্রকাশ।] exhibition-এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গর্ব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি। ওস্তাদি গানে এই জরুরি নেই, সে কেন যে কখনোই থামে তার কোনও অনিবার্য কারণ দেখিনে। অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্যতা আছে এবং উপাদান প্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে। বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট নয়—বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট হতে পারে।" এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ ধরেই নিয়েছেন যে সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যা মতামত তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব "রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত হবেই হবে।" এ জন্য প্রথমেই তিনি উভয়ের মতের মিলের দিকটা বিবৃত করে নিয়েছেন, যাতে গরমিলের ক্ষেত্রটি যথাসম্ভব সংকুচিত হয়। প্রথমত উভয়েই সংগীতে গায়কের আনন্দ বাদ দিতে চান না, বরং উপভোগ করতেই চান। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতো ধূর্জটিপ্রসাদও মুক্তিপ্রয়াসী, তাই রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার ঐতিহাসিক সার্থকতা ও অধিকার তিনি স্বীকার করেন। এই মুক্তি যেহেতু নিজেদেরই মুক্তি সেহেতু বিদেশি সংগীতে তাঁর প্রতিতুলনা না খুঁজে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে আমাদেরই পরিচিত অন্য সংগীতের পাশে তিনি বসাতে চান ও তার সঙ্গে যোগসূত্র খোঁজেন। ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষার ভার যদি কেবল পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে থাকতো তাহলে সে এতোদিনে মরুতেই সারা হতো। সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে সংগীতের হরিজন বললেও তাকে অপমান করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের যে অভিযোগ তানসেনের বিরুদ্ধে আবুল ফজলেরও অভিযোগ ছিল তা-ই। তৃতীয়ত, এদেশি সংগীতে যে দুটি প্রধান ভাগ আছে—আলাপ ও বন্দেশি—তার মধ্যে এই দ্বিতীয়টির প্রতি উভয়েই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। বন্দেশি গানে বন্দেশ অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই "সুরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো জোগান দেয়, গতির সীমা নির্ধারণ করে।" ধ্রুপদে, কিছু পাকা ঘরানার খেয়ালে এবং ঠুংরিতে এই বন্দেশি রচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং সেখানে রচনাকে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। কাজেই রচনার স্বকীয়তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে দরদ প্রত্যাশা করেন সেটা

তার প্রাপ্য।

মতের গরমিল আলাপকে নিয়ে। ধূর্জটিপ্রসাদ দেখাচ্ছেন যে এটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠি থেকে বাদ দিয়েছেন। আর্টের দিক থেকে বন্দেশি বড়ো কি আলাপ বড়ো এ-প্রশ্নের উত্তর আর্টিস্টের কৃতিত্ব-সাপেক্ষ এবং শ্রোতার রুচি-সাপেক্ষ। কিন্তু আধিভৌতিক বিচারে, ontologically, আলাপকে প্রাধান্য দিতেই হয়। রাগিণীর রূপ-বিকাশই আলাপের একমাত্র কাজ। অপরপক্ষে রচনা হলো কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন রস-সামগ্রী। "আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা—উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনা। · ঐশ্বর্য দেখানোতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেইজন্য নির্বাচন তাকে করতেই হবে। বন্দেশি গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবরক্ষায়, আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিণীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্তনে। আলাপই আমাদের pure music।·· আমাদের আলাপ গতিশীল, তার প্রকৃতিই হলো procession। অতএব ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।" ছায়ানটের আরোহী অবরোহী, তার বাদী সম্বাদী, তার 'পকড়' দেখিয়ে ছায়ানটের ঘটস্থাপনা হয়। কিন্তু তাতেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এরপর আলাপ চলতে চলতে সুরের blue print-টুকু পাওয়া যায়। 'কিন্তু নীল রঙের কাগজে সাদা আঁচড় দেখে বসবাসের সুখভোগ কি স্বাভাবিক? · ·· ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হলো গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে।" আলাপ বিস্তারের রীতিনীতি আছে—তার সুনির্দিষ্ট পন্থাও আছে, তবে সেটি বন্দেশি গানে রাগিণীর রূপ প্রকাশের মতো নয়। এখানে পরম্পরার রীতি ঘরানা হিসেবে ভিন্ন হলেও তার নীতি বোধহয় অভিন্ন। 'মূল অবশ্য ছায়ানট, অর্থাৎ অন্য রাগিণী নয়। মূলটাই ঐক্য বিধায়ক। এখানে একাত্মতা শেষ জ্ঞান নয়, এখানে ঐক্য সম্পূর্ণতার নামান্তর নয়। মূলগত ঐক্য বিস্তারের মধ্যেই ওতপ্রোত রয়েছে।" ধূর্জটিপ্রসাদের সন্দেহ যে রবীন্দ্রনাথ "আলাপ সম্বন্ধে teleologically চিন্তা করেছেন।" ['চিন্তা' করেছেন? লেখেন নি? একটু আগেই কিন্তু আমরা দেখেছি "আপনি চিঠিতে আলাপকে বাদ দিয়েছেন।" আলাপই কি রবীন্দ্রনাথের মতে রাগরাগিণীর সেই 'প্রটোপ্লাজম্' যার মধ্যে আয়তন আছে, স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে, কিন্তু কোনও পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই? 'সংগীত-চিন্তা', পৃঃ ১৩৯ দ্রষ্টব্য।] "যে জিনিস চলছে, চলতে

চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়?" "আলাপের শুরু হলো সীমার মাঝে। তার পর মূল বাঁচিয়ে, দুধারের সীমার মধ্য দিয়ে তার গতি অসীমের দিকে। দিক কথাটি লেখা উচিত হলো না, কারণ অসীমের দিক নেই—organic process-এরও নেই। ব্যাপারটা সাদি কিন্তু অনন্ত। যাওয়াটাই তার মজা, তার adventure। এই শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনের ধর্ম আছে।" সেই ধর্ম কী, অর্থাৎ একটা রাগের, ধরা যাক ছায়ানটের, আলাপ কীভাবে নানা স্থানকর্তবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাগের সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখিয়ে দেখিয়ে অগ্রসর হবে ধূর্জটিপ্রসাদ তার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। "আপনি বলেছেন reveal করা চাই, খুব খাঁটি কথা, আলাপই তো রাগিণীর (রচনার কথা আলাদা) সত্যকারের unfolding— ··· রাগিণী বলে পৃথক বস্তু নেই, প্রকাশেই তার অস্তিত্বস্ফুরণ।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সকল আর্টেই একটা অনিবার্য পরিসমাপ্তি আছে। কিন্তু "প্রত্যেক আর্টবস্তুর সময় যখন organic, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য পরিসমাপ্তি স্বীকৃত হবে কী করে?···'চার অধ্যায়' পাঁচ অধ্যায় হয় না যেমন, 'গোরা'ও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয় না।···আলাপের উদ্দেশ্যই যখন আলাদা তখন বন্দেশি আর্টের অনিবার্যতার নিয়মাবলী কি এখানে প্রযোজ্য? তাই বলে নির্বাচনের দায়িত্ব নেই এ-কথা বলবো না।···আমি dialectic process মানি···quantity থেকেই quality-র পরিবর্তন হয়।"

আলাপের এমন চমৎকার বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনা আমরা আধুনিককালে কুত্রাপি দেখি নি। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদও পরবর্তী একটি চিঠিতে স্বীকার করলেন যে "কোনও গায়ক, কোনও আলাপিয়াও, রূপসৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্ত নন।" আলাপিয়া কিন্তু যে-রূপ সৃষ্টি করেন সেটা নিছক রাগিণীর রূপ—রাগিণীরই অন্তঃস্ফুট ও বিকাশশীল স্বানুভূতি—অন্য কোনও রূপ নয়। যা 'সাদি কিন্তু অনন্ত' তার রূপের কথা শুনলে প্রথমটা একটু খটকা লাগেই। বিষয়টির আর একটু ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো। তথাপি রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা তাঁর নিজস্ব সাংগীতিক রচনারই অভিজ্ঞতা। শিল্পী হিসেবে অন্যবিধ অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে না পারা অস্বাভাবিক নয়। এতে কিছুটা একদেশদর্শিতার আশঙ্কা থেকেই যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের অত্যন্ত নিপুণ ও রসজ্ঞ বিশ্লেষণের পরেও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী চিঠিতে (৯ এপ্রিল, ১৯৩৫) প্রশ্ন করে বসলেন, "আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার করা কঠিন। সমগ্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেখবো কী করে?" কিন্তু তার আগেই ধূর্জটিপ্রসাদ বলে নিয়েছেন,

"পরিশেষের ঐক্য তিনিই চাইতে পারেন যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অতীত।" এ-যুক্তি একেবারে অকাট্য বলেই মনে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদের মূল চিঠিটি (২৫ মার্চ) এ-দেশের সংগীত-সমালোচনা-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ এবং রবীন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নই তার আশু প্রেরণা।

১০

ধূর্জটিপ্রসাদ চিরদিনই শিক্ষিত সংগীত-সমালোচনার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সংগীতের, এবং বিশেষ করে নিজের গানের, একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। অথচ তিনি ওস্তাদ ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ—কেউই ওস্তাদ নন। গত যুগে বাংলা দেশে সংগীতের যা কিছু উন্নতি হয়েছে সবই প্রায় 'এমেচার'র দ্বারা। শিক্ষিত সমালোচনার সমস্যা এই যে, প্রথমত, বাংলা সাহিত্যে সুর-সমালোচনার ইতিহাস নেই। দ্বিতীয়ত, সংগীত ভাবরাজ্যের ব্যাপার এবং আমাদের সংগীত নিতান্তই আধ্যাত্মিক বলে লোকের ধারণা। অতএব 'বাহবা' কিংবা 'ধুত্তোর' বলা ছাড়া শ্রোতার অন্য কর্তব্য যে আছে শ্রোতা নিজেই জানে না। তৃতীয়ত, সংগীত এখনও একটি গোপনীয় আচার বলে গণ্য হয়। গোপেশ্বরবাবু অবশ্য স্বরলিপি ছাপিয়ে সমালোচনার পথ অনেকখানি পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু ওস্তাদের হাতে ও সংগীত-বিদ্যালয়ে শুধু ওস্তাদ তৈরি হচ্ছে—কাচ তৈরিও হচ্ছে না, মাজিতও হচ্ছে না।

সংগীতে শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে "আমি এই গুণগুলির আধারকে বুঝি, হিন্দুস্থানি সংগীতে অভিজ্ঞতা, artistic sense অর্থাৎ রূপজ্ঞান ও রসবোধ, যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং মনের প্রসারতা ও উদারতা—এক কথায় বৈদগ্ধ্য।" ('বক্তব্য', পৃঃ ২০৩)। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান শিখে শিক্ষিত সমালোচক হওয়া যায় না। শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানি পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে—ওস্তাদদের সাহায্যে এবং "তারপর ওস্তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।" (ঐ, পৃঃ ২০৪)। উপযুক্ত শিক্ষার পরেই আসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিব্যজ্ঞান বা মূল্যজ্ঞান। "আলাদা করে দেখলে এই দিব্যজ্ঞানের তিনটি দিক আছে, এরমধ্যে বুদ্ধির কাজ বিচার, ভাবের কাজ ভালো লাগা না লাগা এবং ইচ্ছাশক্তির কাজ সিদ্ধান্তে আসা।" (পৃঃ ২০৫)। অন্যান্য জ্ঞানের প্রসার হওয়াও দরকার। আর সেই সঙ্গে চাই স্বর ও সুরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা। বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলতে তিনি পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের কথাই বুঝেছেন। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারাই

সমালোচনা সম্ভব। "নারদ ঠাকুর, হনুমন্ত, ভরতের ঘাড়ে সংগীত-সমালোচনার সম্পূর্ণ ভার না চাপিয়ে বর্তমান ওস্তাদ, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোকের উপর সংগীতের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের ভার দিলে লাভ বৈ ক্ষতি নেই।" (ঐ, পৃঃ ২১০)। সোজা কথায় সমালোচক যেন empirical হন। "আমার আদর্শ সংগীত-সমালোচক—রসিক পুরুষ, ভদ্র ও শান্ত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও উদার। স্রষ্টা কিংবা ওস্তাদ হবার তাঁর কোনও বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি specialist হবেন না। বিদ্যাকে যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র [না] ভেবে, সৃষ্টির শেষ কথা অর্থাৎ রস ও রূপ উপভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে। আমার আদর্শ সমালোচক গম্ভীর হবেন, কিন্তু তাঁর হাসবার ক্ষমতা থাকবে, নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ঠাট্টা করবার শক্তিও থাকবে। সংগীত সমালোচনায় বীরবলী মনোভাবের পরশ নিতান্তই বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।" ('বক্তব্য', পৃঃ ২১৪)।

প্রবন্ধের এই শেষাংশে বীরবলের উল্লেখে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ বীরবলের অনুরাগী ছিলেন, এ-কথা আমাদের জানা। দুজনেই চূড়ান্তভাবে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, দুজনেই সংগীতের সমঝদার। উভয়ের মধ্যে মিল ছিল পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে, স্বভাবের প্রশ্ন-কণ্টকিত গাম্ভীর্যে. সঙ্গে সঙ্গে নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ঠাট্টা করতে পারার সামর্থ্যে। কিন্তু নিজের যে ডায়ালেক্‌টিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বারংবার ঘোষণা করেছেন ও প্রমাণ করেছেন তার পরিচয় বীরবলে কি খুব সহজলভ্য? বীরবলের ফরাসি-সুলভ ও মার্জিত বুদ্ধিচর্চার সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এই চলিষ্ণুতা ও দায়বদ্ধতা, ইতিহাস ও সমাজ-জিজ্ঞাসার সূত্রে সংগীতকে বিচার ও উপভোগ করার এই মনোভঙ্গি—এ-দুয়ের মিল কি খুব আত্যন্তিক?

ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে সংগীত ও জনজীবনের মধ্যে একটা সত্যিকার জীবন্ত সংযোগ রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে এই জীবন নিজেকে সমৃদ্ধ করার নতুন নতুন সুযোগ রচনা করে চলেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু সকল ভবিতব্য কেবল সম্ভাবনার স্তরে। ধূর্জটিপ্রসাদের চূড়ান্ত কামনা: "যা সম্ভাবিত তা প্রকটিত হোক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আজ প্রয়োজন একটা ধাক্কা খাওয়ার যাতে তার সংস্কৃতি ও সংগীত জীবনের একেবারে উৎস থেকে নতুন আয়ু সঞ্চয় করতে পারে এবং বিশ্বসংস্কৃতির প্রশস্ত ধারায় নিজস্ব কিছু দান রেখে যেতে পারে।" ('ভারতীয় সংগীতের উপক্রমণিকা' গ্রন্থের উপসংহার)।

নূতন উপন্যাস ও ধূর্জটিপ্রসাদ

সুব্রত পাণ্ডা

'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫ খৃঃ), 'আবর্ত' (১৯৩৭ খৃঃ) আর 'মোহানা' (১৯৪৩ খৃঃ)—মাত্র এই তিনটিই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাসে অবদান। পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে এই তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে পৃথকভাবে বা একসঙ্গে চড়া সুরে নানান কথা বলা হয়েছে। যে ব্যাপারে তবু সবাই একমত হতে পেরেছেন, তার স্পষ্ট প্রকাশ 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের সমালোচনায়। লেখক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ('পরিচয়' পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৭২)। তিনি বললেন, "...একে উপন্যাসই বলা হোক বা আর কোন নামেই ডাকা হোক, অন্তঃশীলা কেবল সম্পূর্ণভাবে নূতন নয়—অন্তঃশীলা অসাধারণ বই।" পাকাপাকিভাবে এ মতের সমর্থক না হয়েও '"অন্তঃশীলা"র বিচার' শীর্ষক লেখায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মন্তব্য: "বইখানির গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক না হলেও, বঙ্গসাহিত্যে নতুনতর" (অলোক রায়: ধূর্জটিপ্রসাদ, উঃ, পৃঃ ৮৭)। "এবং বাঙালীদের মধ্যে একা ধূর্জটিপ্রসাদই বোধহয় এই উপন্যাস প্রণয়নে সক্ষম"—এরকম কথা 'অন্তঃশীলা'র আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন ('কুলায় ও কালপুরুষ', সিগনেট প্রেস, ১ম, সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৪, পৃঃ ৯৩)। আর 'অন্তঃশীলা'র ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ স্বয়ং উপন্যাসটির 'নূতনত্ব' সম্পর্কে পাঠককে সজাগ করে দিতে বিশেষ আগ্রহী: "বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নূতনত্ব আমার রচনা-ভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে"।

লেখক স্বয়ং এবং উল্লেখযোগ্য সমালোচকদের এরকম 'নূতনত্বের' ঢালাও মতামত সত্ত্বেও কিন্তু এই 'নবী' উপন্যাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। তবু 'অন্তঃশীলা'র দুয়েকটি সংস্করণ পাঠককে মাঝে মাঝে ধূর্জটিপ্রসাদের কথা মনে করায়, 'আবর্ত' ও মোহানা' স্মরণে ভ্রূ-কুঞ্চন প্রয়োজন। অবশ্য এটা ঠিক নয় যে, 'অন্তঃশীলা' পাঠকের নজর কাড়তে পেরেছে, অন্য দুটি এ বিষয়ে অসমর্থ ও ব্যর্থ। আসলে বোধ হয় তিনটি উপন্যাসকে একত্র খাড়া করে প্রথমটির স্বাদ নিয়ে বাকী দুটো সম্পর্কে পাঠকের সন্তুষ্টি এসে যায়; বাঙালী পাঠক যেহেতু 'পথের দাবী' ধরনের রঙীন ফানুসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন আর যখন কল্লোলীয় আপাতসমাজ-বাস্তবতাকে যথেষ্ট

তৃপ্তির সঙ্গে জনরঞ্জনের কায়দা হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ, তখন সাম্যবাদী আন্দোলন, কম্যুনিষ্ট চরিত্র এবং ব্যক্তি থেকে 'পার্সোনালিটি' আবিষ্কারের জটিল প্রক্রিয়ায় পাঠক বিশেষ খুশী হতে পারেন নি। তবু যেহেতু স্মৃতি-অনুষঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে প্রায় অভিনব তাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদের 'ত্রয়ী'তে 'প্রখর বুদ্ধিচর্চা' (এই সেদিনও 'অন্তঃশীলা'র পুস্তক সমালোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮-১১-১৯৮২) খুঁজে পেলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা মারফৎ যেটুকু সমাজবাস্তবতা তবু ধূর্জটিপ্রসাদ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাও পাঠকের দৃষ্টি থেকে এভাবে সযত্নে সরিয়ে নেওয়া হোল। ফলে 'উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্-চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃঃ ৮৫) সঙ্গতকারণেই এই 'ত্রয়ী'র কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, তেমনি উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা বাস্তবতা পছন্দ করেন তাঁরাও অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে এই 'ত্রয়ী'কে ভুলে যান।

তবু প্রায় ভুলে যাওয়া উপন্যাসগুলির দিকে চোখ ফেরাই। 'অন্তঃশীলা' 'এই জীবন' নামক গল্পের উপন্যাসরূপ। 'অন্তঃশীলা'য় যে গল্পের শুরু তাই 'আবর্ত' ও 'মোহানা' বেয়ে আপাতপরিণতিতে পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকায় বলেছেন: "একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হ'ল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলা দেবীর প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এখানেই শেষ হয় নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে"। সাধারণ মানুষ আর উচ্চমধ্যবিত্তের নীতিহীনতা মেকীপনা ও ধর্মীয় ভণ্ডামির পরিবেশে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর খগেনবাবু একাত্মতা খুঁজে পান না। স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিতে তিনি গররাজী। সাধারণের সঙ্গে মেশা যায় না। জীবনের সঙ্কট তীব্রতর হয় যখন স্ত্রী সাবিত্রী আত্মহত্যা করেন। স্ত্রীর আত্মহত্যায় তিনি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় স্ত্রীর বান্ধবী রমলাদেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। রমলাদেবী, খগেনবাবুর চিন্তায় একদা উজ্জ্বল হলেও ফ্যাসন প্যারেডের রমলাদেবী এখন খগেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্তত স্ত্রী সাবিত্রীর তুলনায় রমলা দেবী খগেনবাবুর চিন্তায় অনেক উঁচুতে স্থান পেয়ে যান। এরমধ্যে সুজন ও বিজন নামক দুই পুরুষের প্রবেশ ঘটে। সুজন খগেনবাবুর মতোই বই পছন্দ করেন। সুজনের চিন্তায় ও কথাবার্তায় খগেনবাবুর মূল্যবোধ অনেকটা প্রশ্রয় পায়। বিজন উচ্চমধ্যবিত্ত সন্তান। টেনিসের

র‍্যাকেট আর এইচ. জি. ওয়েলসের উপন্যাস নিয়েই তাঁর সময় কাটে। সাবিত্রী ও রমলা দেবীর পাশাপাশি আর একটি নারীচরিত্র আমরা পেয়ে যাই। তিনি খগেনবাবুর মাসিমা। অধুনা কাশীতে থাকেন। সাবিত্রী আর আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের বিপরীত মেরুতে মাসিমার অবস্থান: 'তাঁর সাবিত্রীর বন্ধুদের মত উচ্চ শিক্ষা ছিল না, ছিল হৃদয়।...ও ধরনের স্ত্রীলোক লোপ পাচ্ছে, আজকাল সকলে স্বাধিকার প্রমত্ত, অথচ ক্ষমতা নেই'। অবশ্য সাবিত্রীর মতোই মাসিমা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য খগেনবাবুর কাছ থেকে শোনা যায়। 'অন্তঃশীলা'য় খগেনবাবু সাবিত্রী, একসময়ের রমলাদেবী আর বিজনের পৃথিবী ত্যাগ করে মাসিমা, সুজন ও এখনকার রমলাদেবীর ভুবনে নিশ্চিন্ত হতে চান। নিশ্চিতভাবে কিন্তু তিনি রমলাদেবীকে গ্রহণ করতে পারছেন না এখনও। প্রত্যাখ্যান-আকর্ষণের দ্বন্দ্বে এখনও তিনি অস্থির। এরকম দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তা নিয়ে তিনি কোলকাতা ত্যাগ করে কাশীতে মাসিমার কাছে চলে যান। প্রেমের টানাপোড়েনে রমলাদেবীও সুজনকে সঙ্গে নিয়ে কাশী রওনা দেন। 'অন্তঃশীলা'য় দ্বিতীয় উপন্যাসের শুরু।

'আবর্তে' সুজনই বিশৃঙ্খলার ঝড় বইয়ে দেয়। যে সুজন এতদিন খগেনবাবুর ঢালাও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে সে ই রমলাদেবীর প্রেমিক হিসেবে খগেনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী। রমলাদেবীর ছোট ভাই এর মতো যাঁকে আমরা দেখে এসেছি তাঁর এরকম হৃদ-পরিবর্তনে অস্বাভাবিক মানসিক ক্লেদের জন্ম দেয়। প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের আর একদফা সমালোচনা এসে পড়ে। সুজনকে ছেঁটে ফেলে রমলাদেবী খগেনবাবুর কাছে চলে আসেন। কিন্তু নায়কের উদ্দেশ্যহীন, নিয়ত পরিবর্তনশীল চিন্তায় ও অস্তিত্বে রমলার স্থান আছে এবং নেই। মধ্যবিত্ত সমাজের দোদুল্যমান অবস্থা শুধু শ্রেণী-অবস্থানে নয় ঘরোয়া ব্যাপারেও প্রকট হয়ে ওঠে।

মাসিমার মৃত্যুর পর 'মোহানা'র শুরু। রমলাদেবীর সন্তানসম্ভাবনা ও সাময়িক বন্ধ্যাত্ব আর কাশীর ক্লেদাক্ত জীবনে ওঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। 'অন্তঃশীলা' থেকে কাশীর অভিজ্ঞতা পর্যন্ত খগেনবাবুর জীবনের সারসংকলন করে লেখকের সিদ্ধান্ত: "সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চা, মাসিমার মৃত্যুকে তিনি এক মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন, পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তস্থ সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাবেন প্রত্যাশা করেছেন, কিন্তু আজ মনে হয় স্তর সেটা কেবল সাপ-মই খেলার ধাপ, পেঁয়াজের ফুটে সেই খোসা ছাড়া আর কিছুই নেই" ('মোহানা', ভারতী ভবন, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ: ৫)। কাশীর পাট চুকিয়ে দিয়ে খগেনবাবু ও রমলা দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। অপ্রত্যাশিত ভাবেই (যদিও অস্পষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল)

তাঁরা কানপুরে এসে পড়েন। উপন্যাসে নোতুন দিক সংযোজিত হয়। খগেনবাবু অধুনা-সাম্যবাদী বিজনের সাহায্যে কানপুর শ্রমিক ধর্মঘটে পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। শ্রমিক নেতা সফীক, মহবুব ও করীম প্রভৃতি সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে খগেনবাবু পরিচিত হন। যতই মধ্যবিত্ত খগেনবাবু শ্রমিক আন্দোলনে বেশী বেশী জড়িয়ে পড়ছেন, রমলাদেবীও খগেনবাবুর কাছ থেকে দূরে সরে যান। রমলাদেবী সাবিত্রীর আত্মহত্যার পূর্বের জীবনে মুক্তি খুঁজে পান। ধর্মঘটের অসাফল্যে সাম্যবাদী বিজন হতাশ হয়ে টেনিসের লনে আর ক্লাবের মোহমুগ্ধ জীবনে ফিরে যান। খগেনবাবু যদিও মিথ্যে খুনের দায়ে আটক সফীককে মুক্ত করার কাজে হাত লাগান তবু তিনটি উপন্যাস এরকম একটি স্বর তুলে স্থির হয়ে যায়:— "...শয্যায় সাবিত্রী ও রমলা, তবুও সেই দুর্বতিক্রম্য ব্যবধান দূর হল না।...বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহচর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল। আজ রমলা স'রে গেছে, আন্দোলনের প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে-সেই" ('মোহানা', পৃঃ ১৯৩)।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, "অন্তঃশীলা আমি ভাবের বশে লিখিনি"। সে কোন উপন্যাস সৃষ্টির সময় লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, এ কথাটি না বললেও বোঝা যায়। শুধু শুধু লিখতে বসার ইচ্ছে ধূর্জটিপ্রসাদের মতো আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে আশা করা যায় না। 'ঝিলিমিলি'র ২২-৫-৫৮ তারিখে উনি লেখেন: "এইটা নিয়ে উনিশখানা বই লিখলাম কি লিখেছি তাই জানি না। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে Personality বলা চলে—নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই, অর্থনীতিতে তাই, ইতিহাসেও তাই, সঙ্গীতেও তাই। এরই আশেপাশে কার্ল মার্কস। আমার জীবনে মার্কসিজম-এর প্রভাব বেশী। সমাজতত্ত্বে ইতিহাসে মার্কসিজম্ চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে। নিজেকে Marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল" (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, , পৃঃ ২১)। আবার, ইন্দিরা দেবীর 'অন্তঃশীলা'র বিচারের উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে 'বয়ান্ ই-তহরিরি'তে মন্তব্য: "বইখানাতে সমাজ-সমালোচনা আছে—বিশেষতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের" (উদ্ধৃত, অলোক রায়—ধূর্জটিপ্রসাদ, বাগর্থ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০, পৃঃ ১০৬)।

মার্কসবাদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাসেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-

বাদের সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। খগেনবাবুর স্মৃতিপ্রবাহ, অন্যান্য চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং লেখকের স্বগতোক্তিতে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত সমাজের সমালোচনা আছে, এ আশা করা যায়। লেখক নিরেট মধ্যবিত্ত সমাজ তুলে ধরলেন। এখানেই শুরু হোল নিঃসঙ্গতা, স্ত্রী-পুরুষের অসমতা, রাজনৈতিক জগতে অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামি। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বাইরের জৌলুষ নিয়ে ব্যস্ত। খগেনবাবু এ সমাজেরই একজন হয়েও পৃথক। নিঃসঙ্গ খগেনবাবুর উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবস্থান থেকে সচেতনভাবে সরে যাওয়ার কাহিনী 'অন্তঃশীলা'। মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানে খগেনবাবু একটানা তাত্ত্বিক প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন। যত বেশী করে তিনি তত্ত্ব দিয়ে এই সমাজের বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ঠিক তত দ্রুতভাবে তিনি এই সমাজের একজন হয়ে ওঠার ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা দেখান। অচেতন বা অর্দ্ধসচেতনভাবে ঐ একই অবস্থানে ফিরে আসার তীব্র আকুতি ফুটে ওঠে।

এই প্রক্রিয়ার গোপন ফল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে: "লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, রসবোধ আছে,—ভূয়োদর্শন ও ভূয়োচিন্তা আছে। মালমসলা সবই আছে, তবে ইমারত গড়েছেন কিনা সে বিষয়ে আমি নীরব, কারণ বুঝতে অক্ষম" (অলোক রায়, পৃঃ ৯৯)। এর উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদ অক্ষম খোঁড়া যুক্তি সরবরাহ করে ক্ষান্ত থাকেন: 'খগেন চরিত্র হিসেবে কেবল impossible নয়, futile' (অলোক রায়, পৃঃ ১০৬)। সুতরাং 'অন্তঃশীলা'র আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন, 'তাঁর কর্তব্য স্বসমুখ পাত্র-পাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা'; বা বিষ্ণু দে 'আবর্তে'র পুস্তক পরিচয়ে লেখেন 'পাত্র-পাত্রী-চরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুখ বা ইমাজেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ বা তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থি-মজ্জায় ছড়িয়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা-ব্যবহারে, প্লটরীতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব' ('পরিচয়', সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন, পৃঃ ৮১); কিংবা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সিদ্ধান্ত করেন, 'এই উপন্যাস তিনটিতে সমগ্রতা-সন্ধানী (কেননা সমগ্রতাই সার্থকতা) আধুনিক মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিজনিত যন্ত্রণারই প্রতিফলন ঘটেছে' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সাহিত্যশ্রী, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭১, পৃঃ ৩৩২); এই তিনটি মতামতই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের বিশ্লেষণ নয়। এঁরা 'সমগ্রতা সন্ধানী' ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনায় উপন্যাসের বাইরে ধূর্জটিপ্রসাদের মতামত বা উপন্যাসের মধ্যে সংযোগহীন কিছু বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই এরকম

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তা যদি নাই হোত তাহলে তাঁরা স্পষ্টভাবেই পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া এবং প্রাসঙ্গিক স্মৃতির সঙ্গে লেখকের স্বগতোক্তি আর খগেনবাবুর অপ্রাসঙ্গিক স্মৃতির পাশাপাশি অবস্থান দেখতে পেতেন। দেখতে পেতেন খগেনবাবু যা প্রত্যাখ্যান করছেন তাই গ্রহণ করতে দ্বিধা করছেন না। স্ত্রী সাবিত্রী যদি মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মহিলা হিসেবে বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হন, সেই সঙ্গে রমলাদেবীও খগেনবাবুর চিন্তায় বাতিল হয়ে গেছেন: "কোলকাতা সহরে আগুন লাগাতে সান্ধ্যভ্রমণে" (পৃঃ ৪) রমলাদেবী বেরোন। এই উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বিশ্রী হয়ে ওঠে: "সে রং ঢাক ফুলের মত তীব্র, রমলা দেবীকে মন্দ দেখাচ্ছিল না। শীতের পর নিজলা দেশের দিগন্তব্যাপী মাঠে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে, তারই একটি লেলিহান শিখা যেন মূর্তি নিয়েছে, সহরের মধ্যে, এই টুকুই অশোভনতা" (পৃঃ ৭)। এই 'অশোভনতা' কোন যাদুকরের দণ্ডে শোভন হয়ে যায় যাতে করে খগেনবাবু স্ত্রী সাবিত্রীর সৎকারের রাত থেকে আরম্ভ করে একেবারে 'মোহানা'র শেষ অবধি এই ধারণায় বুঁদ হয়ে থাকেন? আবার উপন্যাসের ঘটনা, সংলাপ আর স্মৃতি-অনুষঙ্গ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, রমলাদেবী মোটেই অশোভন নন। তাঁর অতীত জীবন সুখের হয় নি। স্বাধীনভাবে জীবন বাস করছেন। স্ত্রী সাবিত্রীর মৃত্যুর পর খগেনবাবু যখন তাঁর সান্নিধ্যে আসেন তারপর থেকে রমলাদেবী নিজেকে খগেনবাবুর মতো তৈরী করে নিতে কসুর করেন নি। অন্তত তাঁর কাজকর্ম ও সংলাপে অশোভনতার কোন চিহ্ন ছিল না। এমন কি 'আবর্তে' এসে সুজন যখন আকস্মিকভাবে তাঁর প্রেমিক সেজে বসেন তখনও রমলাদেবী হাল্কা প্রেমের লীলায় মেতে যান নি। জীবনে কিছু অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু তিনি খগেনবাবুর সঙ্গে নিবিড় হয়ে থাকতে চেয়েছেন। সাময়িক বন্ধ্যাত্বের পর মানসিক চাপের তিনি শিকার হয়েছিলেন, তাতেও তিনি এমন কিছু করে বসেননি যাতে খগেনবাবুর রমলাদেবী সম্পর্কে শ্রদ্ধা কমে যায়। 'মোহানা'র প্রায় শেষ দিকে এসে আমরা দেখতে পেলাম রমলাদেবী হাল্কা প্রেমের গড্ডালিকায় গা ভাসিয়েছেন। এই পরিণতির জন্য রমলাদেবী কতটা দায়ী? এরজন্য খগেনবাবুর দায়িত্ব কতখানি? এবং এখান থেকে আমরা যদি এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করি যে, রমলাদেবী ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের জাঁদরেল প্রতিনিধি, এবং এ পরিণতির কথা আমরা আগেভাগেই আঁচ করেছি, তাহলে তা কি খুব বাস্তববাদী সমালোচনা হোল নাকি ভাববাদী জোয়ারে সমালোচনা ভেসে গেল। 'বাস্তববাদী' কথায় আবার ধূর্জটিপ্রসাদের আপত্তি আছে, তিনি চান: "নিতান্ত concrete ভাবে আজকাল

বাংলা ভাষায় লেখা উচিত ..আজকালকার আমাদের নভেলিস্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিংবা naturalist করে তুলছেন…concrete হওয়ার অর্থই হোলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া। পরে ব্যক্তিসম্পর্কতা থাকে ত' দেখা যাবে…এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল। বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—তাদের প্রধান কথা, stream of consciousness ততটা নয় যতটা romantic প্রভাব থেকে concreteএ আসা। আশ্চর্য! তিন-চারজন ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেন নি—বুঝলে সুবিধে হোতো" ('ঝিলমিল', ৭।৭।৫৯, পৃঃ ৬৩)। 'Concrete' তিনি হতে চান, যাতে বুদ্ধি দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থাকে চিনে নেওয়া যায়। 'প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল' বলেই রমলাদেবীর শেষ অবস্থা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। সম্পূর্ণভাবে উপন্যাসের বাইরের মতামত অনুযায়ী রমলাদেবী সম্পর্কে বিশ্বাস করতে হয়। এখানে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটলেই রমলাদেবীর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না। চরিত্র হিসেবে রমলাদেবী 'সোনার পাথরবাটির' মতো সত্য। গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে একটা বাজে বলে বিশ্বাস করলে যেরকম 'বুদ্ধির খেলা' হয়, রমলাদেবীর পরিণতিও সেরকমই 'বুদ্ধির খেলার' অপেক্ষা রাখে। এরকম improbable (impossible নয়) চরিত্রের পরিণতি দেখিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ কী সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিলেন? আর যাই হোক, রমলাদেবীকে বেছে নিয়ে সমগ্রতার সন্ধান করা চলে না। শুধু তাই নয়, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায় তা শুধু অবাস্তব নয়, মারাত্মকভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী যা একজন সচেতন লেখকের (যাঁর ওপর মার্কসবাদের প্রভাব অসামান্য) কাছ থেকে আশা করা যায় না।

সুজনের improbability সম্পর্কে আগেই বলেছি; এখন বিজনের কথায় আসা যাক। আর যাই হোক বিজন 'স্বসমুখ পাত্র' নয়। যে-বিজন বড়লোক বাবার ছেলে, যাঁর একমাত্র কাজ 'মাছরাঙা সেজে' টেনিস খেলতে যাওয়া আর এইচ জি. ওয়েলসের উপন্যাসে আদর্শ খুঁজে বেড়ানো, তাঁর পক্ষে 'ছাত্র-সমাজের একজন কর্মিষ্ঠ বামমার্গী সভ্য' ('মোহানা', পৃঃ ১) হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া খুব স্পষ্ট নয়। শুধু এখানেই থেমে না গিয়ে বিজনকে কানপুরের শ্রমিক-ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করানোয় লেখকের যে উদ্দেশ্য থাকুক না কেন তাতে বিজনকে চরিত্র হিসাবে বিশ্বাস করতে যেরকম কষ্ট হয় তেমন সাম্যবাদী শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অবাস্তব ভাবনা চিন্তা জট বাঁধে। শুধু লেখকের ওপর মার্কসবাদের প্রভাব আছে এবং খগেনবাবুর ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নের একমাত্র রাস্তা সাম্যবাদী

আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং এভাবেই শুধু 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে' পৌঁছুনো যায় তাই বিজনকে কানপুরের শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিতেই হবে আর তাহলেই খগেনবাবু রমলাদেবীকে নিয়ে কানপুরে পৌঁছে যেতে পারেন এরকম সরলীকরণের ঝোঁক থেকেই বিজনের এই পর্যায়ের গল্পাংশের অবতারণা। এরকম না হলে 'মোহানা'র পূর্ববর্তী 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্তে' এধরণের কোন প্রচ্ছন্ন-সূত্র আবিষ্কার করা যেত না। সাম্যবাদী আন্দোলনে আকস্মিক ভাবে বিজনের প্রবেশ এবং ততোধিক আকস্মিকভাবে মাছধরা সেজে' আবার টেনিস খেলতে যাওয়ার পরিণামে শুধু বিজনই improbable নয়, ভারতবর্ষের তদানীন্তন সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হয়। বিজন সাম্যবাদী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ কর্মী, অথচ আন্দোলনের সময় নেতৃত্বের অন্যায় নজরে পড়তেই সাততাড়াতাড়ি রমলাদেবীর সাহচর্যে সাম্যবাদ বিরোধী শিবিরে যোগ দেবেন—এতে সাম্যবাদের অক্ষমতা যতটা না প্রকাশ পায় তার চাইতে বেশী করে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। বিজনের মতো বহু উদাহরণ সাম্যবাদী আন্দোলনে ঘটছে। এটা মেনে নিয়েও বলা যেতে পারে, যখন ধূর্জটিপ্রসাদ সমগোত্রের সন্ধানী এবং তাঁর সব সময়ের সমস্যায় মার্কসবাদের প্রভাব স্বীকৃত তখন বিজন চারিত্রটিকে বেছে নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের দুর্বল জায়গাটি চিহ্নিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু বিজনরাই শেষ কথা নয়। সাময়িক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মার্কসবাদই যে আপামর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নরক থেকে মানবসভ্যতাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পৌঁছে দিতে পারে—এরকম তত্ত্ব সম্পর্কে লেখক অনবহিত নন। তা-সত্ত্বেও যখন বিজন এমন কি নেতা সফীককেও আর প্রায় সবকটি মর্মঘাতী চরিত্রকে অমার্কসবাদী-জনগণবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখি তখন ধূর্জটিপ্রসাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগে বিস্তর ফারাক আছে—এরকম উচ্চারণ করা সম্ভব। ঔপন্যাসিক যেহেতু দৈনন্দিনের মালমশলা ঝাড়াইবাছাই করে তাঁর সৃষ্টির সম্ভার পছন্দ করেন তখন এ পছন্দের মধ্যেই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। প্যাটার্নই শিল্পীর সৃষ্টির মূলকথা। অবশ্য প্যাটার্নের কথা উঠলো বলেই প্রাসঙ্গিকভাবে বলি ধূর্জটিপ্রসাদ আবার সাহিত্যের ওপর ছবির প্রভাব অস্বীকার করে সংগীতের আঙ্গিকে উপন্যাস বিচারের উপদেশ দিয়েছেন: "বিদেশী সঙ্গীতে বিশেষতঃ fugue-এর, যাতে subject, একাধিক counter-subject থাকে, একটি অন্তুচির জবাব, মাঝে মাঝে ভাব হচ্ছে মাঝে মাঝে ঝগড়া, গড়ে তৈরি হচ্ছে রূপ নয়, style" (অলোক রায়, পৃঃ ১০৩)। subject আর counter-subject-এর নিরন্তর দ্বন্দ্বে 'style'ই হোক আর চিত্রশিল্পের প্যাটার্নই

হোক ফুটে ওঠে। কানপুরের শ্রমিক ধর্মঘট আর বিবিধ চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যা সৃষ্টি হোল : "অত্যাচারের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ হবার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়, কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন্ পংক্তিতে? থাকে যদি সে পাদটীকায়, তাও আবার দেশপ্রেমিক ভাষ্যকারের কৃপায়। সহনশীলতাই এ দেশের ধর্ম, রয়েছে আমাদের অস্থি মজ্জায়" ('মোহানা', পৃঃ ১৯)। ফলে সাম্যবাদী শিবির সমালোচনার তোপে পড়ে : "মার্কস নয়, মার্কস-ব্যাখ্যা, তাও পচা, সস্তা, ভুল, একপেশে। হেগেল, অ্যাডাম স্মিথ না পড়ে 'ক্যাপিটাল' কপ চান, মার্কস না ছুঁয়ে লেনিন, লেনিন না দেখে স্ট্যালিন, তাও না, দু আনার ঋজুপাঠ। কাঁচাপাকার অদ্ভুত সমাবেশ, বাঙালী মেয়েদের মতন, এধারে স্বার্থপরতায় ঝানু, ওধারে ভেন্দারের চেয়েও মস্তিষ্ক অপরিণত, কাঁচ থেকেই পচা..." ('মোহানা', পৃঃ ২৬)। এখানে সমালোচনা এভাবে চালানো হোল যা বন্ধুভাবাপন্ন নয়, শত্রুদের কাছ থেকে যা সহজে আশা করা যায়। তাই রমলার অশোভনতা আর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন মিলেমিশে এক জায়গায় দাঁড়ায় : "বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহচর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল" ('মোহানা', পৃঃ ১২৩)। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদী আন্দোলনে জন্ম থেকেই সংশোধনবাদ ও অ-মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা, কাজ জাঁকিয়ে বসেছিল, তার ইতিহাস ও কুফল আজকের সাম্যবাদী জনগণের কাছে অজানা নয়। সেগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনা চালিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলন বরং শক্তিসামর্থ্য পায়। বিজন, এমনকি নেতা সফীককে সঠিকভাবে দেখিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রগতিশীলতার সস্তা রোমান্টিসিজম পরিহার করেছেন ঠিকই কিন্তু একইসঙ্গে সাম্যবাদী দলের জন্মানোর পর থেকে সাম্যবাদী কর্মী, নেতা, ও তাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও আত্মত্যাগ ঔপনিবেশিক ভারতে কোনরকম দাগ কাটার কোন চিহ্ন উপন্যাসে উঁকি না মারলে 'concrete' বোধহয় খুব concrete থাকে না। তাই সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিণতিতে খগেনবাবুর হাতে চলে যাওয়ায় আমরা এখন থেকে আতঙ্কগ্রস্ত। অবশ্য এখনও অবাধ তথাকথিত সাম্যবাদী আন্দোলনে খগেনবাবুদেরই নেতৃত্ব বহাল থাকছে।

ফলে খগেনবাবু সফীকের গ্রেপ্তারের পর সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা। উনি নিঃসঙ্গ হয়ে শুরু করেছিলেন। পুস্তকপ্রেম ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। সাময়িকভাবে সুজন আর অনেকক্ষণ ধরে 'রমলাপ্রীতি' তিনি চালিয়েছেন। অবশেষে কানপুরের শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের ও নেতা সফীকের সংস্পর্শে এসে উনি বুঝে যান : "তার চেয়ে যে-চিন্তার উদ্দেশ্য সামাজিক বিবর্তনকে সাহায্যদান তার সাধনাই

মজল। একার কাজ নয় কিন্তু। সমগোত্রের সহানুভূতি চাই। চৈতন্য যতই উন্নত হোক না কেন, একজন, দু'জন, তিনজন পুরুষের চৈতন্য অসম্পূর্ণ। এইখানে পার্টির আবশ্যকতা" ('মোহানা', পৃঃ ৬৮)। একজন 'তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল' সাম্যবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব মেনে নিয়ে প্রয়োগ করতে শুরু করায় তাঁর জীবন অর্থবহ হয়ে উঠল। এই হচ্ছে খগেনবাবুর পরিণতি। এটি অস্বীকার করলে 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে' পরিণতি আসে না—বিজন, সুজন, রমলাদেবী পৌছুতে পারেন না। তত্ত্বটি ভুল কি ঠিক তা নিয়ে মার্কসবাদী পণ্ডিতরা এবং যাঁরা সচেতনভাবে এই তত্ত্বকে বুঝে প্রয়োগ করার রাস্তায় অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে নেমেছেন তাঁরা বিচার করতে পারবেন। আমাদের দ্বিধা অন্য জায়গায়। যে কারণে বিজন, সুজন ও রমলাদেবী চরিত্র হিসেবে improbable বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন খগেনবাবু আরও বড় বৃত্তে তিনটি উপন্যাস জুড়ে 'শুধু impossible আর futile' নন 'improbable'ও বটে। স্ত্রী সাবিত্রীকে ত্যাগ করার কারণ অজ্ঞাত নয়, কিন্তু রমলাদেবীকে গ্রহণ করার পেছনে যুক্তি ও বুদ্ধি অচল। আবার যদি রমলাদেবীকে গ্রহণ যুক্তি ও বুদ্ধি মোতাবেক হয় তাহলে তাঁকে অবশেষে ত্যাগ করার পেছনে অহেতুক বিশ্বাস আমাদের সম্বল। এরকম যুক্তি খাড়া করতে হয় খগেনবাবু কিছুতেই ভুল করতে পারেন না। আর একটি ব্যাপারও স্মরণ রাখতে হবে, 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে' উত্তরণের ধূর্জটিপ্রসাদীয় তত্ত্বের সামনে improbable প্রভৃতি কোন যুক্তি খাড়া করা ঠিক হবে না।

আসলে যেকোন লেখার পেছনে ধূর্জটিপ্রসাদ একটি তত্ত্ব প্রচার করতে চান—'ব্যক্তি থেকে পুরুষে' উত্তরণ। এটি প্রবন্ধের বেলায় যদি তেমন বিপত্তি না ঘটায় উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি প্রচারের ঝোঁক মারাত্মক ক্ষতি করেছে। প্রচার করা গর্হিত—এরকম কোন তত্ত্ব খাড়া করার বিরুদ্ধে আমরা। তবু উপন্যাসের প্রয়োজনের বাইরে সেটি চলে গেলে উপন্যাসের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে*। বস্তুতঃ ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যবিত্ত অবস্থান তাঁর তাত্ত্বিক ভিতকে দুর্বল করেছে। তাঁর 'ঝিলমিলি' নামক ডায়েরীতে তাঁর মার্কসবাদ-প্রীতি আর মার্কসবাদ-বিরোধিতার প্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর অনুপুঙ্খ আলোচনায় না গিয়ে একটা দুটো নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে। ধূর্জটিপ্রসাদ ওঁর জীবনে মার্কসিজমের প্রভাব স্বীকার করে বলেন, "নিজেকে Marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল" ('ঝিলিমিলি', ২২-৫-৫৮, পৃঃ ২১)। আবার ১৫।৫।১৯৫৯-এ তিনি ঘোষণা করেন: "আমি পোলিটিক্যাল জীব নই,

---

* একথা উনি নিজেই জানতেন: "উপস্থিতির মধ্যে অর্থ লোকই যায়, অর্থ থাকতে বাধা। অবশ্য লুকিয়ে রাখাই ভাল, নচেৎ ধর্মের আকার ধারণ করবে" ('ঝিলিমিলি', ১।২।৫৮, পৃঃ ৯)।

কেবল ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই। সব পার্টির সঙ্গেই আমার যোগ আছে" ('ঝিলিমিলি', পৃঃ ৫৩)। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল যদিও মার্কসবাদকে বাতিল করে দিয়েছিলেন ('ঝিলিমিলি', পৃঃ ১০১) তবু 'জওহরলালের গুণে আমি বরাবরই মুগ্ধ' (ঐ, পৃঃ ১৬)। আবার উনি অবাক হয়ে যান ভাবতে যে 'জওহরলালের আশীর্বাদে কংগ্রেস ধনকুবেরদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিলে।' (ঐ, ১৫) কিন্তু আবার অগাধ আস্থা জওহরলালের ওপর, কেরালার প্রথম বামমন্ত্রীসভা কেন্দ্র বরখাস্ত করলেও— 'জওহরলাল কেরালায় যাবেন —একটা নিষ্পত্তি হবেই হবে' (ঐ, ৫৪)। প্রাসঙ্গিকভাবে আরও কিছু উক্তি সংগ্রহ করা যাক 'এখনও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম কথায় কথায় ওঠে' (ঐ, ৫৫)। 'মৌলানার মৃত্যু হোল। সর্বাকারের অভিজ্ঞ। বিদগ্ধ পুরুষ। হাতের সিগারেট তোলা পর্যন্ত নিজস্ব, স্বতন্ত্র' (ঐ, ১২), 'বিদ্যাসাগর ভগবদবিশ্বাসী ছিলেন না। অসম্ভব কাজের লোক এই পুরুষটি, অর্থাৎ এগ্নোস্টিসিস্ট' (ঐ, ১২-১৩), 'পুরুষ কেবল পরম, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়ী, স্ত্রী সাপেক্ষিক' (ঐ, ২৫), এবং 'স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সোপেনহরের মতামত কিন্তু গ্রহণ করি। বিশেষ কিছু কটু মন্তব্য বলে ত মনে হয় না। শিশু-সন্তান লালন পালন করা অর্থাৎ জাতির (species) ক্রিয়া ত তাঁদেরই কর্তব্য এবং মোটামুটি বলতে হয় যে এঁদের বয়স হলেও কথাবার্তায় একটু ছেলেমানুষী' (ঐ, ৩২), 'খ সচত-এর বক্তৃতা ভালোই। আদর্শবাদীর কথা নয়, খাঁটি বস্তুতন্ত্রের কথা' (পৃঃ ৮০), 'ছাত্র অধ্যাপক বোঝা মানে না... পরীক্ষার সময় লুকিয়ে এসে অন্যত্র চা খায়। ভাঙাটাই স্বাভাবিক। নিয়ম ভাঙলেই আজকাল কম্যুনিস্ট' (ঐ ১৩), —এসব কথা যেকোন সাদামাঠা মার্কসবাদবিরোধীর মুখে বসিয়ে দিলে কেউ বুঝতেই পারবেন না যে এগুলি ধূর্জটিপ্রসাদের। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন লড়াই চলছে ভারত ভাগ হোল যখন, সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে যখন তেভাগা ও তেলেঙ্গানার লড়াই শুরু হোল, যখন কংগ্রেসী শাসনে গোটা ভারত টালমাটাল, সংশোধনবাদ যখন মার্কসবাদকে খুন করছে উচ্ছ্বাসময় জওহরলাল-প্রশস্তি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকশ্রীত যত উন্নত কালচারের পরিচয় বহন করুক না কেন একজন সৎ বুদ্ধিজীবীর (Marxist না হলেও) কাছে আশা করা যায় না। সমগ্রতার সন্ধানী যিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে উত্তরণের পুরো জটিলতার সন্ধান আমরা চেয়েছিলাম, তার বদলে শুধু 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে' উত্তরণের খোঁজ পেয়ে আমরা আশাহত। যিনি নিজেই এধরণের গালঘুঁজিতে ঘুরছেন তার পক্ষে খগেনবাবুর মতো তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের

মানসিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা কতটা সম্ভব ? ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কথায় আবার ফিরে আসা যাক—'মালমসলা সবই আছে, তবে ইমারত গড়েছেন কিনা সন্দেহ'।

দোলাচল চিন্তা, চিন্তা ও কাজের মধ্যে দুস্তর বাধা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের একপেশে সম্পর্ক প্রভৃতির জট খুলতে গিয়ে চিরাচরিত আঙ্গিকের যে কোন একটিকে আঁকড়ে ধরা ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "অন্তঃশীলা' দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা, এবং প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করে বীজ'। (উদ্ধৃত আশীষ মজুমদার— 'পরিচয়'-এর উপন্যাস', 'পরিচয়', নভেম্বর ১৯৮১, পৃঃ ৫৫)। দাড়িমের শক্ত খোলা ভাঙার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদ 'মোহানা'র ভূমিকায় পাঠককে আগেভাগে সচেতন করে দেন: "বইখানি ভেবে-চিন্তে লেখা।…পদ্ধতি, বিষয় সৃষ্টির রীতিনীতি ও বিষয়ানুযায়ী তার পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা চাওয়া কি অন্যায়?" লেখকের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমালোচকরা বলে বসলেন 'এ নিশ্চয়ই নূতন রচনাপদ্ধতি'। ছাপ মেরে দেওয়া হোল এটি Stream of consciousness-এর পদ্ধতিতে প্রথম বাঙলা উপন্যাস। চেতনাপ্রবাহ কখনও খগেনবাবুর ক্ষেত্রে দেখা গেলেও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী-কথিত Virginia Woolfe-এর "Mrs Dalloway"-র কথা স্মরণে আসে না। একটানা চেতনা প্রবাহে Mrs Dalloway-র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু নয় অন্যান্য চরিত্রের পাশাপাশি চেতনা প্রবাহও গোটা একটি প্যাটার্নের জন্ম দেয়। অন্যদিকে এখানে চেতনাপ্রবাহ সংলাপে মোড় নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, কথার পিঠে কথা সাজানোর বীরবলী ছাঁদ এসে পড়েছে। উপন্যাসের সাবেকী সর্বজ্ঞতার ভূমিকায় লেখক কখনও হাজির; আবার কোথাও Epistolary পদ্ধতি চরিত্রদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। সবশেষে, ডায়েরী পদ্ধতিতে না-বলা-কথাকে বলার সুযোগও তৈরী হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা মনে রাখতে পারি। "তিরিশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদার প্রবাহধর্মী চেতনার ব্যাপার প্রথম উপলব্ধি করেন…কিন্তু এই মনে-পড়াকে অবলম্বন করে যদি আমরা ধূর্জটিপ্রসাদকে জয়েসীয় পদ্ধতির নিরীক্ষক বলি তাহলে ভুল হবে… বলাই বাহুল্য সে কাহিনীর সাদৃশ্য আমরা শরৎচন্দ্রে খুঁজে পাব না—পাব রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, নষ্টনীড় জাতীয় সৃষ্টিতে" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর পৃঃ ৩৬৫) আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নায়ক নিঃসঙ্গ খগেনবাবুর মতোই লেখক কাজের বদলে স্মৃতিতে মধ্যবিত্ত-সুলভ স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন। সংকটের তীব্রতায় মধ্যবিত্তের খোলস এটি

—'অজ্ঞান-চৈতন্যের প্রবাহে' (গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যে মানব স্বীকৃতি, পৃঃ ১০৫) ডুব দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা চলে। সব কটি উপন্যাসের অবশ্য আবার গতানুগতিক ঘটনা চিত্রণে লেখক ফিরে এসেছেন। সন্দীকের গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবং রমলার প্রস্থানে ইনটেলেকচুয়াল তাদের প্রাসাদ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষা অনেকটা কমে এসেছে। সব মিলিয়ে তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল খগেনবাবুর নিঃসঙ্গতা ও পরিণতির পথ খোঁজা নিয়ে তিনটি উপন্যাসের অবতারণা। প্রাবন্ধিকের কৌশল সবরকম পদ্ধতির ওপর চেপে বসেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই জিনিসের ওপর আলো ফেলে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা। নিঃসঙ্গ নায়ক যখন 'পুরুষে' পরিণতি পাচ্ছে আর সাম্যবাদী আন্দোলন তার সংহত রূপ নিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করেছে, অনেক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর, এবং মধ্যবিত্ত সমাজের সমালোচনায় লেখক যখন সাবলীল, তখন আঙ্গিকের এত পরীক্ষানিরীক্ষা কেন? শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েও মগজের আভিজাত্য আর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিঃসঙ্গ 'ব্যক্তি'র স্বাধীন গোপনীয়তায় ডুব মারার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। নিখুঁত প্রবন্ধ হিসেবে 'আমরা ও তাঁহারা'য় যে আঙ্গিক ব্যবহৃত হয় সেই একই আঙ্গিক চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে উপন্যাসের সুলক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের তুলনাই সার্থক। এটি দাড়িমের মতো। অনেককটি প্রবন্ধও অজস্র ভাবচেতনাপ্রবাহের সূত্রে গাঁথা হয়ে উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাঙলা উপন্যাসের এ-বিপদ সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন, "অনুকরণে আপত্তি নেই, কোন সৃষ্টি আত্মজ নয়, কিন্তু এ যেন মস্তিষ্কের একটা ছোট অংশের তাগিদ! একটা মূলগত খণ্ডতা ও অ-বাস্তবতার হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ পাচ্ছে না" ('মোহানা', পৃঃ ৪৫)। 'অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়' ('অন্তঃশীলা', পৃঃ ৯৭) —এ ধরণের উদ্দেশ্যও অ-বাস্তবতার হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। 'কল্লোল যুগের' ঔপন্যাসিকদের " 'স্বাভাবিক' মানুষের চরিত্রাঙ্কন···প্রকৃতির 'প্রকৃত' বর্ণনা" ('মোহানা', পৃঃ ১০৬) আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জনপ্রিয় ভাবের বন্যায় মশগুল অ-স্বাভাবিকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদ pure নভেলের সূচনা করেন। লেখকের বিদেশী আদর্শ প্রুস্ত, জয়েস, উলফ, হেনরি জেমস তাঁদের স্বক্ষেত্রে কতটা সফল হতে পেরেছেন সে কথায় না গিয়ে লেখকের দেশজ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের কলেবরে বিচিত্র অন্তর্জীবনকে যে সম্পূর্ণতায় তুলে

ধরেছিল ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে সে সাফল্য অনুপস্থিত।

বাংলা উপন্যাসে যখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবাস্তবতা প্রকট হয়ে উঠছিল, তখন তাত্ত্বিক দিক থেকে অন্তত সমগ্রতার সন্ধানে উপন্যাসকে কাজে লাগানোয় যে উদ্দেশ্য ধূর্জটিপ্রসাদ প্রচার করেন তা উপন্যাসে তুলনামূলকভাবে নোতুন স্বাদ এনেছে। সেটা যতটা না উপন্যাসের স্বাদ তার চেয়েও বেশী সচেতনতার স্পষ্ট প্রচারণায়। চেতনাপ্রবাহের আঙ্গিকে এরপর গোপাল হালদার ও সতীনাথ ভাদুড়ী নিশ্চিন্তমনে সাহিত্য সৃষ্টি চালাতে পেরেছেন। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে অবশেষে বলা প্রয়োজন যে আদর্শ প্রচারের সময় উপন্যাসে প্রবন্ধের যে রীতি ধূর্জটিপ্রসাদ আনলেন তার প্রভাব সত্তর দশকের 'প্রগতি' সাহিত্যিকরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

ধূর্জটিপ্রসাদ : মননের নকশা

বীতশোক ভট্টাচার্য

আমাদের জাতীয় সমস্যার যোগে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার রূপ গড়ে উঠেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ কিছু খোলা হাওয়ার মানুষ পেয়েছিলেন : তাঁরা উনিশ শতকের ; তাঁরা উনিশ শতকি ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে এসেছেন , তাঁরা মননে উদার এবং আরো বেশি উদার হৃদয়ের মানুষ। আমাদের লোকজনের যা কিছু গুণ, ভাব ও উদ্দেশ্য তা তাঁদের মধ্যে প্রখর মূর্তি পেয়েছে : তাঁরা একরকম প্রতীকী মহত্ত্ব পেয়েছেন। এঁদের অন্তত একজনকে প্রসঙ্গ করে ধূর্জটিপ্রসাদ একটি বই লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের নামের লোকায়ত বৃত্তটি রবীন্দ্ররচনার বৃহৎ পরিধিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের নাম তেমন করে ছাপিয়ে যায় নি, তাঁর নিজের মধ্যে ছায়ার বাধা ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষ দেশবন্ধু যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আশুতোষ, তেমনি কোনো একটি বিশিষ্ট আসনে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা নেই। তিনি অপ্রতিষ্ঠান গুরু। এমনকি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতন দেশের আত্মার এক উৎকেন্দ্রিক অবতার-রূপেও তাঁর স্বীকৃতি মেলেনি। তিনি এমন এক শান্ত কেন্দ্র খুঁজেছিলেন যার পরিধি সর্বত্র। তিনি বদ্ধমুষ্টিতে কিছু রাখেন নি, তিনি খোলা মুঠির মানুষ। ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার প্রকরণ এই খোলা মুঠোর মতো।

ডি পি সাহেবকে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের মার্কা মেরে নিশ্চিন্ত না হতে পেরে তাঁর সময়কার অধ্যাপকরা অশান্তি ভোগ করতেন। তাঁর রচনাকর্মের মুখে পড়ে আমাদেরও ওই একই অস্বস্তি পেয়ে বসে। বস্তুত কীভাবে যে শনাক্ত করা যায় তাঁর রচনাকে চিন্তাবিদের বুকনি, সাংবাদিকের পশরা, অধ্যাপকের খেড়ানো, স্বনির্বাচিত নবী-র নজির। কোনো প্রথাগত শীলমোহর সেঁটে দেওয়া যায় না এসব রচনার উপর, তাঁর সৃষ্টিকর্মেও সৃজনীকলার সেই সম্পূর্ণ প্রকাশ নেই যাতে শিল্পীর শিরোপা মেলে। তাঁর এমন কোনো গন্থ নেই যা নিজের ভাবনার পায় নিজে দাঁড়ায়, স্বয়ংভর। চিন্তার চেয়ে বেশি, আনন্দের ফসল ? এ সেই আনন্দ যে আনন্দে মাতোয়ারা বেশ্যাদের ধূর্জটিপ্রসাদ গাইতে শোনেন : শসা কলা নয় যে জাদু চিরে চিরে দেবো। সমগ্রকে মিলিয়ে চিন্তার একপরায়ণতা

ধূর্জটিপ্রসাদের অন্বিষ্ট ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতিভা পতিতা কিন্তু গৃহিণী ছিল না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা থেকে দূরে ছিলেন, তিনি বাংলায় ফিরে আসতেন। আড্ডায় মজলিশি বন্ধু ছিল তাঁর, ছিলেন গুণমুগ্ধ অনুরাগীজন, আলোচনার কেন্দ্রমণি হয়ে বসবার প্রবল প্রবণতাও তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে। নিজে যেমন কখনো গুরুদেব ধরেননি, একেবারে কবলিত হন নি কোনো মতামতের দ্বারা, তেমনি তাঁর কাছেও কেউ নাড়া বাঁধলো না, নাকি নিজেই তিনি ঘরানার বিরুদ্ধে? এইসব উল্টোপাল্টা টানই তাঁর শেষরক্ষা করেছে, আর এই জন্যই তাঁর লেখার খপ্পরে একবার পড়লে আর উপায় নেই তাঁকে আলোচনা না করে। দেশ নিয়ে যারা ভাবে, দেশের মানুষ নিয়ে যারা ভাবে, ভুলে যাওয়া ধূর্জটিপ্রসাদকে, ভুলবোঝা ধূর্জটিপ্রসাদকে তুলে আনা তাদের এক ক্রমিক দরকার। তাঁর মধ্যে কিছু আছে তামাদি, কিছু থেমে থাকা, এবং আর কিছু আছে যা ব্যক্তি আর বিশ্বের উলঙ্গ সংঘাতে নিঃসৃত অন্ধ বিকিরণ। ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় অনন্ত দ্বন্দ্বের কোণে উঠে যাওয়ার এই পদ্ধতিটি ক্রিয়াশীল।

ধূর্জটিপ্রসাদের দোষ তাঁর রচনার গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। হাতে গোনা যায়, একটি কি দুটি সমস্যা, মূল সমস্যা, তারাই তাঁর রচনার ধুয়ো, আর বাকি সবটুকুই তার কীর্তন, বিন্যাস, পুনর্বিন্যাস, আখর যোজনা, ভাষ্যরচনা, এবং পালাবদল এবং পালাবদল। কীর্তনের উপমা আমাদের গণমাধ্যমকে বোঝাবার জন্য, ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা বোঝার জন্য ততটা দরকারি নয়। ভাবতে ভাবতে লিখতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চিত বুঝেছিলেন: আমার সমস্যা আমারই সমস্যা। তোমারও সমস্যা। তোমাদের সমস্যাও। সব মিলিয়ে সমস্যা আমাদেরি, হাতে রইলো কলম আর সব মানুষের সমস্যা। একবার এই সিদ্ধান্তে এসে পড়তে পারলে নিজেকে নিয়ে তত্ত্ব বানানো যায়। তত্ত্ব ছানলে ব্যক্তিত্ব রূপ পায়। চিহ্নিত করার এই শিল্পায়াস তাঁর রচনার স্বভাবে।

মানুষ ও তার মূল সমস্যা পালটায় না, ধূর্জটিপ্রসাদের রচনারীতিতেও কোনো ওলোটপালোট ঘটেনি। কখনোই পালটান না তিনি, ধূর্জটিপ্রসাদ। তিনি সংলগ্ন তার সরকারি দাবিদার নন। পৃথিবী কী থেমে যাচ্ছে নাকি, যে আমাকে শমে এসে পৌছতে হবে? উত্তর নয়, এই প্রশ্নে পরিপ্রশ্নে ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠকরা হাঁসফাঁস, ঘায়েল অথচ টানটান। একই ভিত্তিলগ্ন ভাবনার বিবর্তনে ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তার মুক্তি। তাঁর রচনার একই উচ্চারণ, একটিই কণ্ঠস্বর। তা কখনো মনোকথনে

সংবৃত, কখনো অন্তর্লীন বিরালাপে খণ্ডিত।

আলাপ আলোচনার কিছু মৌলিক অসুবিধে আছে। কমলাকান্ত যখন নিজে দপ্তর খুলে বসে তখন তার গলা মেজাজি এবং মসৃণ ; প্রসন্ন বা বেড়ালের সঙ্গে কথা চালাতে গেলেই তার সাবলীলতা ঠেক খায়। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তাই একোক্তির একাধিপত্য। উপন্যাসেও মগ্নচেতনারীতির প্রাধান্য। ধূর্জটিপ্রসাদ জানতেন চেতনাপ্রবাহে পাক খেয়ে অন্তঃশীলা অঘোরে তলিয়ে যেতে পারে, বিতর্ক এনে বিপাক থেকে তিনি চরিত্রগুলিকে উদ্ধার করলেন। এসব চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের কথাসাহিত্যের বকমবাজ লক্কা নয়, এদের ঘরের আকাশে প্রতিক্ষণে চেতনা বিদ্যুৎ হানতে থাকে, এদের পূর্বসূরী রয়েছে প্রমথ চৌধুরীর রচনায়। রবীন্দ্রনাথ বাজে কথাই কাজের কথা এটা খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু ছিন্নপত্র কেটেছেঁটে সুচারুভাবে ছাপানোর দরকার বোধ করেছিলেন তিনিই। আলখাল্লায় জরুরি জোড়াতালি দিলে বৈরাগির চলে, শিল্পীর চলে না। পাস্কালের মৃত্যুর পর তাঁর জামার সঙ্গে শেলাই করা যে ভাবনাগুচ্ছ পাওয়া গিয়েছিল তাতেও বৈজ্ঞানিকের অভিনিবেশ, শিল্পীর পরিশীলনের স্বাক্ষর আছে। সমস্যাটা এখানে।

মনে এলো-র ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুকে তাঁর মন ধার দিয়েছেন। অন্তঃশীলা লিখুন আর মনে এলো লিখুন, দুটি ক্ষেত্রে সমস্যাটি একইরকম ভাবে আছে। যা মনে এলো সবই ধূর্জটিপ্রসাদ লেখেন নি, লিখতে চান নি, লিখতে পারতেন না। তাঁর চোলাই করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সেই নির্যাসটুকুই তিনি ধরে দিয়েছেন যা তাঁর মনে লেগেছে, তাঁর পাঠকেরও মনে লাগবে, লাগা উচিত ব'লে তিনি বোধ করেন। অর্থাৎ আত্মজীবননির্ভর লেখাতেও তিনি অনর্গল হতে পারেন না, সেখানেও সম্ভব নয় মসৃণ অবিরল নিঃসরণ, সেখানেও বাধা আসে নিজের ভিতর থেকে, আত্মগত উপাদানের থেকে বিক্ষিপ্তভাবে মাত্র কিছু নমুনা বাছাই করা চলে, কিন্তু বেশিটাই প্রত্যাহার, তার একটু আধটুই নির্বাচন। আর তিনি তো ব্রাহ্ম নন, কৃশ্চান নন, যে তাঁকে স্বীকারোক্তির ভূতে পাবে। ফলে তাঁর শিল্প-সচেতন মন মনে এলো লিখতে গিয়েও ঝাড়াই বাছাই চালিয়ে গেছে নির্মমভাবে। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখতে বসেছিলেন তাঁর নিজের কথা অথচ তা হয়ে দাঁড়ালো শিল্পিত আঙ্গিকবদ্ধতা, এক ধরনের রূপে নিজেকে আরোপ। হালিশহরে একবার প্রফুল্ল দেখেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, যে মেয়েটি প্রফুল্ল সেজেছিল সে এত স্বাভাবিকভাবে কেঁদেছিল যে সব দর্শক না হেসে পারেনি। জীবন যে অপরিহার্য কৃত্রিমতা দাবি করে ধূর্জটিপ্রসাদ এইসব আকীর্ণ লেখায় তা সুদে আসলে উশুল ক'রে দিয়ে

যেতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর জিৎ।

উল্টোদিকে নাটকের ইতিহাসে একজন অভিনেতার নাম আছে যিনি মৃত্যুর দৃশ্যে অত্যন্ত জীবন্ত অভিনয় করেছিলেন আর নাটক শেষ হলে বোঝা গিয়েছিল তিনি মারা গিয়েছেন। উপন্যাসের আকাঁড়া উপাদান যেহেতু লেখকের বাস্তব জীবন ও কল্পনা, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, তাই নিরাবেগ কথকও নিজের জীবনভাবনা থেকে কথাসাহিত্যের আকর আহরণ না করে পারেন না। ধূর্জটি-প্রসাদ ঔপন্যাসিকের এই দায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের উৎস থেকে অন্তঃশীলার উৎসাহ পেয়েছেন, জর্মান সাহিত্যে এ জাতের লেখা একটি আলাদা জাঁর রূপে গণ্য হয়, ধূর্জটিপ্রসাদ এখানে উপন্যাসের শিল্প রচনা করতে গিয়ে উজিয়ে নিজের মধ্যে চলে গিয়েছেন। শ্রীকান্তর শরৎচন্দ্র আর পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণের মতো মগ্ন ডুব তিনি দিলেন না, ধূর্জটিপ্রসাদ শুধু অসহায়ভাবে অনুভব করলেন, গল্পও জীবনের দিকে চলে যায়। জীবনের কথা লিখতে গেলে তা গল্পের আঙ্গিক পায়, আর গল্পের আঙ্গিকে লিখতে গেলে তা জীবনের মতো বেসামাল ও অগোছালো হয়ে পড়ে—মননজীবী মানুষের তৃপ্তি আছে কূটাভাসের এই সম্পূর্ণতায়।

সংলাপকে সংবাদ বলা চলে এবং এভাবে দেখলে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রধান ঝোঁক সংবাদ সাহিত্যরচনার দিকে। স্বল্পশিক্ষিত সাধারণের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কিছু কম, নানা উল্লেখে পরিকীর্ণ তার রচনা সকলে বুঝতে না পারলে তিনি নাচার। নিজের রচনায় জল মিশিয়ে শিশু ও রোগীর পরিপাকের উপযুক্ত গণ-সাহিত্য বানানোয় তাঁর পুরোপুরি অনীহা। খগেনবাবু যেমন ধূর্জটিপ্রসাদও তেমনি সমতলের থেকে উঁচুতে, একটি সমোজ্জ্বল ভূমিতে উঠে দাঁড়াতে চান: এ স্থান তাঁর নির্জন নিভৃত ধ্যানের উপযোগী, এ অজ্ঞাতবাস সব আলোচনার পূর্বশর্ত। সমস্তের ঘোলা স্রোতে সাহসভরে নেমে আসতে পারে সে গঙ্গা যে ছিল তুঙ্গ জটাজালে বদ্ধ। খগেনবাবু, আমরা ও তাঁহারা-র মাস্টরটি স্বেচ্ছানির্বাসন পছন্দ করে, টমাস মানের চরিত্ররূপে তারা বেশ চলে যায়, প্রাতিস্বিক একটা দৃষ্টিকোণ তৈরি করতে হবে ব'লেই তাদের একটু একা থাকা দরকার, খানিকটা দূরে থেকে ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া সম্ভব, নিরাসক্তি তখন মানবিক উত্তাপ ছড়ায়। রবীন্দ্রনাথ কথা বলার সময় যেমন চোখে চোখ রাখতেন না, ধূর্জটিপ্রসাদ সেভাবে আয়ত্ত করেছেন তন্ময় দর্শনের এক ভঙ্গিমা। আমরা ও তাঁহারা-র আলোচনায় এক সকল অংশিদার হয়ে উঠতে হবে, তাই এই আড়ালটুকু দরকার।

ধূর্জটিপ্রসাদ জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা বলতে পারেন না। অন্যের চিন্তায় শান দিয়ে নিজের ভাবনাকে তিনি প্রতিমুহূর্তে পরখ করে নেবার পক্ষপাতী। দার্শনিকরা প্রধানত একোক্তিপ্রবণ, হয়তো তাই তাঁরা এমন গভীর একরকম উন্মোচিত, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ সেক্ষেত্রে নিজেকে ধনবিজ্ঞানী বলা পছন্দ করবেন। মারকিন অর্থনীতিবিদের মতো অর্থশাস্ত্রের সূত্রের সঙ্গে রসিকতার মিশোল দেওয়া গদ্য তাঁর অবশ্যই আরো পছন্দ হবে। দর্শনের এলাকায় বিপরীত দৃষ্টান্তের অভাব নেই একথা সত্য। প্লেটো দ্বিরালাপে সম্মতি জানিয়েছিলেন, পাস্কাল আর সিমোন ওয়েল তাঁদের প্রকীর্ণ লেখমালায় দ্বিধাবিতর্কসূত্রের রূপ আত্মগত অক্ষরে খোদাই করে গেলেন। এই দোটানার মধ্যে থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় একটি নতুন টানাপোড়েনের বুনন তৈরি হলো এ জমির নকশা কখনো সংলাপবদ্ধ কখনো তা নিজের সঙ্গে কথকতা। ধূর্জটিপ্রসাদের চরিত্রের দ্বিচারণা তাঁর লেখার এ ভঙ্গিতে স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়ে থাকলো।

অন্য মানুষ, অন্যান্য সামাজিক মানুষ বা তাঁহারা'র সঙ্গে যে মিলতে চাইবে না, নিজেকে মেলাতে ভয় পাওয়া সেই কুনো ভাবুক বিসঙ্গত মানুষের গদ্য মনো কথনের মধ্যে অভিব্যক্তি চায়। নাটকীয়ভাবে দুর্বল প্রয়োগ হলেও স্বগতভাষণ সব সময় সুবিধাজনক। ধূর্জটিপ্রসাদের কথা আলাদা। তিনি উত্তেজনার আঁচ পোহাতে ভালোবাসেন, বুদ্ধির গোড়ায় উদ্দীপক ধোঁয়া দেওয়া পছন্দ করেন, চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠলে তাঁর গুঙ্কার উথলে ওঠে না। তিনি রসেবশে থাকা সহৃদয় সকৌতুক মানুষ, বাঙালির লোকপ্রজ্ঞার আদর্শ উদাহরণের কথ বললে রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেন, তিনি কেন চাইবেন তর্কের দায় এড়াতে, সমালোচনা গা পেতে নেওয়াটা তাঁর লেখার ধরন। তাঁর লেখা কখনোসখনো আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো, কিন্তু সবার চাইতে পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড় ভালো জাতীয় সমাধানে এসে শেষ হয় বটে কিন্তু সেটি সমাধানের একটি শিল্পিত প্রচ্ছদ মাত্র, আসলে বিতর্ক থাকে স্থায়ী ও স্থগিত হয়ে থেকে যায়। সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার ক্ষমতা যদি শিল্পীর একমাত্র শর্ত হয় তবে ধূর্জটিপ্রসাদ তা আগাগোড়া রক্ষা করে এসেছেন

লেখার আত্মগত ভঙ্গি ধূর্জটিপ্রসাদের কিছু ব্যক্তিগত বাতিক চাগিয়ে তুলেছে। প্রবীণদের খামখেয়ালে তিনি দেদার প্রশয় দেন. ছেলে বড়ো হয়ে গেলে বাপকে যেমন স্নিগ্ধ প্রশাসনে আনে ধূর্জটিপ্রসাদের সেই ভঙ্গি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি অফুরান, তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞানদর্শন গুলিয়ে ফেলার

গল্প তিনি বলবেনই বলবেন। পড়তে পড়তে সন্দেহ হয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এইসব ছেলেমানুষি তিনি কি শুধু আড়াল করতে চাইছেন, না সেই সঙ্গে আড়াল করতে চাইছেন নিজেকেও। ভালেরি একবার স্বচ্ছ কাচের দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষ কীভাবে লুকোতে পারে। জিদ কাছে ছিলেন, উত্তর দেন নি। বস্তুত মানুষ কিছুতেই লুকোতে পারে না, বুদ্ধিজীবীরা তো আরো বেশি। হৃদয় আর মননের সেতু বাঁধতে চাইছেন যিনি, সংলগ্ন শাস্ত্রের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যিনি, সেই ধূর্জটিপ্রসাদকে কেউ বাঁকা চোখে দেখতে চাইলে, চোখা মন্তব্যে বিঁধতে চাইলে সেটা স্বাভাবিক, কিছু করার নেই। সেক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদের এই মুখর মুদ্রা কি একটি মুখোশ, উনিশ শতকের বিলুপ্ত প্রজাতির প্রতি এ আকর্ষণ কি শুধু ঐতিহাসিক উৎসাহ বশত? কিশোর স্মৃতির বিষ কেবলি মর্মে চোঁয়ায় ব'লে কি? সন্দেহ থেকে যায়।

দুম দাম কাটা কাটা কথা বলে ফেলবার প্রবণতায় ধূর্জটিপ্রসাদের অনেক উচ্চারণ যেমন সংরক্ত গভীরে বসে যায়, তেমনি তাঁর অনেক কথা চঞ্চল শফরীর মতো অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যার এলাকায় বিচরণ করে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর রচনার প্রতিক্রিয়া হয় বিমিশ্র ধরনের: কখনো বিস্ফোরকের মতো তাঁর কথা আমরা সন্ত্রাসে বহন করে নিয়ে যাই, কখনো তাঁর কথা আমরা সযত্নে নিহিত গহনে নিয়ে লালন করি।

সংলাপে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর অন্য মুখ দেখান। তাঁর একার কথাও প্রায়সময় টেবিলের উল্টো দিকের সহৃদয় আর পুরোনো পুরুষবন্ধুর উদ্দেশে বলা। এ ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন মানুষ যূথবদ্ধ পশু, পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষার সমর্থ ও প্রামাণ্য অধিকার তাদের সংবিধানে স্বীকৃত। কিন্তু যতই হালকা চালে আলোচনা শুরু হোক, ধূর্জটিপ্রসাদ পূর্বভাবিত হয়ে এগিয়ে যান: বিস্মিত বাঁকের শেষে সত্য আছে। তদগত চোখে একদিন সে সত্যকে দেখা যায়। তুমি, আমি, আমরা সকলে একদিন সে সূর্যোদয় দেখতে পাবো। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বিচার করতে ব'সেও যুক্তির এই পাথুরে-স্থাপত্য তাঁর মন কাড়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদের মনের বিশেষ গড়নের জন্য এই জাতের লেখা তাঁর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। এই প্রকরণটিকে তিনি যখন স্বীকার করে নিয়েছেন সেই সঙ্গে একথাও মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে গেছে যে, শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, ভাবগত আদানপ্রদানেও সামাজিক মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এ যোগাযোগ সফল, এ যোগাযোগ ধারাবাহিক। সাংলাপিক স্বভাবের স্বীকৃতির অর্থ ইতিহাস-

চেতনায় বিশ্বাস দৃঢ় করে রাখা। মনে হয় ধূর্জটিপ্রসাদের প্রত্যয় যুক্তির এই স্তরন্যাসে রাজি হতো। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস কোনো দেশেই খুব একটা পুরোনো কিছু নয়। বিশেষ করে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এ ঘটনাটিকে একটি সমাপতন বলা উচিত হবে না যে বাংলায় ব্যক্তিত্ব-লাঞ্ছিত গদ্য আর সমাজবিজ্ঞানের উন্মেষ একই লগ্নে হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বাংলা গদ্যকে শিল্পরূপ দিল। ভূদেব বিদ্যাসাগরের সময় থেকে বাঙালির সমাজবিজ্ঞান শিল্পিত প্রকরণ পেতে শুরু করে; ধূর্জটিপ্রসাদের বিকশিত সমাজভাবনা এ সমস্ত লেখমালায় আধারিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ সবার প্রিয়, ধূর্জটিপ্রসাদের বন্ধু নেই। এখানে তিনি একক, অসঙ্গ, কূটাভাস তাঁর চরিত্রে কাজ করছে। সার্থক জন্ম তাঁর এমন দেশে জন্মেছেন যে সবকিছুই তাঁকে একা হাতে করতে হবে, সবসময় গোড়া থেকে শুরু না ক'রে তাঁর উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদরাও তাই করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশে জন্ম নিলে এই সময় তাঁর অবস্থা মোটামুটি এই রকমই হতো। বাঙালিয়ানা নিয়ে তাঁর একটু অভিমান আছে, সময়ে অসময়ে সেই চাপা তাপ-উত্তাপ তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এরকম উন্মথিত মুহূর্তে তিনি নিজের কথা খানিকটা ব'লে ফেলেন, ইতিহাসের আড়ে বয়ে গিয়ে নতুন বাঙালিসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন। নব্য সমাজদর্শনের এই প্রতিজ্ঞার ভিত্তি আছে তাঁর দ্বিরালাপী মননে। সে মনন জানে, প্রতিটি প্রজন্ম তার অব্যবহিত আগেকার প্রজন্মের এবং প্রজন্মগুলির ফলাফল কিছুদূর পর্যন্ত ভোগ করে; ঐতিহ্যের পুরুষালি লোমশ মুঠো এসে না মিললে নতুন কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়। দ্বিরালাপী মানুষ কায়মনোবাক্যে জানে যে সব মানবিক জ্ঞান ইতিহাসের সঙ্গে মূলত জড়িত।

আলোচনা একটা পর্যায়ে নিজের সঙ্গে চালানোও দুরূহ। ধূর্জটিপ্রসাদের এ অসুবিধে খুব হওয়ার কথা। তর্কে আমাদের মতো কর্কশ আর কেউ নেই: একথা এক বাঙালি কবি জাঁক করে বলেছিলেন। বিতর্কসভায় পণ্ডিতদের আত্মাভিমান যত প্রবলভাবে প্রকট হয় এমন আর কিছুতে নয়। অর্কফলা বাগিয়ে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে ব্রাহ্মণসন্তান রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন এই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় আমরা বিপরীত মূর্তি পাই। প্রতিস্পর্ধী মানুষটি আমি এসেছি ব'লে জানান দেয় বটে, কিন্তু সে মোটের উপর সহৃদয় এবং বুদ্ধিমান, সুবিনীত এবং সকৌতুক, ঠোঁটের ডগায় হাজির জবাব থাকলেও প্রতিপক্ষকে একেবারে ধরাশায়ী করে মজা মাটি করায় তার সায় নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের এধরনের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় সত্যের কোনো নির্ভর নেই, পায়ের তলায় নেই

নিরাপত্তার কোনো নিশ্চিত ডাঙা ; নীরদ সি চৌধুরীর মতো মুল ধ'রে নাড়া দিলেন না তিনি, কিন্তু রোহভূমি টলে উঠলো লহমার জন্য হলেও একবার, কেমন যেন একটা ঝাঁকি-দর্শন হয়ে গেলো, এবং এখনো অনেকটা পথ তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বাকি। এই পথ নিজের অপূর্ণতাকে স্বীকার করার সাহস এনে দেয়, এই পথ নিজেকে নিয়ে পরীক্ষার দুঃসাহস এনে দেয়।

যে পারে নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে, নিজের ভাবনার খণ্ডিত প্রকাশের প্রয়াস সম্পর্কে যে সচেতন, সেই পারে ধূর্জটিপ্রসাদের টেবিলের উল্টোদিকে এসে বসতে। ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনায় আমরা যে সহজে যোগ দিতে চাই না, তাঁর লিখনরীতির সচেতন অনুসরণ এমনকি অসচেতন অনুকরণও যে এত কম, তার একটি কারণ কী এই নয় যে আধুনিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ভাঙা আয়নায় তার মুখ দেখতে ভয় পায়, অপূর্ণতার খাদে ভরা স্রোতের ডাকাতি তার কাছে বিভীষিকা ? এ বড়ো অন্ধ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা, যখন ভাবনাগুলি পরস্পরের মুখ দেখে না, না জেনেই আগে থেকে যখন এ অন্যের মতামত প্রত্যাখ্যান করে, আর এই সেই সময় যখন ধূর্জটিপ্রসাদের আলাপে-সংলাপে, অন্তহীন অন্তর্লীন দ্বিরালাপে আমাদের অগ্রিম নিমন্ত্রণ।

আগের প্রজন্মের বিশ্রুত মনীষীদের মননের ঔদার্যের কথা আর তাঁদের আশ্চর্য বিনয়ের কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ করে বলেছেন। এই শীলাচার ধূর্জটিপ্রসাদের বিশিষ্ট গুণ, এই বিনয় তাঁর রচনাতে ভারসাম্যের বোধ এনে দেয়। যে যাই বলুক, অন্যের সে মতামত শোনার মতো সহিষ্ণুতা না থাকলে আলোচনা এগোয় না। এই গ্রহিষ্ণু মনোভঙ্গি ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার পূর্বশর্ত, পূর্বপক্ষকে সবল বানিয়ে উত্তর-পক্ষকে শাণিত করে তোলার সূত্রটি তিনি মেনে চলেন। এই ব্যবহারকে তিনি গণতান্ত্রিক ব'লে, ভদ্রলোকের ব্যবহার ব'লে মনে করেন। বিতর্ক যতই তুমুল হোক, তাঁর রচনার কখনো গলা চড়ে না, পেশী ফোলে না। পল নিজান যেমন মুঠো গুটিয়ে এনে হাতের নখের দিকে তাকিয়ে নতমুখে বাক্যবাণ ছুঁড়তেন তেমন বিপজ্জনক শীতলতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি সাগ্রহ, সাদর, সহিষ্ণু, সকৌতুক কিন্তু সুদূরও বটে। এ সহিষ্ণুতা মানসিক অসাড়তার অন্য নাম নয়, বাঙালির প্রবাদ-প্রতিম সত্ত্বগুণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ধূর্জটিপ্রসাদ বৈষ্ণব ছিলেন না। নাক উঁচু ভুরু উঁচু বুদ্ধিজীবীরা অনেক ধরনের আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী : বলতে দাও যে যা বলছে, যেতে দাও, কোনো মানে হয় না, কিছুতেই কিছু আসে যায় না জানবে। ধূর্জটিপ্রসাদের এই উন্নাসিক শূন্যবাদ ছিল না। সমাজবিজ্ঞানের

ছাত্র তাই নিজেকে আর অন্যদেরও তিনি নিরপেক্ষ উপাত্তরূপে ব্যবহার করতে চাইতেন। ভণ্ডামো আছে, মিথ্যাচার আছে, তাই ব'লে ধূর্জটিপ্রসাদের অসন্দিগ্ধ সহিষ্ণুতায় অবিশ্বাস করা চলে না। দীনতা জ্ঞানের অন্তিম গুণ, ধূর্জটিপ্রসাদ অপরের মতে শ্রদ্ধাশীল, নিজের সম্পর্কে সংযত।

আগুনে হাত দিলে পোড়ে। এই সরল আর ভয়াবহ সত্যটি জেনে ধূর্জটিপ্রসাদ আলোচনার আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে লাফিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর মন নিশ্চিত জেনেছে মতবিরোধ প্রতিবারই তলায় ওৎ পেতে থাকছে, যে কোনো মুহূর্ত হলে হতে পারে তাঁর সংশোধনের সময়, অপ্রত্যাশিত ক্ষণটিতে অসম্ভব এক সমঝোতায় হয়তো তাঁকে রাজি হবার ঝুঁকি নিতে হবে। ধূর্জটিপ্রসাদ ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এই প্রকরণ তাঁকে কোনো অসংশয় সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় নি, কাউকে কখনো দেয় না, ধূর্জটিপ্রসাদ পথের প্রান্তে পৌঁছে যেতে তেমন ব্যস্তও নন, তাঁর আত্মদীপ মন কোথাও কিছু সাহসী আলোর ঝলকানি দেখেই সহসা সন্তুষ্ট। আপনি বিপদজাল গড়ে তুলে আপনি তা কেটে দিয়ে নিজের কাছে বাহবা কুড়োনোর আত্মপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদে নেই, আবার সংগীতের তুলনা ফিরিয়ে এনে বলি, বাদী বিবাদী সংবাদী স্বরের বিসংগত মিলনের সুষমা আছে তাঁর রচনার শরীরে।

নিজের মূল্যায়ন এবং পুনর্মূল্যায়ন, দরকার হলে স্বরচিত সূত্রের আমূল সংশোধনের এই আঙ্গিক আধুনিক মানসিকতার পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তিকর। ধূর্জটিপ্রসাদের চারিত্রিক কূটাভাস তাঁকে রক্ষা করেছে। আজ শিকারির তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো লুকিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে শশব্যস্ত অন্তর্মুখ মানুষ, আজ পালিয়ে বাঁচার এই হাজার দুয়ারি খোলা, নিরাপত্তাকামী আধুনিক বুদ্ধিজীবী তাই আজ আর বিতণ্ডায় নামে না, নামতে পারে না। ধূর্জটিপ্রসাদ হাতে হাতে নিরাপত্তার দাম ফিরিয়ে দিতে নারাজ, হেটো সত্য, চোরা সত্য, ভাঙা সত্যের বিনিময়ে তিনি কিছু চান না। চূড়ান্ত নিরাপত্তা কেউ কাউকে কখনো দিতে পারে না, ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার আঙ্গিক তার প্রতিশ্রুতিটুকু পর্যন্ত দিতে আগাগোড়া গররাজি।

যাঁরা তাঁদের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকেন ধূর্জটিপ্রসাদের রচনার পুরোনো চেনা আঙ্গিকটি তাঁদের জন্য। আধুনিক মানসিকতার যে ভীতি ও উদ্বেগ তা সাম্প্রতিক রচনায় স্বাভাবিক ছায়া ফেলে, মনোকথনের প্রাধান্য দেখা দেয়। ধূর্জটিপ্রসাদ পার্সোনালিটির সমস্যা নিয়ে কম ভাবেন নি। তাঁর রচনার

আঙ্গিকটিকে আশ্রয় করার অর্থই হলো এক উটকো অস্থ মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া; মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরনের একটি ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতে কে চায়। যে মানুষ এত গোলমেলে, এমন আলাদা, এরকম অদ্ভুত তাকে কে বৈঠকখানায় নিয়ে আসতে পারেন। ধূর্জটিপ্রসাদ। কার্ল য্যাসপার্স লক্ষ করেছিলেন আধুনিক মানুষ সব ধরনের ব্যক্তিগত যোগসূত্র রক্ষায় যে অপারগ তার কারণটি ওই নিহিত ভীতির গভীরে আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ আধুনিক, কিন্তু সমাধুনিক মানুষের এই ভীতি ও উদ্বেগ জয় করেছিলেন, তাঁর প্রকরণের মধ্যে তার সাক্ষ্য থেকে গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ পড়া হতে পারে। না হতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদের আলাপী আঙ্গিকটি এই মুহূর্তের প্রয়োজন। আমাদের মনের মৌল কণাগুলি ভেঙে যাচ্ছে। ধূর্জটিপ্রসাদের আঙ্গিক এই ভাঙন রোধ করতে পারে, আমাদের মনের গড়নে সংসক্তি এনে দিতে পারে। নিজেকে যিনি খুলে ধরেন নিজেকে তিনি খুঁজে পান। যিনি শোনেন তাঁর কথা শোনা হয়। আলোচনায় যিনি অংশগ্রহণ করেন তিনি সামাজিক, তিনি মানবিক। সামাজিক ও মানবিক হয়ে উঠতে চান সব লেখক, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের শান্তি এবং সংযম এবং সাহস সকলের থাকে না।

প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ

অশোক মিত্র

নিছক বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের বাদ দিয়ে ইদানীং কেউ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা-টেখা নিয়ে মাথা ঘামান না। তবে সেটা বড়ো কথা নয়, কারণ আরো বড়ো সন্দেহ যে হয়তো প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলি নিয়েও আজকাল তেমন কিছু আর ঘাঁটাঘাঁটি হয় না। শুধুমাত্র কিছু 'বিশিষ্ট' পাঠকই তাঁর লেখা পড়েন। এটা হওয়াই বোধহয় নিয়ম, কেননা এখন সাধারণ-ভাবে বাংলা সাহিত্যের মান, ভয়ে ভয়ে হলেও বলতে হয়, ভয়ঙ্কর রকম নিম্নগামী। সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের ভিতর তফাৎটা সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয়েছে। এবং সেটা মুছে দিয়েছেন যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে গত কুড়ি বছরে একেবারে বাজারি ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছেন। নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁরা এরকম একটা ব্যবস্থার অবলম্বন নিয়েছেন। সুতরাং খুব বড়ো মাপের আক্ষেপ করে লাভ নেই। যতোদিন পর্যন্ত কিছু সৎ সাহিত্যসেবী সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কোনো বড়ো বিপ্লব সংসাধন করতে না পারবেন ততোদিন এই ধরনের বিস্মরণের পালা চলতে থাকবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা হলেও যাঁরা নিজেদের চেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের ধারা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাঁদের পক্ষে একটা মস্ত তাৎপর্যের ব্যাপার হবে যদি তাঁরা একটু সময় করে প্রমথ চৌধুরীতে ফিরে যেতে পারেন এবং প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যিনি অর্থাৎ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলির জন্যে একটু সময় আলাদা করে দিতে পারেন।

একটা বড়ো জিনিশ আমরা ধূর্জটিপ্রসাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম : বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সাহিত্যের যোগাযোগ ঘটাতে হবে। অবশ্য এই যে সচেতন হওয়া বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সেটা একটু একটু করে কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের পরে 'সবুজপত্র'-র যে পরিমণ্ডল তাতে প্রমথ চৌধুরী মশাই ইংরিজি সাহিত্যের বাইরে গিয়ে ফরাশি সাহিত্যে কী ঘটছে না ঘটছে, অন্যান্য ভাষার মধ্যবর্তিতায় একেবারে সমকালীন সাহিত্য কী তৈরি হচ্ছে— এ সব নিয়ে প্রচুর লেখা ছাপিয়েছেন। যেটা অন্তত বাঙালিদের পৃথিবীর সঙ্গে

পরিচিত হবার পক্ষে খুব বড়ো একটা সোপান হিশেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো তা 'সবুজপত্র'-র গ্রন্থ-পরিচয়। বিদেশি গ্রন্থ—এমনকী অ-ইংরিজি বিদেশি গ্রন্থ, তা উপন্যাসই হোক, দর্শনগ্রন্থই হোক বা জীবনীই হোক—'সবুজপত্রে' সমালোচিত হয়েছিলো এবং সমালোচকদের মধ্যে নিয়মিত যে নামটি দেখা যেতো সেটি ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সেই ঐতিহ্যই অব্যাহত রইলো যখন 'পরিচয়' পত্রিকা ১৯৩১ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করলো। বাংলা সাহিত্যের কিছু জানবার আছে পৃথিবীর সাহিত্যের থেকে এবং পৃথিবীর সাহিত্য মানে শুধু ইংরিজি ভাষায় লেখা সাহিত্য নয়, তারও বাইরে একটা বড়ো পৃথিবী পড়ে আছে সেটা ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা আমাদের শেখালেন। সে-শিক্ষার মূল্য অনেক। এক ধরনের কূপমণ্ডূকতার মধ্যে এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু মাঝখানে অন্তত পঁচিশ-তিরিশটা বছর ছিলো যখন বাংলা সাহিত্য নিজেকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য থেকে বিশ্লিষ্ট করে ভাববার চেষ্টা করে নি। অন্তত এ-স্পর্ধাটি ছিলো যে আমরা পৃথিবীর সাহিত্যের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবো। এখন খবরের কাগজের প্রতিদিনের কলমের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা এই প্রতিযোগিতাই বাংলা সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদর্শের এই যে অবগমন তা দেখলে ধর্জটিপ্রসাদের সমকালীন সাহিত্যিকরা গভীর বেদনা পেতেন। তাঁদের আদর্শ থেকে কতদূরে যে আজ আমরা সরে এসেছি তা তাঁদের যে কোনো লেখার সঙ্গে ইদানীং যে ধরনের লেখা প্রবন্ধ হিশেবে ছাপা হয় সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকায় তুলনা করে পড়লেই বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে যেটা আমি আরো বিশেষ করে বলতে চাই সেটা হলো ভাষা-সৌকর্য। শুধু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় নয়, ভাষা শাণিত হবে, ভাষা চতুর হবে, অথচ ভাষা স্পষ্ট হবে এবং ভাষা আমাকে আমার বক্তব্যের সারাৎসার বলতে সাহায্য করবে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে এই মহৎ গুণটি ছিলো। গুণটি বর্তেছিলো ধর্জটিপ্রসাদের রচনায়। খুব আধুনিক ভাষা, পরিচ্ছন্ন ভাষা, কোনো কালোয়াতি নেই এবং পরে সুধীন্দ্রনাথ যে একধরনের পরীক্ষায় কিছুদিনের জন্য রত হয়েছিলেন—সংস্কৃতের সংলগ্নতা—সেটা নেই। সোজা ভাবে বলে যাচ্ছি, খুব চাতুর্যের সঙ্গে বলছি অথচ বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমার যাঁরা লক্ষ্য, যাঁদের উদ্দেশ করে বলছি তাঁরা বুঝতে পারছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় এমন এক অন্তর্নিহিত গাঁথুনি ছিলো যে মনে হয় সোজা করে তিনি বলছেন অথচ এই সোজা করে বলবার পেছনে অনেক অনুশীলন কাজ করেছে, একটা সংস্কৃত মন কাজ

করেছে, একজন সংস্কৃত সাহিত্যিক নিজেকে নিবিষ্ট করে লক্ষ্যে নিবদ্ধ রাখছেন। পড়ছি, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না। পড়ছি, ভালো লাগছে কারণ আধুনিক ধরন। কিন্তু খুব বেশি পণ্ডিতিপনাও নেই। তার মানে এই নয় যে ধূর্জটিপ্রসাদ পণ্ডিতিপনা অপছন্দ করতেন। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা জানেন যে তাঁর ভেতর এক ধরনের শিশুসুলভ মনোবৃত্তি ছিলো। নিষ্পাপ শিশুসুলভ মনোবৃত্তি।—আমি এত এত বই ঘাঁটছি, এত এত লেখা পড়ছি, এত নানা বিষয় নিয়ে ভাবছি—দর্শন সাহিত্য সমাজতত্ত্ব সঙ্গীত অর্থনীতি রাজনীতি—এই এতগুলো ব্যাপার যে আমি জানি, এতগুলো ব্যাপার নিয়ে যে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করি অন্যকে সেটাই একটু সুন্দর করে বলবো। সেটা ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন, তাঁর আলাপের মধ্য দিয়ে, আড্ডার ভিতর দিয়ে এবং তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেগুলো ফুটে বেরুতো। লেখকদের নাম জুড়ে দিলেন, অনেক তত্ত্বকথা উল্লেখ করলেন, এইরকম। সঙ্গীতের শাস্ত্র নিয়ে প্রচুর চর্চা করতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ খুব ভয়ে ভয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের গানে রক্তমাংসের যে তিন-চারজন মানুষের উল্লেখ আছে ধূর্জটিপ্রসাদ সেই তিন-চারজনের একজন। 'আমরা শুধু ভয়ে মরি ধূর্জটি-দাদার'। এখন এই যে এইগুলো উনি করতেন, একটু লোকদেখানো ব্যাপার, এগুলো খুব নিষ্পাপ ছিলো, কোনো অহঙ্কারবোধ ছিলো না। অন্যকে ভয় পাইয়ে দেওয়ায় কোনো আসক্তি ছিলো না, কিন্তু সাধারণভাবে এক ধরনের দুর্বলতা যে লোকগুলো জানুক যে আমি এত এত করার চেষ্টা করছি। তবে সে-সমস্ত লেখাতেও চাতুর্য ছিলো, প্রাখর্য ছিলো কিন্তু অহমিকা ছিলো না, অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য ছিলো না, অবমাননা ব্যাপারটা ছিলো না, অবহেলা ছিলো না। এগুলো মস্ত গুণ।

প্রবন্ধ লেখার সে ধারাটি বাংলা সাহিত্যে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। প্রচুর প্রবন্ধ হয়তো লেখা হচ্ছে কিন্তু বড্ডো বেশি পৌনঃপুনিক মনে হয়। একজনেরটা দেখে অন্যজন লিখছেন। ভাষাতে একধরনের প্রকট পাণ্ডিত্য যেন চিন্তাভাবনা করেই কথাগুলো বসানো হচ্ছে। এই কঠিন কঠিন কথাগুলো যে ব্যবহার করলাম, এই কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলোর যে উল্লেখ করলাম তাতে লোকের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তত্ত্বের উল্লেখ ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় ছিলো, নামের উল্লেখ ছিলো—পাণ্ডিত নামের—, পণ্ডিতি ছিলো—কিন্তু পাণ্ডিতিটি এত ধ্রুপদী সাজে আসতো না, খুব সাদামাটা সাজে আসতো। এবং সেই পাণ্ডিতিটি আমাদের অন্তত জ্বালা ধরিয়ে দিতো না।

সবশেষে আমি অন্য যে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই তা: সাহিত্যের জন্য সংগঠন প্রয়োজন। সংগঠন বাদ দিয়ে যেমন আন্দোলন হয় না, যেকোনো আন্দোলন—রাজনীতি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের-কলেজের কোঁদল,—সংগঠন ছাড়া সাহিত্যও হয় না। কোনো বিশেষ সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে কিছু কিছু পারস্পরিক অনুকম্পায়ী মানুষকে একত্র করতে হয়। একত্র করার ব্যাপারে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মস্ত বড়ো ভূমিকা ছিলো। 'সবুজপত্র'-র পর্যায়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে অনুসরণ করতেন, শিষ্যদের একজন ছিলেন। কিন্তু এরপর যতগুলো সাহিত্য-আন্দোলন বাংলায় বা বাংলার বাইরে বিশের দশকের শেষ থেকে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত জড়ো করার চেষ্টা হয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রত্যক্ষ না হলেও অন্তত পরোক্ষ উৎসাহ ও ভূমিকা প্রচুর পরিমাণে ছিলো। আমি শুধু 'পরিচয় পত্রিকার কথা বলছি না। কাশী থেকে 'উত্তরা' পত্রিকা বের করতেন সুরেশ চক্রবর্তী মশাই। প্রচুর উৎসাহ পেয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছ থেকে। শুধু নিজের লেখা দিয়ে নয়, লেখা সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্যাপারেও। অতুলপ্রসাদ সেনকে ধরে লেখানো 'উত্তরা'-র জন্য—এও ধূর্জটিপ্রসাদ করেছিলেন। প্রথম দশকের 'বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা'-র জন্যও ধূর্জটিপ্রসাদ প্রচুর পরামর্শ উপদেশ দিয়েছেন। প্রচুর উপদেশ বিলোতেন তিনি কিন্তু সে সব উপদেশ নির্বিষ ছিলো। এমনকি বুদ্ধদেব বসুকেও দিয়েছেন কী করে 'কবিতা' পত্রিকা আরো চমৎকার করা যায়। এটা অনেকে জানেন না যে ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে অবিশ্যি বাইরে বলতেন যে কবিতা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না এবং কবিতা মানেই ন্যাকামো অথচ কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন। কবিতা পড়া ন্যাকামো সেটা রঙ্গ করেই বলতেন। বলে এক ধরনের আনন্দ পেতেন। লোকেদের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়, কতোটা তাঁরা নিরুৎসাহ বোধ করেন কিংবা তাঁর সম্বন্ধে কতোটা চমকিত হয়ে ওঠেন দেখবার জন্য, চমক লাগাবার জন্য। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার পুরনো সংখ্যা ঘাঁটলে তাঁর স্ত্রী ছায়া দেবীর অনেক কবিতা পাওয়া যাবে যেগুলি লেখার পেছনে ধূর্জটিপ্রসাদের অনেক উৎসাহ ছিলো। আমার নিজের সন্দেহ যেহেতু নিজে গান ভালোবাসতেন, গানের চর্চা করতেন, মনে মনে তাই তিনি কবিও ছিলেন। দিলীপকুমার রায় যেমন তর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ধূর্জটিপ্রসাদও তেমনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দু-তিনবার কবিতার ছন্দ নিয়ে তর্ক করেছেন। কয়েকটি চিঠিতে তার উল্লেখ দেখেছি।

যে জিনিসটা ওঁর সম্বন্ধে সবশেষে বলতে হয় সবচেয়ে বড়ো পরিচয়

হিসেবে, ইংরিজিতে ব্যবহার করা হয় ফরাশি থেকে ধার করে—Dilettante। কোনো একটি বিষয়ে নিবদ্ধ না থেকে অনেক বিষয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। যদি দুশো বছর পিছিয়ে চলে যাই, এই মানুষগুলোকেই বলা হতো রেনেসাঁসের মানুষ। কোনো বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ না থেকে জ্ঞানের পরিধি বৃত্তায়ত হচ্ছে। জ্ঞানের সবকটি পরিমণ্ডলকে জড়িয়ে নিজেকে বিস্তৃত করছে। যাঁরা একটু ভারিক্কি তাঁদের আমরা বলবো রেনেসাঁসের মানুষ আর যাঁরা একটু ঘরোয়া, যেমন ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁদের আমরা একটু তাচ্ছিল্য করে গাল পাড়বো Dilettante, বড্ডো বেশি চঞ্চল—এরও ভেতরে এক ধরনের ন্যায়হীনতা কাজ করছে বলে আমার মনে হয়।

তবু এটা ঠিক যে ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। যিনি সাহিত্যে সমাজতত্ত্বে অর্থনীতিতে রাজনীতিতে দর্শন নিয়ে বিশাল চর্চা করেন, তিনি সুর ও সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতেও যে পারঙ্গম এই এতগুলি পরিচয় তিনি নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের মানুষ বাংলাদেশে, আপাতত বাংলাদেশ বলতে পশ্চিম বাংলাকেই বোঝাচ্ছি, এমনকি গোটা ভারতবর্ষেই ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় কমে আসছে। যে-ধরনের ঘটনাক্রম দেখছি তাতে সন্দেহ হয় হয়তো আজ থেকে দশ-পনেরো-কুড়ি বছর পরে সে মানুষদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভারতীয় সমাজবাস্তব অনুধাবনের সূত্রসন্ধানে ধূর্জটিপ্রসাদ

রামকৃষ্ণ মুখার্জি

ভারতীয় সমাজবাস্তবকে বোঝার জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহুমাত্রিক ও বহুধা প্রয়াসকে এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়,—অন্তর্নিহিত জীবন-প্রবাহে মানবের ভূমিকা বোঝার জন্যে ধূর্জটির বিসারী অন্বেষাও এখানে বাদ রাখতে হচ্ছে.—যে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সামাজিক পরিবেশ (milieu) প্রাসঙ্গিক শর্ত বলে মনে করতেন এবং জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজে শ্রেণীবিরোধের সমাপ্তিকে প্রয়োজনীয় শর্ত মনে করতেন. কিন্তু এগুলির কোনটিকেই পর্যাপ্ত শর্ত বলে মনে করতেন না। অবশ্য. ডি.পি—(তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছে এই ছিল তাঁর আদরের নাম)—সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে এটা মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কারণ তিনি সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকে বিভাজনের যে কোনও প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন। লক্ষণীয়ভাবে, তিনি তাঁর অন্বেষণ শুরু করেছিলেন প্রধানতঃ একজন সমাজ-দার্শনিক হিসেবে. যদিও সমাপ্তি তাঁর প্রধানতঃ একজন অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে।

ডি. পি একজন মার্কসবাদী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে মার্কস-বিশারদ (Marxologist) বলে চিহ্নিত করে একদিকে গোঁড়া ও তত্ত্ববাদীদের থেকে অন্যদিকে পশ্চিমের অনুকারী ও গোদা অভিজ্ঞতাবাদীদের থেকে নিজের পার্থক্য ঘোষণা করেছেন। তিনি কোনও জনপ্রিয় পথের অনুসরণকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন পথ-অন্বেষী।

সুতরাং, পশ্চিম থেকে সূর্যরশ্মি "ঐতিহ্য ও আধুনিকতা"র ধারণা বহন করে "উন্নতিশীল" দেশগুলির চান্দ্র-জগতকে আলোকিত করার বহু পূর্বেই তিনি ভারতীয় সমাজবাস্তবকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে "ঐতিহ্য"কে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করেছিলেন। এটাই প্রত্যাশিত যে, মার্কসবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের দ্বারা তিনি নিন্দিত হয়েছিলেন ; শুধু অতি সাম্প্রতিক কালে ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর মতামত অল্প কিছু গুরুত্ব পাচ্ছে। তিনি আমাদের যা করতে সনির্বন্ধ পরামর্শ দিয়েছিলেন. সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সংক্ষেপে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বলবো।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাত বছর আগে, ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে প্রথম নিখিল ভারত সমাজতাত্ত্বিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ডি পি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবর্তনের ওপর বলেন। সেই ভাষণ প্রাপ্য সাড়া পায় নি: দোষ অংশতঃ তাঁর নিজেরই। ডি.পির লেখার ধরনই এমন যা আপাতভাবে প্রাঞ্জল, কিন্তু তিনি যা আমাদের জানাতে চান তা নানা শাখাপ্রশাখা ও নিবিড় পত্রাস্তরালে থাকে ঢাকা। প্রায়শই, সেকারণে, অভিযোগ করা হয়েছে যে তার রচনা দুর্বোধ্য—"দার্শনিক"। বা প্রসঙ্গের আশেপাশে যে সমস্ত ঝিকমিকে স্ফুলঙ্গের মতো মন্তব্য তিনি করতেন তাতে একজন পরিশ্রমী ও বিবেচক পাঠকও অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কেন্দ্রীয় বক্তব্য বলে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। সেকারণেই তিনি "ভারতীয় সমাজতত্ত্বের একটি বিজ্ঞান" (Desai, 1962) সৃষ্টিতে সচেষ্ট বলে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, যেক্ষেত্রে, তিনি যা করেছিলেন তা হল সমকালীন ভারতে সমাজপরিবর্তনকে বোঝার জন্যে ঐতিহ্যের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা পেশ করেছিলেন।

তাঁর প্রস্তাবনা অবশ্য সময়োচিত হয়েছিল। ডি.পির নিজের কথায়:

If this address were to be delivered a few years ago my emphasis on the need of the study of traditions would have been much less sharp Meanwhile, I have seen how our progressive groups have failed in the field of intellect, and hence also in economics and political actions, chiefly on account of their ignorance of and unrootedness in India's social reality (1958 : 240)

In my view, the real reason why we have not done more than what we have done through planning—and we have done none too badly—is the yet unresolved conflict between the traditions which are the principle of *dhriti*, that is, *dharma*, that which holds, maintains and continues, and the new traditions which the urban middle class have been trying to build up in the last hundred years or so Bureaucracy is not the villain of the piece (1958 234-235)

অবশ্য, যদি আমরা এখন পর্যন্ত ডি.পির প্রস্তাবনার প্রতি পর্যাপ্ত মনোনিবেশ না করে থাকি, তার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। এর প্রথমটি হল: বিজ্ঞানসম্মতভাবে

ঐতিহ্যের অনুশীলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমাদের নঙর্থক প্রতিক্রিয়া ; দ্বিতীয়টি, সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ; এবং তৃতীয়তঃ ভারতের পরিকল্পিত বিকাশের কর্মসূচির সহায়তায় আবিষ্ট পরিবর্তনধারার প্রতি দৃষ্টি রেখে ঐতিহ্য অনুশীলনের গুরুত্ব।

"ভারতীয় ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রাপ্তব্য অধিকাংশ গ্রন্থেই আমরা দেখেছি ফাটকা-ধরনের ও অনুমানমূলক, বা বড়ো জোর, স্পর্শনাতীতের রহস্যময় মূল্যায়ন—যতই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সাজানো হোক। আবার ডি.পি যেমন তিক্তভাবে মন্তব্য করেছিলেন, এই সব গ্রন্থের অধিকাংশই "আত্মসম্মান ও জাতীয় অহংকারের চাহিদার পথে ঐতিহ্যবাদের পক্ষে যুক্তি" (1958 : 241) সরবরাহ করার জন্যে রচিত। সেকারণে, বহু পণ্ডিত তাঁদের "বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা" রক্ষা করতে অধুনা সত্যতা প্রতিপাদন-সম্ভব তথ্যগুলিই শুধু দেখেন এবং অতীতকে বাস্তবভাবে আঁকা যায় না বলে ঘোষণা করেন।

এই প্রসঙ্গে, ডি.পি বাস্তববাদ ও বাস্তবতার মধ্যে একটি পার্থক্য টানতেন, বোঝাতে চাইতেন যে বর্তমান থেকে আমাদের লক্ষ্য একটি লক্ষ্যাভিমুখী ও সঠিক পদ্ধতিতে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করতে পারলে অতীতকে বাস্তবভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং বলতেন যে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত ও অনুমিতিতে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করে "নৃতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যর্থ হয়েছে কারণ এখনও পর্যন্ত এর [গবেষণা] ক্ষেত্রটি আড়াল রাখা হয়েছে" (1958 : 229)। অতীতের বাস্তবের আয়তনের মাপ না নিয়েই সামাজিক পরিবর্তনের সামান্যীকরণের (বা "দুঃসাহসী অনুমান-প্রকল্প ছুঁড়ে দেওয়া"র) প্রয়াসগুলিতে ডি.পির প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র, "বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে আজকাল আমরা ভারতীয় সমস্যাবলীতে যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছি তা সবচেয়ে শূন্যগর্ভ ও বিস্বাদ সামান্যীকরণ" (1958 : 229)।

অবশ্য, যদি না, অতীতের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা স্বচ্ছভাবে যথাযথ রাখা হয়, এই ধরনের মন্তব্য ও সমালোচনা ব্যর্থ হবে। সুতরাং, এই প্রসঙ্গেই আমাদের ঐতিহ্য অনুশীলনে ডি.পির পরামর্শ পরীক্ষা করে দেখা উচিত, কেননা, এই অনুশীলন বর্তমানের চলতি পদক্ষেপের সঙ্গে অতীতকে যুক্ত করছে। কিন্তু সেখানে আবার ঐতিহ্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে শুধুমাত্র একটা বিবৃতি এই অনুশীলনের দায়িত্ব গ্রহণে আমাদের প্ররোচিত না করতে পারে। যেমন, ডি. পি নিজেই যা বলেছিলেন (1958 : 232-233) :

Thus it is that it is not enough for the Indian sociologist

to be a sociologist. He must be an Indian first, that is, he is to share in the folk-ways, mores, customs and traditions for the purpose of understanding his social system and what lies beneath it and beyond it. He should be steeped in the Indian lore, both high and low.

এতে যে কেউ পাল্টা জবাব দিতে পারে যে ডি. পির ঐতিহ্য অনুশীলনের সূত্রায়ন অস্পষ্ট ও ভারতীয় জনগণের জীবনপদ্ধতির সমস্ত কিছু গ্রহণ করে, অতিব্যাপ্ত। ঘটনাক্রমে, নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের পরীক্ষামূলক তথ্যানুসন্ধান, কিছু সমাজ-বিজ্ঞানীর তার ভিত্তিতে সামান্যীকরণ ও ঐতিহ্যবাদীদের "ঐতিহ্যানুগ মূল্য-বোধ"-এর বিমূর্ত মূল্যায়ন সম্পর্কে তাঁর রায় তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অবশ্য, ঐতিহ্যের আঙ্গিকগুলি নয় বরং ক্রিয়ার ওপরেই ডি. পি জোর দিয়েছেন। সেকারণে তাঁর কাছে ভারতীয় সমাজের রূপতত্ত্ব এর শারীরতত্ত্ব বোঝার একটি সহায়ক মাত্র। মনে হয় "সমাজ ব্যবস্থা [তার সূত্রানুযায়ী] এবং তার গভীরে ও সীমানা পেরিয়ে যা আছে" তা বোঝার জন্যে তিনি অনুশীলনের এই লক্ষ্য আমাদের জানাতে চেয়েছিলেন। তিনি ঐতিহ্যকে "বিস্মৃত সত্য" ("forgotten fact") বলে বর্ণনা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে, "in fact it is generally when the tradition is no longer a description of an actual fact and when it has become somewhat evanescent as a rule of conduct that it most clearly justifies its name and performs its real functions." (1958 : 236)।

অতএব, ভারতীয় সমাজবাস্তব বুঝতে ঐতিহ্য একটি অক্ষ গঠন করে এবং সামাজিক সংগঠনের রূপগুলির সম্পর্কে, আচার-আচরণ ও অতীতের থেকে চলে আসা আচার-ব্যবহারের সম্পর্কেই শুধু এই অক্ষ আবিষ্কার করলে হবে না : আসল বিষয় হল সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এদের ক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এই প্রসঙ্গে, এবং সম্ভবত একটু অতিরঞ্জন করে, ডি.পি সমকালীন ভারতে জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে বলে, আঁকতে চেয়েছেন "ভারতীয় সমাজজীবন...মৌমাছিদের ও বীভারদের [মতো], সামরিক বাহিনীর মতো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, স্বৈরাচারী, প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সাম্যবাদী." এবং আরো মন্তব্য করেন যে, "যারা তোতাপাখির মতো 'ব্যক্তিগত মূল্যবোধ', 'স্বাধীনতা', 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা' আউড়ে যায় বা যারা তাদের অত্যন্ত অ-ভারতীয়তায় রুগ্ন হয়ে পড়েছে, সেই স্তরটিকে বাদ দিলে, এর

[জাতিভেদের] সৌন্দর্য হল আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা এতে সামরিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা অনুভব করে না।" (1958 : 235).

আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, অতীত আঙ্গিকগুলি, যেগুলি সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমে এবং / অথবা বিশোষণের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের ওপর দৃঢ়মুষ্টি আঁকড়ে আছে, তার সারাৎসার নিয়ে ডি. পি ভাবনাচিন্তা করছিলেন, এবং এই ভাবেই "বিস্মৃত সত্তা" হিসেবে ঐতিহ্য তার ভূমিকা পালন করে চলে। তিনি এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে ভারতের পরিকল্পিত বিকাশের কর্মসূচীর সহায়তায় আবিষ্ট পরিবর্তনধারাটির সাফল্যের জন্যে ঐতিহ্যের অনুশীলন প্রাণদ শক্তি। "আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপে ঐতিহ্যের পরিবর্তনের অনুশীলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডি. পি বলেছেন : (1958 : 232)

The latter are mostly economic, and we know what they are. But the way in which the economic pressures work is not that of a mechanical force. moving dead matter Traditions have great powers of resistance and absorption. Unless the economic force is extraordinarily strong—and it is that strong only when the modes of production are altered, traditions survive by adjustments. The capacity for adjustment is the measure of the vitality of traditions. One can have a full measure of this vitality only by immediate experience. Thus it is that I give top priority to the understanding (in Dilthey's sense) of traditions even for the study of their changes. In other words, the study of Indian traditions, which, in my view, is the first and immediate duty of the Indian sociologist, should precede the socialist interpretations of changes in the Indian traditions in terms of economic forces.

"অর্থনৈতিক পরিবর্তনের শর্তে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তনের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাগুলি"র প্রতি ডি. পির উল্লেখগুলির মধ্যে উভয় দিকের প্রতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ থাকতে পারে : ঐতিহাসিক বিকাশের মহান (Grand) তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগের প্রতি বা পথপ্রদর্শনের জন্যে তৃতীয় বিশ্বের পশ্চিমের কাছে নতজানু হয়ে ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং সভ্য ও আধুনিক হয়ে ওঠার প্রতি এই ব্যঙ্গ। যাই হোক,

ডি পি কালের সঙ্গে ও প্রচলিত চিন্তার জোয়ারে ভাসেন নি। বরং, সে সময়ে এবং সমকালের ভারতীয় চিন্তাধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে দুটি স্রোতোধারা, ডি পি সেই উভয় ধারাকেই অস্বীকার করেছিলেন।

একাধারে, একটি সুনির্দিষ্ট স্থান, কাল এবং মানবসমাজের নকশায় আবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যের অনুশীলনে ডি. পি জোর দিতেন, যাতে প্রাসঙ্গিক সমাজ-বাস্তবতা স্পষ্টভাবে ও বোধগম্যরূপে মূল্যায়ন করা যায়। এটা তখনকার দিনে অনেক মার্কসবাদী শোধনবাদ বলে মনে করতেন, এখনও কেউ কেউ মনে করেন। বামপন্থী র‍্যাডিক্যালরা একটি শ্রেণী হিসাবে, এই প্রচেষ্টাকে অলীক ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ বলে মনে করতেন এবং এখনও মনে করতে পারেন।

অন্যধারে, পঞ্চাশের দশকের প্রথমের দিকেই ডি পি বুঝতে পেরেছিলেন যে 'উন্নতিশীল" দেশগুলির ঐতিহ্যের অনুশীলনে পাশ্চাত্যের ধাক্কা বা চাপ আসছে, যাতে ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার পরিকল্পটি ঐতিহ্যের বন্ধনের বাধাগুলি অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে চাপিয়ে দেওয়া যায় ও "আধুনিক" হওয়া যায়, এই ভাবনা শিলস্ ১৯৬২ সালে স্থূলভাবে বলেছেন, "যার অর্থ পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীলতা স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই পাশ্চমী হওয়া।" (P-5)

সুতরাং, একজন পথ-অন্বেষী হিসেবে ডি পি ভারতীয় সমাজবাস্তবকে বোঝার অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে ঐতিহ্য অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, যার জন্যে গবেষকদের জ্ঞাতব্য সূত্রাধার (phenomenon) আত্মীকরণ করতে হবে এবং গতিশীল পরিপ্রেক্ষিতে সম্পকারের কি ঘটছে, কিভাবে ঘটছে এবং কেন ঘটছে— তা অনুসরণ করতে হবে।

সেই অনুশীলন কোনও মহান (Grand) তত্ত্বের পুনরাবৃত্তিও হবে না অথবা স্থূল অভিজ্ঞতাবাদের আড়ালে কোনও মতলবেরও সেবা করবে না। সেই জন্যে ডি পি তার সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছে আবেদন করেছিলেন (1958 : 241):

Indian sociologists should take courage in both hands and openly say that the study of the Indian social system, in so far as it has been functioning till now, requires a different approach to sociology because of its special traditions, its special symbols and its special patterns of culture and social actions The impact of economic and technological changes on Indian traditions, culture and symbol, follows thereafter.

In my view, the thing changing is more real and objective than change *per se*.

মোট কথায় তাহলে, পঞ্চাশের দশকে ভারতের সমাজবাস্তবের বহিরঙ্গের ব্যাখ্যার স্তর থেকে সমাজবিজ্ঞানকে ডি.পি উচ্চ স্তরে তুলতে প্রয়াসিত হয়েছিলেন, সেই পর্বে যাঁরা আধুনিকীকরণ-কারী, তাঁদের প্রভাবশালী প্রচেষ্টাই ছিল এই বহিরঙ্গের ব্যাখ্যা (সূত্র : Mukherjee, 1979 : 45-51)। এর পরোক্ষ ফলাফল '৬০-এর দশকেও এমন প্রচণ্ডভাবে অনুভব করা গিয়েছিল যে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের একজন মুখপাত্র স্বীকার করেছিলেন (Thaper 1968 : 5) :

If planning from below has not developed, it is because a whole group of economists drawn from various persuasions and associated with India's Planning Commission seldom moved beyond the mechanical application of Western experience. They were unable to link creatively the traditional rural based industry of our land to the national market or were reluctant to espouse concepts which would be considered primitive.

ভারতের স্বাধীনতার পরে ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের দুটি শক্তিশালী মতাদর্শ-উদ্ভূত প্রথম উৎসাহের ঝলকের মুখে ভারতীয় সমাজবাস্তবের কার্যকারণ-সমন্বিত ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে ডি. পির প্রস্তাবনা সেকারণে অত্যন্ত সময়োপযোগী। আবার নিবদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত ঐতিহ্যের আলোকে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে তাঁর প্রেরণাদান ভারতীয় সমাজবাস্তব সম্পর্কে অথবা মানবসমাজের যে কোনও বাস্তিক গঠনের বাস্তব সম্পর্কে ভবিষ্যত জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হয়ে থাকবে। সুতরাং, সংক্ষেপে আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ করতে পারি, কিন্তু, এবারে আমার নিজের ভাষায় :

১। সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরীক্ষণযোগ্য যা তার থেকে সমাজবাস্তব বোঝা সম্ভব নয় বা শুধুমাত্র সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না। গবেষককে অবশ্যই সমাজব্যবস্থাটি আবিষ্কার করতে হবে,—যা আবার তার ক্রিয়াশীলতার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বহু খণ্ডিত অংশের এক জটিল সামগ্রিকতা।

২। সমাজব্যবস্থার এই অংশগুলি শুধুমাত্র 'এগুলি কি' (অর্থাৎ তাদের

আঙ্গিক) হিসেবে পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করলে চলবে না এবং সমকালীনভাবে 'কি ভাবে' তারা পরস্পর বিক্রিয়া করে বললেই হবে না ; তা করা হলে সমাজ-বাস্তবের একটি খণ্ডিত বা বিকৃত মূল্যায়নের দিকে ঠেলে দেবে। সমাজবাস্তবের সঠিক ও বোধ্য মূল্যায়নের চূড়ান্ত প্রশ্নটি হল : এই সমস্ত অংশগুলি এই বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত কেন এবং একটি নির্দিষ্ট পন্থায় পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া করে কেন ?

৩। এই 'কেন' প্রশ্নগুলি 'কিভাবে' প্রশ্নগুলির বিলম্বিত রূপ হিসাবে উত্তর দিলে হবে না। (অর্থাৎ, বহিঃজগত ব্যাখ্যা দিলে হবে না)। মহান তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা মিলবে না। মানবসমাজের (এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় সমাজ) জনগোষ্ঠী সম্বলিত নকশা, কাল ও স্থানের এককত্বের (দ্বান্দ্বিক যুক্তি) সমাজবাস্তবকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতায় চিহ্নিত করে, সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালীন বহাল থাকে।

৪। 'কেন' প্রশ্নটি একক পরিস্থিতিতে উত্তর দেওয়ার প্রয়াস করে, কিন্তু ঐতিহাসিক আয়তনটি বিচার বিবেচনা না করে ও পদ্ধতিমাফিক ব্যবহার না করলে তা শুধু সমাজের বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও ঐতিহ্যবাদের খোরাক যোগাবে। এর বিপরীতে, কর্তব্য হল সমকালীনভাবে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ধারাটি খুলে ধরতে হবে। সুতরাং সমাজবাস্তবকে বুঝতে প্রয়োজনীয় শর্ত (অর্থাৎ চাবিকাঠি) হল, ঐতিহ্য যেভাবে মানুষের জীবনের অন্তর্গত হয়ে গেছে তার অনুশীলন,—তা ঐতিহ্যগত আঙ্গিকগুলির মধ্যে দিয়ে কার্যকর হোক বা না হোক।

৫। একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুতে ঐতিহ্য যেভাবে সমাজকে ধরে রাখে ও ঐতিহ্যের মধ্যে অবিরত ঘটে চলা পরিবর্তনগুলির সঙ্গে একটি দীর্ঘ কালসীমায় একটি পরিবর্তনশীল সমাজে ঐতিহ্য যেভাবে প্রতিফলিত হয়—তাতে বিপরীতের ঐক্যের সামগ্রিক সম্ভাবনায় ঐতিহ্যকে দ্বান্দ্বিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

ভারতীয় সমাজবাস্তবকে বোঝার জন্যে ঐতিহ্যের চাবিকাঠিটি ডি. পি যথাস্থানে দেখিয়ে দেবার পরে প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে, ভারতের পরিকল্পিত বিকাশের কর্মসূচীর দ্বারা যে সমস্ত বিরোধ নিষ্পন্ন হবে বলে খেয়ালখুশীমতো ভাবা হয়েছিল, ইতিহাস তা অপ্রতিরোধ্যভাবে ফাঁস করে দিয়েছে। পরিবর্তনের আবিষ্ট ধারাটি অবশ্য, স্ব-সৃজক ধারা হিসেবে জনগণের দ্বারা গৃহীত হয় নি, জনগণ বৃহৎ শক্তিশিবিরের একটা বা অন্যটার (যেটা যখন বেশী দর বলেছে) হাতে দাবার বোড়েতে পরিণত হয়েছে। এই হল সেই সংকট, সমাজবাস্তবকে পক্ষপাতহীনভাবে বুঝে, ডি. পি চেয়েছিলেন আমরা যে সংকট এড়াতে পারি।

যেক্ষেত্রে ভারতে সমাজবিজ্ঞান আর আধুনিকীকরণ-কারীদের হাতের মুঠোর মধ্যে নেই, সমাজবিজ্ঞানকে এইভাবে বোঝার প্রয়োজন এককভাবে ও সমগ্রভাবে আরো প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং আমরা ভারতীয় সমাজবাস্তব বুঝতে ডি. পির চাবিকাঠিটি কতখানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছি, তার পর্যালোচনা অত্যন্ত উপযোগী হবে। কিন্তু, সেই পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না।

[ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন সুজিৎ ঘোষ]

ধূর্জটিপ্রসাদের দাদামশাই

দেবারুণ রায়

"আমি যখন ঘরে এসে ঢুকলাম তখন বাইরে থেকেই শুনলাম ধূর্জটিপ্রসাদের গলা। 'দেশটা ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দেশ। কাজেই ভাষার মধ্যেও উৎকট বর্ণবিভাগ মানতেই হবে। আর সরস্বতীর মন্দির ব্রাহ্মণ পাণ্ডারাই আগলে আছে, খাঁটি বাঙলাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'তাঁরা মূলত শূদ্রভাষাকেই এদেশের খাঁটি ভাষা বলে স্বীকার করেছেন। আসলে সেকালে একটিমাত্র ভাষাই ছিল এদেশে। সে হ'ল কথ্য ভাষা, অর্থাৎ—শূদ্র ভাষা।'

*　　　*　　　*

'কিন্তু শক্তিমান ক্ষত্রিয় রাজার প্রসাদে ব্রাহ্মণ শূদ্রদের গ্রাম ছাড়া করেছিল', বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ফলে তাদের ভাষাও অপাংক্তেয় হয়ে গেল' (চলমান জীবন ১ম খণ্ড/পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

*　　　*　　　*

সবুজপত্রের সময়কার একদিনের কথা। ডঃ সৌমেনের বৈঠকে হাজির প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের এই প্রসঙ্গটি এসেছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে। সেদিনের সেই বিদগ্ধ আড্ডাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি থেকেই। কথায় কথায় সেদিন ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন: 'আশুবাবু ও দীনেশবাবু মিলে রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে 'অনচেষ্ট' ও 'ইন্‌এলিগেন্‌ট' বলে মার্কা দিচ্ছেন।······বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার ধুরন্ধরেরা ঔদ্ধত্যে আত্মহারা হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়েছিলেন 'জীবনস্মৃতি' থেকে— 'যখন লেখবার ভূত ঘাড়ে চাপে—' এই অংশের খানিকটা উদ্ধৃত করে ছাত্রদের বলেছিলেন, Rewrite into chaste and elegant Bengali.'

কিন্তু কেন এই প্রসঙ্গ তার কারণ বলা দরকার। এই কারণটি হচ্ছে তিন দশক আগে পরে জন্মানো দুটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সম-মনোভূমি উন্মোচনের প্রয়াস। দুটি মানুষের একজন অবশ্যই ধূর্জটিপ্রসাদ। আর অপরজন হলেন রবীন্দ্রকালের

বিস্মৃতপ্রায় রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রসঙ্গে কেদারনাথের অনুপ্রবেশ আপাতদর্শনে বিস্ময়কর। এবং যদি তাও হয় তাহলেও জিজ্ঞাসা আসতে পারে, ধান ভানতে এই শিবের গীতই বা কেন? পল্লবগ্রাহী অন্বেষণে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে কেদারনাথের মনোভূমি হয়তো কোনো সরলরেখায় সংবদ্ধ নয়। কিন্তু সময়ের গতির পাশাপাশি সবার অজ্ঞাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে অন্তরতর আয়োজন ঘটে থাকে তার ভেতর থেকেই উন্মোচন হয় সম-মনোভাব এবং সহ-বোধের। বর্তমান অনুলেখনটি তার বাহক মাত্র।

কেদারনাথের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী। আর ধূর্জটিপ্রসাদ জন্মেছেন ১৮৯৪-র ৫ অক্টোবর। এঁদের দুজনার মধ্যে দাঁড়িয়ে ৩১টি বছর। শুধু জন্মের এহেন ব্যবধানটিই অনুভূমিকতার বিরোধী হতে পারে না। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় চাই। সেদিক থেকে বিচার করলেও উল্লিখিত দুই ব্যক্তির মধ্যে হার্দিক সংযোগ তাঁদের নিয়মিত পত্রালাপের সূত্রে নিয়ে যেতে পারে না। অন্তত তেমন ঘটনা সেকালেও খুব স্বাভাবিকতামণ্ডিত নয়।

কিন্তু তৎকালীন নব প্রজন্মের একজন যোগ্য ধারক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ যে কারণে রবীন্দ্রপ্রতিভার মেরুবর্তী, সে কারণেই কেদারনাথের অনুরক্ত। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যখন বাঙালি সাহিত্যিক সমাজ পরিষ্কার দুই মেরুর দুপাশে, যার প্রধান কারণ রবীন্দ্রানুসারী আধুনিকতা, সেসময় রবীন্দ্রনাথের দুবছরের অগ্রজ এবং তাঁর প্রিয় 'সাহিত্যের সাথী' কেদারনাথ দুই মেরুতে বিচরণ করেও রবীন্দ্রনাথে পুরোপুরি সমর্পিত, যার প্রত্যক্ষ নজীর কেদারনাথের সাবলীল রচনাগুলিতে, শব্দে বা কথায় আধুনিক মনস্কতায়। বিচরণে বাছাবিচার না থাকলেও এবং স্বভাবতই কোনো একটি বিশেষ গণ্ডী না রাখলেও কেদারনাথের নিজস্ব যে অবস্থানটি ছিল তার ওপর ভিত্তি করে সহজ ভাষা ও আধুনিকতায় বিশ্বাসী হওয়াটা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সময় ও সাময়িকীকে অতিক্রম করবার প্রচেষ্টা তাঁর ছিল। আর সেজন্যেই একদিকে যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণ, অপরদিকে তেমনি 'সবুজপত্র' থেকে শুরু করে 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'বিচিত্রা' এমনকি 'শনিবারের চিঠি'-র তাবৎ উদীয়মান লেখক-কবিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর অসীম আগ্রহ। কেদারনাথের অভ্যাস ছিল তাঁর প্রতিটি নতুন বই বেরোনো মাত্র সেগুলো নবীন ও প্রবীণ বন্ধুদের কাছে পাঠানো। এবং সেই রসের ফাঁদেই নবীন বন্ধুদের বন্দী করে নেওয়া। ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভের সন্ধান না পাওয়া গেলেও এমন ঘটনা থেকেই যে তাঁদের সখ্য বেড়ে উঠেছিল

তাতে ভুল নেই। আধুনিক বাংলার প্রয়োগ ও বিষয়বস্তুতে হাসির অবচেতনে কান্নার আলেখ্য 'ধূর্জটি'র মন ছুঁয়েছিল। আধুনিকতায় বিশ্বাসী ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রাভিগ শক্তি হিসেবে পেয়ে প্রবীণ 'দাদামশাই'টিকে ভালবেসেছিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫-এর ভেতর কেদারনাথকে লেখা ধূর্জটিপ্রসাদের যে ৫টি চিঠি উদ্ধার করা গেছে তা থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বয়সে প্রবীণ হলেও মননে যে তিনি নবীন—একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কেদারবাবুকে লিখেছিলেন। কেদারনাথের মনের বয়স বাড়তে না দেওয়ার এই ব্যাপারটা সবার কাছেই তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। ৫১/৫ অখিল মিস্ত্রী লেনের বাড়ি থেকে লেখা ১৯২৮ সালের কোনো এক শনিবার রাত্রের চিঠিতে ধূর্জটিপ্রসাদও কেদারনাথকে একথাই লিখেছেন। সেই চিঠি :—

51/5 Akhil Mistry Lane

শনিবার রাত্রি

পরম পূজনীয়েষু

আপনার চিঠি কাল সকালে পেয়েছি। অবসর খুঁজছিলাম উত্তর দেবার জন্য। এখন পেয়েছি, তাই সেই অবসরটি উপভোগ করছি আপনার পত্রের উত্তর দিয়ে। যে রকম মৃদুভাবে বৃষ্টি পড়ছে কানের কাছে, যে রকম অন্ধকারের সান্দ্রঘনতা আমাকে আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছে তাতে ভয় হয় সব কথার উত্তর দিতে পারবনা। তবে সাহস এই যে আপনার চুল পাকলেও মন এখনও কাঁচা রয়েছে—অতএব অবাস্তবের বক্তব্য আপনি সহজেই ধরতে পারবেন।

'ডায়েরীর পাতা' এবং 'ছবি' দুটি লেখাই আপনার ভাল লেগেছে শুনে আমরা উভয়েই খুসী হলাম। ছায়া কিভাবে লিখেছিল তা আমার চেয়ে সুরেশ বেশী জানে. তবে আমি লেখাটি বেশ স্ফূর্তি কোরেই লিখি। যে বইগুলি আমি সমালোচনা করেছি সেগুলি আমার বড়ই প্রিয়—অতএব প্রিয় বস্তুর সন্ধান দিতে আমি যে মুখর হয়ে উঠব সেটা খুবই স্বাভাবিক। তবে ভালবাসার খবর দিতে গিয়ে দু একবার বিপদে পড়োছলাম। একবার আমি একজন সত্যকারের রসিক সাহিত্যপ্রিয় বন্ধুকে Barrie-র Lady Nicotine পড়তে দিই—বন্ধুটি সিগারেট তামাক সবই খেতেন। তা সত্ত্বেও তিনি যখন বইখানির ভিতর কোন বিশেষত্ব পেলেন না তখন মনে এতই দুঃখ পেয়েছিলাম যেটি বোধহয় এখনও মনে খচ্ খচ্ করে। যাইহোক, এখন বয়সের সঙ্গে মনের পেলবতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফুল ঝরে গিয়েছে, আছে কাঁটা—তাই মাঝে মাঝে খোঁচা না দিয়ে থাকতেই পারি না।

কাঁটা ধন্য কোরে ফুল ফোটে কবিতায়, কিন্তু বিজ্ঞানে ও কথায় সায় দেয় না। সুরেনবাবু কবি-প্রাণ, তাই তিনি ফুলের অস্তিত্বই মানেন। প্রবোধ কি বলে? সেও বোধহয় সুরেনবাবুর সাথে একমত হবে।

কালই সন্ধ্যাবেলায় প্রমথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি কথায় কথায় 'চীনযাত্রী' খাপছাড়াভাবে অলকায় পাতায় পড়েছেন বোল্লেন। আপনি তাঁকে একটি কাপি পাঠিয়ে দেবেন। আমি নিজেই তাঁকে পড়তে দিতাম—কিন্তু আমি যে দোকান থেকে বই কিনি সেখানে আপনার বই পেলাম না। আপনি প্রমথবাবুর সম্বন্ধে কি ধারণা কোরেছেন জানিনা—তবে আমার মনে হয় যে তিনি বড় লাজুক লোক। সেইজন্য তিনি মজলিসী লোক নন্ যেমন অতুলবাবু। প্রথম আলাপে তিনি কূর্মবৃত্তিই অবলম্বন করেন। তাঁর মৎস্য-রূপ দেখতে গেলে—তাঁর বুদ্ধির সহজ, সরল কিম্বা তীর্য্যক গতি উপলব্ধি কোরতে হলে তাঁকে তর্কের মধ্যে অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে হয়। তখন তিনি মাণিকের মতনই উজ্জ্বল, ছুরীর মতনই তীক্ষ্ণ, এবং আত্মীয়ের সম্বন্ধে নির্দ্দয়। এরকম লোককে সাধারণে দাম্ভিক বলে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁর মতন গুণগ্রাহী লোক দেখা যায় না—তবে তিনি মুখে ঘটা করে সুখ্যাতি কারুর করেন না এক রবিবাবুকে ছাড়া। যে লোক প্রাণ খুলে নিজের কথা কয় না তার সঙ্গে আলাপ করা যায় না। তাঁর দোষ এই যে তিনি কাউকে বড় প্রাণের খবর দিতে ভালবাসেন না—তবে যে পেয়েছে সে শুধু তাঁর বুদ্ধির কদর করে চুপ থাকে না। তাঁর প্রাণের আদর করে এবং তাকে সত্যই ভালবাসতে শেখে। তিনি একজন aristocrat—এবং সেইজন্যই সত্যকারের democrat, অর্থাৎ গুণগ্রাহী। তিনি লেখাতে কেবল 'আমি' 'আমি' করেন বটে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বহির্মুখী লোক। অন্তর্মুখী লোকই সাধারণতঃ morbid এবং আত্মম্ভরী হয়। প্রমথবাবুর ভিতর ও রকম কোন প্রকার মেয়েলী অস্বাস্থ্য নেই। তাঁর মনের স্বাস্থ্য এতই প্রবল যে তিনি কোন দলে যোগ দিয়ে সাধারণ বুদ্ধি এবং হাঁসবার ক্ষমতাকে ধ্বংস কোরতে পারলেন না। সেইজন্য তিনি একজন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি। এরকম লোকের সঙ্গে আলাপ কোরে আপনি সুখী হবেন কিনা জানিনা. তবে অনেকে বিরক্ত হয়েছেন এখবর জানি। তবে যদি একবার জমে তাহলে নেশার মতই জমবে।

রাত ১২টা হল, আর চিঠির কাগজ ফুরিয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি ৩০শে আগষ্ট। সুরেশ কোথায়? মহেন্দ্রবাবুর লেখাটি উৎকৃষ্ট হয়েছে—অন্য লেখা পড়বার অবকাশ পাইনি। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণতঃ ধূর্জ্জটী / 1928

এ চিঠির শেষটা দেখে বোঝা যায় ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসে থাকার সময়ই ধূর্জটিপ্রসাদ এটি লেখেন। কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা সুরেশ চক্রবর্তী যে কেদারনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের সম্পর্কের সূত্রপাতে সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন সেকথা এ চিঠি ও অন্যান্য চিঠিতে স্পষ্ট। এ চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই যে দুটি লেখার কথা বলা হয়েছে সে দুটি উত্তরাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে দিয়ে ঐ পুস্তক সমালোচনাটি লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবু ধূর্জটিপ্রসাদের স্ত্রী ছায়াদেবীকে দিয়েও লিখিয়েছিলেন। এই দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের 'উত্তরা' (৫৯২-৯৬)-য় সমালোচনা স্তম্ভে।

কেদারনাথের কাশীবাসের আমলে 'প্রবাস জ্যোতি' পত্রিকার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যজীবন। এছাড়া 'উত্তরা'ই ছিল প্রবাসের বাঙালি সাহিত্য-প্রাণ পাঠক ও লেখকদের সেসময়কার মূল অবলম্বন। প্রবাসের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনও সংগঠিত হয়েছিল যাঁদের প্রেরণায়, উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ প্রত্যেকের সঙ্গেই নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলেছিল 'উত্তরা'। প্রবাসী ধূর্জটিপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময়ে 'উত্তরা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। কেদারনাথও তখন 'উত্তরা'র নিয়মিত লেখক। কাজেই ধূর্জটিপ্রসাদ ও কেদারনাথের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তা সহজেই গড়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন থেকে অবসর নেওয়ার সময় ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন: '... কেবল গান নয়, ছবি, আকাশবাতাস, নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি অন্যরকম হয়ে যাই। বৃষ্টি এলো ঝমঝম করে, ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি।... ...' ('ধূর্জটিপ্রসাদ'/ অলোক রায় পৃ: ১৭)। ১৯২৮-এর আগস্ট মাসের কোনো এক শনিবার রাতে 'ধূর্জটি' যখন কেদারনাথকে কলকাতা থেকে চিঠি লিখতে বসেন, সেসময়কার বৃষ্টির কথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিঠিতে জায়গা পেয়েছে। 'মৃদুভাবে বৃষ্টি' পড়ায় এবং 'অন্ধকারের সান্দ্রঘনতা'য় 'আচ্ছন্ন' হয়েই তিনি কেদারনাথকে চিঠি লিখতে বসেন। সেইসঙ্গে তাঁর চিঠি আরো আন্তরিক হয়ে ওঠে— অবসরটি উপভোগ করছি আপনার পত্রের উত্তর দিয়ে' — এমন কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে।

এছাড়া এ চিঠিতেই কেদারনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার আয়োজনটি তিনি করে ফেলেন। যার ফলে সেই থেকে শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী ও কেদারনাথের মধ্যে হার্দ্য বিনিময় অব্যাহত থাকে। একইসঙ্গে এ চিঠিতে

কেদারনাথের সঙ্গে প্রমথবাবুর অভিপ্রায় ও মানসিকতা জানাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে একটি অনবদ্য মূল্যায়ন করে ফেলেন। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ বিস্তৃতভাবে লেখার প্রয়াস পেয়েছেন। যার সঙ্গে এই পত্রাংশটির সংযোজন হলে প্রমথ চৌধুরীর মূল্যায়ন আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের যে ৫টি চিঠি উদ্ধার করা গেছে তার মধ্যে মাত্র একটিতে সাল তারিখের পুরো হিসেবটি পাওয়া যায়। কিন্তু আর কোনোটিতেই তা নেই। স্থান, কাল, বার, এবং কোনোখানে সালটির মাত্র উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর পোষিত বিশ্বাসবশত হয়তো এসব পত্রাংশের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বভাবতই সাময়িক স্বার্থে দিনক্ষণ বা সন-তারিখ অপরিহার্য নয়। যাই হোক, এ অবস্থায় বিভিন্ন পত্রের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই সেসব চিঠির সময়ের হদিস পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই পাঁচটি চিঠির মধ্যে প্রাচীনতমটি লেখা লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯২৬-এ। এ চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে কেদারবাবুর লেখার প্রতি ধূর্জটিপ্রসাদের অপরিসীম শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোলাগা। সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনের আবরণ। এ চিঠির শেষের আগের অনুচ্ছেদে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখছেন: 'আপনার লেখার কিন্তু কিছু সার্থকতা আছে বোলে মনে হয়।. খেয়ালের মুখে হাসিটি মৃদু, তার মনে গোঁড়ামী নেই। মুখে থাকলেও থাকতে পারে, অনেকটা Abbe Coignard-এর মতন। অনেকটা ফরাসী খেয়াল আর কি। এই হিসাবে আপনি খেয়ালী, এই বেশ স্বাভাবিক কথা হচ্ছে, কোথা থেকে অন্য কিছু হয়ে গেল বোলে মনে হল, কিন্তু আবার হাসতে হাসতে ফিরে এল, যাদুকরের হাতে তাসের মতন। এ একরকম রূপসৃষ্টি, তবে art for art's sake নয়। আপনার লেখায় গোটা মানুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে।......'
ধূর্জটিপ্রসাদের এই ক'টি কথার মধ্যে—একদিকে আছে মানুষ ও লেখক কেদারনাথের বিরল উন্মোচন, এবং আরেকদিকে মূর্ত হয়ে উঠেছে পূর্ণ মানবতার জন্য তাঁর সারা জীবনের অনুসন্ধান।

১৩৩৩ এর 'কল্লোল' ভাদ্র সংখ্যায় (২৬১-৬৪) ধূর্জটিপ্রসাদের 'বর্তমান গদ্য সাহিত্য' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি বেরোয়, সে সম্বন্ধে এ চিঠিতে তিনি যে কথা লিখেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় চিঠিটি ১৩৩৩ এর ভাদ্রমাসেই লেখা। অর্থাৎ ১৯২৬ (ইং) সালের আগস্টের শেষ কিম্বা সেপ্টেম্বরের শুরুতে।

The University
Lucknow
বুধবার

পূজনীয়েষু,

অনেক দিন কোন পত্র পাই নি এবং কাজের ভিড়ে কোন অবসরও পাইনি আপনাকে পত্র লিখতে। আজ কলেজে মাত্র ২ ঘণ্টা [কাজ রয়েছে] এবং তার জন্য পড়াও তৈরী হয়ে গিয়েছে। এই সুযোগে একটু আনন্দ উপভোগ কোরে নেওয়া যাক্।

পরশু রাত্রে সুরেশ আমার এখানে ছিল। অনেকরাত্রি ধরে সাহিত্যালোচনা হল। আলোচনা আর কি? সেই কথা কয়ে যেতে লাগল, আর আমি মাঝে ২ জেগে আছি তার প্রমাণ দিয়ে গেলাম। তার কথার মধ্যে এ বইখানি ভাল, ওখানি খারাপ, কবে ছাপাখানা খুলবে ইত্যাদি। আর সবচেয়ে বেশী কথা হল আপনাকে নিয়ে—আপনি কিরকম ভাবে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা করেন এই মাত্র। সাহিত্য সম্বন্ধে কথা মানে সাহিত্যিক ভাল কিম্বা মন্দ লোক তাই বিচার করা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গতমাসের উত্তরায় আপনার লেখা ভাল লেগেছে আমাদের মাত্র এই একটি মন্তব্য পাস করা হয়েছিল। যাই হোক সুরেশের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আপনাকে পত্রাঘাত করার ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে। তার ফল এই অসময়ে ফলল। অসময়ের ফল আশা করি নেহাৎ খারাপ লাগবে না।

আপনি নতুন কি ভাবছেন কি সৃষ্টি কোরছেন জানতে ইচ্ছা হয়। আমাদের সাহিত্যে নতুন রূপসৃষ্টি করা চাই। তার জন্য প্রতিভার আবশ্যক। প্রতিভা হুকুমে জন্মায় না। কিন্তু আর এক উপায়ে আমরা প্রতিভার সাহায্য কোরতে পারি। বাইবেলএ আছে impetus of the undistinguished. অর্থাৎ সাধারণের ধাক্কায় অ-সাধারণ [সম্ভব হতে] পারে। আমি সমাজ-তত্ত্ব পড়াই, সেজন্য অন্ততঃ ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হয় যে সাধারণের standard বাড়াতে হবে তবেই সমাজের মঙ্গল—নচেৎ ২।৪ জন মহৎ লোকের আবির্ভাবে কিছুই হবে না, লাভের মধ্যে লোকে যে গড্ডলিকার প্রবাহে চলছিল তাই চলবে। কিন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে যেটি ঠিক, সেটি সুন্দরের ক্ষেত্রে নয়। সুন্দরের শক্তি অন্য জগতের—এই হচ্ছে আমার মনের কথা। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে অন্য আচরণ কোরে থাকি। অন্য জগতের খবর যখন জানি না তখন এ জগতের জন্য লিখতে হয়। আমি লিখি যাতে অন্যে আমার চেয়ে খারাপ না লেখে এই ভেবে। কিন্তু আমার জন্য কারুর

লেখার উন্নতি হচ্ছে না, অবনতিও হচ্ছে না—অতএব সুন্দরের জগতে আমার লেখার সার্থকতা কি?

আপনার লেখার কিন্তু কিছু সার্থকতা আছে বোলে মনে হয়। আমাদের সাহিত্যে grotesque, অদ্ভুত রস আছে, ঠাট্টা আছে অনেক, কিন্তু খেয়াল নেই এক কমলাকান্তের দফ্তর ছাড়া। আমি খামখেয়ালী সাহিত্যের কথা বলছি না—কেননা সেটি সাহিত্য হতেই পারে না, সাহিত্যে চাই সংযম, এবং একটি ব্যক্তিত্বের গ্রন্থী। খামখেয়ালী অত্যন্ত খাপছাড়া লোক, সেইজন্য তার সঙ্কেতসূত্রগুলিও খাপছাড়া হতে বাধ্য। কিন্তু যে ডায়েরী লেখে তার লেখা খাপছাড়া হলেও ব্যক্তিত্বের সূত্রটি বজায় রাখে। আমি বলছি অন্য খেয়ালের কথা—যে খেয়ালে সব ভালমন্দর সঙ্গে সহানুভূতি থাকে, সব ছোট বড়র সঙ্গে যোগসূত্র বজায় থাকে। খেয়ালের মুখে হাঁসিটি মৃদু, তার মনে গোঁড়ামী নেই, মুখে থাকলেও থাকতে পারে, অনেকটা Abbe Coignardএর মতন। অনেকটা ফরাসী খেয়াল আর কি। এই হিসাবে আপনি খেয়ালী, এই বেশ স্বাভাবিক কথা হচ্ছে, কোথা থেকে অন্য কিছু হয়ে গেল বোলে মনে হল, কিন্তু আবার হাঁসতে হাঁসতে ফিরে এল, যাদুকরের হাতের তাসের মতন। এ একরকম রূপসৃষ্টি, তবে art for art's sake নয়। আপনার লেখায় গোটা মানুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে।

এ মাসের (এখনও বাহির হয় নি বোধ হয়) কল্লোলে আমি একটা মস্ত বড় আলোচনা কোরে ফেলেছি। গত মাসের উত্তরায় শৈলজাবাবুর যোল আনার সুখ্যাতি কোরেছি, এবার গড্ডলিকা, ঐন্দ্রজালিক আর অতসীর সমালোচনা কোরেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্লোল-কালীকলমের দোষ দেখিয়েছি। দয়া কোরে পড়ে মন্তব্য প্রকাশ কোরলে সুখী হব। কাল রাত্রে অধ্যাপকীয় সাহিত্য নিয়ে একটা লেখা বঙ্গবাণীতে পাঠালাম—আশ্বিন মাসের জন্য। নাম দিয়েছি 'আমরা এবং তাঁহারা'। কল্লোলের লেখাটার নাম 'বর্ত্তমান বাংলা গদ্য সাহিত্য'—না ঐ রকম একটু কিছু মনে হচ্ছে না। পত্রের উত্তর দেবেন। প্রবোধ, সুরেনবাবুকে সম্ভাষণ জানাবেন।

ধূর্জ্জটী

কেদারনাথের রহস্য কবিতা সংকলন 'উড়ো 'খৈ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩৪-এ। বইটি পেয়ে সেটি পড়তে পড়তে, তার পরদিনই ধূর্জটিপ্রসাদ প্রাপ্তি-সংবাদ লিখতে বসেন। চিঠির ওপরে লেখা 'রবিবার সন্ধ্যা'। এবং আসছে সোমবার থেকে পূজোর ছুটি হবে—একথা রয়েছে চিঠির ভেতরে। সুতরাং ধরে

নিতে অসুবিধে নেই যে চিঠিটি ১৯৩৪-এর দুর্গাপুজোর আগ দিয়ে লেখা। চিঠিটির শুরুতে 'সুধীনবাবু' লিখে কেটে দিয়ে তারপর তিনি 'দাদামশাই'-কে লিখতে শুরু করেন। বোঝা যায় চিঠি লিখতে বসেই তাঁর সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ হয়েছিলো।

এচিঠির আগাগোড়া জুড়ে আছে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি। জীবন ও জীবনযাপন সম্পর্কে তিনি যে গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসাতে রাজি নন তা যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিষ্কার কয়েকজনের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন। কেদারনাথের কবিত্বকে খুঁটিয়ে বিচার করেও তাকে সমালোচনার স্তরে নিয়ে যেতে চাননি। বরং কবিতার ছন্দপতন এর সমর্থনে বা কাবর সমর্থনেই কিছু যুক্তি সাজিয়েছেন। তিনি একথা লিখেছেন কারণ 'উড়ো খৈ' লেখার ভিতটা যে অত্যন্ত প্রাঞ্জল তা তাঁর জানা। তাছাড়া ছন্দের প্রমাদকে অতিক্রম করেও রস-কবিতার অন্তর্গত রস যে তিনি পেয়েছেন তার মূলে আছে কেদারবাবুর প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ। যদিও লেখকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যে তিনি সজাগ সেটি যথাসময়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই চিঠিতেই।

কথায় কথায় এ চিঠির এক জায়গায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুকুমার রায় ও অমৃতলাল বসুর প্রসঙ্গ এসেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ অল্পকথায় এঁদের মূল্যায়নও করেছেন। যথাক্রমে তিনজনের প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: 'প্রথম দুজনকে আমি হাসির রাজা বলি—অবশ্য পদ্যে। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রমথবাবু শেষ কথা লিখেছেন। সুকুমার রঞ্জনের সম্বন্ধে কেউ লেখেনি। এর চেয়ে দুঃখের কথা বাংলা সাহিত্যে হতে পারে না। Perfect কাউকে বলতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু সুকুমারের হাসির কবিতা বোধহয় সর্বাঙ্গসুন্দরই। আবোল-তাবোলের তুলনা নেই।' চেনার চোখ ও তার পরিপূরক মন ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের। তাই প্রসঙ্গ পেয়ে সুকুমার রায়ের বিরল ও যথার্থ মূল্যায়ন করে যাওয়া তাঁর সম্ভব হয়েছিল। আনুষঙ্গিক বিষয় ছাড়াও এই মূল্যায়নই পত্রাংশটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

কেদারনাথের রসরচনার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহমান ছিল বেদনার ফল্গুধারা। তিনি নিজেও একথা বলে গেছেন তাঁর শেষ লগ্নে। কিন্তু তার বহু আগেই আত্মপ্রচার-বিমুখ মানুষটির মনের খবর যে ধূর্জটিপ্রসাদ পেয়েছিলেন তা তিনি লিখেছেন এ চিঠির অন্তিম দুটি ছত্রে: 'দাদামশাই, আপনার মনটি অতি নরম, নচেৎ কাউকে গালাগালি পর্যন্ত দিতে পারেন না। কেবল হেঁসেই গেলেন, কেঁদেই গেলেন।' শেষের এই অনবদ্য চারটি অক্ষর ধূর্জটিপ্রসাদের হাস্যরসাশ্রিত সম্পূর্ণ চিঠিটির মূল সুরকে বেদনাঘন করে তোলে। তাঁর স্বচ্ছ স্বাভাবিক জীবনের

কোথাও যেন একটা প্রলম্বিত দুঃখবোধের সন্ধান দেয়। যা প্রকৃত শিল্পীসত্তার অবিচ্ছেদ্য অলংকার।

DHURJATI PRASAD MUKERJI

রবিবার সন্ধ্যা
THE UNIVERSITY
LUCKNOW

দাদা মশাই,

উড়ো খৈ উড়ে এসে পড়ল। গোবিন্দ নই, গোবিন্দ ভজনাও করি না, হাওয়ার কোন চলাফেরায় অমন হালকা জিনিষ ভেসে আসে তাই ভাবছি। একেই কি বলে প্রাণের টান?

কাল পেয়েছি, কাল থেকেই হাঁসছি। আজ রবিবার, সোফায় শুয়ে ঘরদোর নোংরা করছি, হাতে আপনার বই। বেড়ে লাগছে কুড়েমি করতে আর হাঁসতে। যে সব যায়গায় চমক্ লাগছে পেনসিলের দাগ দিচ্ছি। আমাদের হাঁসতে গেলেও দাগ দিয়ে হাঁসতে হয় দাদামশাই। যখন বড় ভাল লাগছিল তখন ইচ্ছা হচ্ছিল যাই ছুটে কাউকে গিয়ে শুনিয়ে আসি। আজ কিন্তু বন্ধুরা ভারি ব্যস্ত, পুজোর ছুটিতে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে কোন্ পাহাড়ে যাবেন পরামর্শ করছেন। আসছে সোমবার থেকে ছুটি হবে কিনা তাই। আজ দেখা করব না, তবে দুদিন পরে বলব তাঁদের উড়ো খৈটা সঙ্গে নিয়ে যেতে। ব্রিজ-পার্টি ও চা-পার্টির দুর্লভ অবসরে পড়লে তাঁরাও হাঁসবেন মনে হয়।

শপথ করে বলতে পারি দাদামশাই যে আপনার হাঁসি নিতান্ত সংক্রামক। এ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে আপনার ছন্দের ভুল ধরা। সে জন্য মাত্রা গুনতে হবে, এবং হিসাবই হাঁসির শত্রু একথা যে মাদ্রাজী অফিসারকে দেখেছে, স্কুলে অঙ্কের ক্লাশে ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখেছে, গৃহিণীকে স্যাকরার সঙ্গে হিসাব করতে যে শুনেছে—এ জিনিষটা দেখা যায় না, আড়াল থেকে শোনাই যায়—সেই বাধ্য হবে স্বীকার করতে। আমি আত্মরক্ষার জন্য উক্ত উপায় অবলম্বন করেছিলাম—কিন্তু আমি পারলাম না। কারণ, একলা একলাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছি যেখানে যতিভঙ্গ হয়েছে সে স্থান পূরণ করছি জোরে হেঁসে, হাঁসির লহরই পতিত ছন্দকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

হাঁসির কবিতা যে ছন্দে লেখা হবে সে ছন্দে কান্নার কবিতা লেখা হবে না। হাঁসতে হাঁসতে দম্ আটকে যদি যায়, তা হলে হাঁসির কবিতায় ছন্দেও সেই দম্-আটকান ভাবটিও প্রতিধ্বনিত হওয়া চাই। Lyric কবিতার উৎপত্তি lyre

থেকে, dramaর উৎপত্তি যাগ-যজ্ঞ থেকে, নভেল উঠল ইতিহাস থেকে—তাই এখনও lyric কবিতায় যন্ত্রের ঝনঝনানি, নাটকে অনুষ্ঠানের ঐশ্বর্য্য, নভেলে বিবৃতির ধারাবাহিকতা এখনও টের পাওয়া যায়। হাসির কবিতার গোড়ায় যদি থাকে সত্যকারের প্রাণখোলা দমবন্ধ করা হাসি, তা মাত্রিক ছন্দে হাসির গট্‌রা ফুটবে না। ছন্দের বৈচিত্র্যের সাহায্যে পাঠকের মুখে হাসি ফোটান যায় নিশ্চয়, কিন্তু সে জন্য যে ধরণের কেরামতী চাই সেটা আপনার ধাতে নেই—আপনি কবি বলে দাবীও করেন নি।

হাঁ, আর এক প্রতিষেধক আছে। তুলনামূলক বিচার। অর্থাৎ, আপনাকে দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রঞ্জন রায়, ও অমৃতলালের সঙ্গে তুলনা করা। তা করতেও আমার মন চাইছে না। প্রথম দুজনকে আমি হাঁসির রাজা বলি—অবশ্য পদ্যে। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রমথবাবু শেষ কথা লিখেছেন। সুকুমার রঞ্জনের সম্বন্ধে কেউ লেখেনি। এর চেয়ে দুঃখের কথা বাংলা সাহিত্যে হতে পারে না। Perfect কাউকে বলতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু সুকুমারের হাঁসির কবিতা বোধহয় সর্বাঙ্গসুন্দরই। আবোল-তাবোলের তুলনা নেই। পরশুরামের কবিতায় হাস আছে কিনা জানিনা—যে কবিতাটা ছাপান হয়েছিল সেটা খুব উচ্চশ্রেণীর নয় সন্দেহ হয়। আজ যদি তাঁর গদ্যের হাত পদ্যে আসত, তা হলে। থাক্ সে সব কথা! সব্যসাচী কজন হয়। অমৃতলালের হাঁসির কবিতা আমার ভাল লাগে না—তাঁকে মুখেও জানিয়েছিলাম।

কিন্তু—দূর্ত্তোর। হাঁসা যাক্। সে যে কি ছ্যালে, কেমন ছ্যালে', ভেবে আর কি হবে। কতক্ষণ হাঁসলে কাজ দেয়।

দাদামশাই, আপনার মনটি অতি নরম, নচেৎ কাউকে গালাগালি পর্যন্ত দিতে পারেন না। কেবল হেঁসেই গেলেন, কেঁদেই গেলেন।

প্রণত:

ধূর্জটি / 1934

কেদারনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'আই হ্যাজ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। ঐ বছরই ধূর্জটিপ্রসাদের বহু আলোচিত উপন্যাস 'অন্তঃশীলা'রও আত্মপ্রকাশ। 'আই হ্যাজ' পেয়ে ও পড়ে কেদারবাবুকে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে যে চিঠি লিখছেন তাতে অন্তঃশীলার ইঙ্গিত আছে: 'ইতিমধ্যে আমিও একটা কুকীর্তি করে ফেলেছি। ভেবেছিলাম নভেলটি পাঠাই, কিন্তু যে কারণে শরৎ দা ও রবীন্দ্রনাথের মতামত নিইনি সেই কারণে আপনাকে উপহার দিইনি।' এছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের মানসিক

গঠন যে কতখানি পরিশীলিত ও আধুনিকতায় সমৃদ্ধ ছিল একথায় তারও কিছুটা কল্পনায় আনা যায়।

১৯৩৫ এ দিল্লীতে প্রথমবার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি। কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কেদারনাথকে ভার দিয়ে চলে যান। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদও। তাঁর এই চিঠিতে তার আভাস আছে: 'এবার দিল্লীতে প্রবাসী সম্মেলন হচ্ছে। হয়ত দেখা হবে।'

DHURJATI PRASAD MUKERJI

মঙ্গলবার

The University
LUCKNOW

পরম পূজনীয়েষু,

আপনার বই পেলাম, পড়লাম, এবং অন্যদের পড়ার মনঃস্থ করলাম। বলা বাহুল্য, খুবই উপভোগ করেছি। বাস্তবিকই এ-দেশে 'I' ই নেই যে have হবে, এবং has এর পূর্বে it আছে। আত্মাকে হৃদয়ে পরিণত করবার পরামর্শ না দিয়ে আপনি উপদেশ দিচ্ছেন দেশের জনমানবের জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে যুক্ত করতে হবে, তবেই হবে আত্মার বিকাশ। তারই নাম স্বরাজ-সাধন। খুব খাঁটি কথা লিখেছেন। স্বদেশ-প্রেমের মহামন্ত্র হিসেবে আপনার বাণী গ্রহণ করলাম। আপনি মন্ত্রদান করেছেন সূক্ষ্ম হিসেবে এবং এই যজ্ঞে ধোঁয়ার চেয়ে হাসিরই রাজত্ব। সত্যকার স্বদেশ-প্রেমিক ও রসিক পুরুষকে নমস্কার জানাই।

অনেক দিক থেকে বইখানি ভাল লাগল। সব লেখবার সময় নেই, সামর্থ্যও নেই। কেবল আনন্দ পেয়েছি এই খবরটুকু দিলাম।

ইতিমধ্যে আমিও একটা কুকীর্তি করে ফেলেছি। ভেবেছিলাম নভেলটি পাঠাই, কিন্তু যে কারণে শরৎদা ও রবীন্দ্রনাথের মতামত নিইনি সেই কারণে আপনাকে উপহার দিইনি। আপনি আমাকে সব বই প্রায় উপহার দিয়েছেন, আমি একখানাও দিই নি—অতএব অসভ্যতা করেছি। কিন্তু আমি ভাবি, কেন আপনাদের বিরক্ত করব? আমি খুব ভাল রকমেই জানি যে আপনারা স্নেহ-পরবশ হয়ে এমন অনেক স্তু-বচন ব্যবহার করবেন যার যোগ্যতা আমি কোন অংশেই অর্জ্জন করিনি। আপনারা সেকালের লোক—ভদ্রতা করাটা আপনাদের রোগের সামিল। তাছাড়া, কোন না কোন পাপ এককালে করেইছেন, এই বয়সে

আবার মিথ্যা কথা বলবার সুযোগ ও লোভ সামনে ধরলে আপনাদের পাপের ভার বাড়বে বই কমবে না। সত্য কথা লিখলাম। এইসব নানা কথা ভেবে বই পাঠাইনি এবং পাঠাব না।

নরেশ একরকম ভালই আছে। এইমাত্র চলে গেল উঠে অন্য পাড়ায়। সে ভালই আছে। তার নতুন ঠিকানা

c/o Dr. Kalidas Chakravarty M B

Golagunj, Lucknow

তার বাড়িতে খবর দেবেন যে সে ভালই আছে। পূর্ণিমার বর্ণনা পড়ে সে খুব উল্লসিত। আশা করি আপনি সুস্থই আছেন। ইতি

ধূর্জটি 1935

পুঃ আবার লিখছি: 'Ilias' সত্যই বড় উপভোগ করলাম। লেখকের চরিত্র এবং দৃশ্যগুলি খুবই জীবন্ত হয়েছে। এবার দিল্লীতে প্রবাসী সম্মিলন হচ্ছে। হয়ত দেখা হবে।

পঞ্চম চিঠিতেই একমাত্র সঠিক দিন তারিখ রয়েছে। ১৭-১-১৯২৮ তারিখে এটি লক্ষ্ণৌ থেকে লেখা। ধূর্জটিপ্রসাদ দেবীতে চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছেন: 'জলধরদা ও হরিমোহনকে যে পত্র লিখি তার মারফৎ আপনাকে আমার প্রণাম জানাই।' এখানে 'জলধরদা' অবশ্যই 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন এবং হরিদাস লিখতে তিনি হয়তো ভুল করে লিখেছেন হরিমোহন। কারণ মডার্ন আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এ চিঠিতে বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে এবং তার মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদের স্বকীয় চিন্তাধারা। প্রথমত মীরাটে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হতে না পারার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তিনি। যাতে খদ্দর সম্পর্কে তাঁর বিরক্তি পরিষ্কার ধরা পড়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে অনেক উচ্চমত রেখেও তাকে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি করার ব্যাপারে তিনি নীরব বিরোধিতা করেছেন। সাহিত্যিকদের নিখাদ সাহিত্যের আসরে বিজ্ঞানীর প্রবেশকে তিনি মেনে নেন নি।

যথেষ্ট রসদীপ্ত এই চিঠিতে ধূর্জটিপ্রসাদের নারীবিদ্বেষ অত্যন্ত সরলভাবে ফুটে উঠেছে। লেখিকাদের সম্পর্কে তিনি মোটেই সহনশীল ছিলেন না তার অন্যতম প্রমাণ এই চিঠি তারপর এসেছে সমকালের লেখকদের সম্পর্কে তাঁর

নিজস্ব বিচার। তখন সবুজপত্রের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের গুণে ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রবিরোধিতাকে মনে স্থান দিতে পারছেন না। 'এদিকে তাঁর সমবয়স্ক লেখকরা কেউ প্রগতি, কেউ বা প্রতিক্রিয়ার ছত্রছায়ায় রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় মুখর। এই সময়ই তিনি 'সাহিত্যে মিথ্যাবাদ' প্রবন্ধটি লেখেন। সেটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ এর 'বিচিত্রা' অগ্রহায়ণ সংখ্যা (৮১২-১৬)-য়। চিঠিতে প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে। কেদারবাবুর কাছে তার লেখায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না। উক্ত দুই গোষ্ঠীর লেখকদের কারো মতে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভালো বাংলা লেখেন -একথায় তিনি যতটা পীড়িত হয়েছেন, ততটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাধাকমলকে 'গাধাকমল' হতে দেখে। কালক্রমে মহাকালের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদের সেসময়কার বিশ্লেষণই ছিল যথার্থ।

Lucknow
University Quarters
17. 1 28

পরম পূজনীয়েষু,

কাল সন্ধ্যার সময় আপনার চিঠি পেয়েছি। এতদিন যে কেন চুপ কোরে ছিলাম ভেবে পাচ্ছি না—আর ভেবেও কাষ নেই, গোটাকয়েক ছুতো তৈরী হবে। তবে জলধরদা ও হরিমোহনকে যে পত্র লিখি তার মারফৎ আপনাকে আমার প্রণাম জানাই। হয়ত তারা ভুলে গিয়েছিলেন।

সত্য কথা বলি? মাথার ওপর Indian Economic Conferenceএর জন্য একটি প্রবন্ধ লেখবার ভার ছিল—শেষ দিন পর্য্যন্ত সেটা মুলতুবী রেখেছিলাম —তার ওপর হাতে টাকা ছিল না। হাতে অন্ততঃ একশ টাকা না থাকলে দূর দেশে যাওয়া যায় না—বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী ও বিজলীমিস্ত্রী সারা একটি মাস কায করছিল। এসব ছেড়েও যেতাম, হঠাৎ মনে হল কখনও জীবনে খদ্দর পরিনি, অথচ মীরাটে সাহিত্যের বৈঠকের পাশেই খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হবে এই গুজব শোনা গেল—এক্ষেত্রে সেখানে আমার কোন স্থান নেই মনে হল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ, কিন্তু তার সঙ্গে সাহিত্যের কি সম্পর্ক জানি না—উত্তর ভারতীয় বাঙালী সম্মিলনের সাহিত্য আলোচনা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের সাথে আমার সহানুভূতি নেই। আপনি গরীব বোলেই কি আপনাকে সাধারণ সভাপতিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হল? সাহিত্যে যদি নামজাদা লোক না পাওয়া যেত, তাহলে সভাপতির দরকার কি ছিল? বাংলা দেশ থেকে অ-সাহিত্যিকের

আমদানী করবার প্রয়োজন কি এতই ভয়ানক ছিল ? কি জানি, আমার ভয় হয়েছিল যে বোধ হয় বা সাহিত্য সম্মিলনের ধর্ম্ম নষ্ট হবে। যাই হোক, আপনি ছিলেন, শিশিরবাবু, নীলরতনবাবু ও সারদাবাবু ছিলেন—আমার যাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু মীরাটে গিয়ে সভাপতি মহাশয়ের খদ্দরের সামনে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারতুম না। যিনি জীবনে অত বড় দান করেন তাঁর সামনে উপস্থিত হতে আমার ভয় হয়। এসব কথা আপনাকে লিখতে সাহসী হয়েছি, কেননা হয়ত আপনি এই ছেলেমানুষী কথার যথার্থ অর্থটুকু গ্রহণ কোরবেন।

'তুক্লাদপিরা' ছিলেন না ভালই—তাঁরা সাহিত্যের আদি কারণ—কিন্তু মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয়নি। যদি আগে জানতুম, তাহলে হয়ত বা চলেই যেতাম। এক একটি মেয়ে সেজে-গুজে মাকাল ফলটি হয়ে আসবে, আর প্রেমের কবিতা শুনলে স্বামীর পত্রের কথা স্মরণ হবে—রামায়ণ শুনে রামছাগলের কথা মনে হওয়ার মতন—এই সব চোখে পড়লে সাহিত্যের উৎস শুকিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের হাটে-বাজারে যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে দিন কিন্তু সাহিত্যের আসরে নয়—এমন বিবাদী সুর মনে হয় যে কী বোলব! এমন মিথ্যা সেজে আসে, এমন মিথ্যা গাম্ভীর্য্যের ভান করে—এমন শূন্যতা-ভরা চাউনী চায়, যে দেখলে মনে হয় সরস্বতী ঠাকরুণ মেয়ে মানুষ হয়ে, একাই বাকী সব স্ত্রীলোকের বিদ্যাটুকু শুষে নিয়েছেন। যেমন একজন মাতাল ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার ছেলে মদ খায় না কেন জান ? যা নিজে খেয়েছি তারই সুদে তিন পুরুষ চলবে বাবা"। আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের সভাগণ সব সুদের জোরে চলেন। এসব লেখার কোন গূঢ় কারণ কিম্বা তাৎপর্য্য নেই।

আপনার অভিভাষণ এখনও পাইনি—কারুরই পাইনি তাই একটু উদগ্রীব হয়ে আছি। এই দলাদলির ভেতর নিজের মত জোর কোরে বলবার সাহস চাই—তবে মতামত প্রকাশ যে অভিভাষণের মধ্য দিয়ে কোরতেই হবে তার মানে নেই। আমি কিন্তু মহাবিপদে পড়েছি। রবিবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বোল্লে আমার সহ্য হয় না—নবীন লেখকদের মধ্যে ২/১ জনকে আমার ভাল লাগে—তাও ২/১টা লেখা। শৈলজানন্দের ক্ষমতাকে তারিফ না কোরে থাকতে পারি নি—অচিন্ত্যের কবিতা বেশ লাগে। প্রেমেনের বেশী লেখা আমি পড়ি নি। কিন্তু তাদের দল এ কি কোরছে ? সেজন্য তারা দায়ী নয়, জানি। শনিবারের চিঠির অনেক লেখা আমার ভাল লাগে—জুৎসই কোরে গালাগালি দিলে সকলেরই ভাল লাগবে—

কিন্তু ঝগড়াটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! একধারে বোলছে যে রবিবাবুর চেয়ে প্রেমেন মিত্র ভাল বাংলা লেখে (কমলবাবু ও প্রগতি, পৌষ) অন্যধারে রাধাকমল গাধাকমল হয়েছে। এইসব দেখেই আমি সাহিত্যে মিথ্যাবাদ লিখি। যাই হোক, এর জন্য যদি কিছু রক্তপাত হয় সেও ভাল—বুঝব দেশে রক্ত আছে—uptill now the only bloodshed has been that of women! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমাদের দেশের প্রাণহীনতা দেখে এতই দুঃখ হয় যে কি বোলব!

আপনি কি কোরে কাল কাটান? একটু লম্বা চিঠি দেবেন। চৌধুরী মশাইএর কোন খবর নেই, তিনি সম্প্রতি রাঁচি থেকে এসেছেন কোলকাতায় শুনেছি। এখানকার খবর ভাল। পত্রের উত্তর দেবেন। আপনারা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। কবে দেখা হবে?

ইতি প্রণতঃ ধূর্জটি

রিপন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় রসসাহিত্যের অঙ্গনে একটি বিশিষ্ট নাম। কেদারনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ জীবন পর্যন্ত দুজনের সখ্য ছিল অটুট। সারাজীবন কেদারনাথ যত চিঠি পেয়েছেন বা লিখেছেন তার মধ্যে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আদানপ্রদানই ছিল সর্বাধিক। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন এই ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই তাঁর মাধ্যমেও কেদারনাথের সঙ্গে 'ধূর্জটি'র সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছিল। তাঁদের দীর্ঘদিনের আন্তরিক আদানপ্রদানের অণু পরিমাণ সাক্ষ্য বহন করছে আলোচিত পাঁচটি চিঠি। যা থেকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ যে সত্যটি ফুটে ওঠে, তা হল, প্রাচীন হয়েও যিনি সজীব নবীন মনের মানুষ তাঁর সঙ্গে নবীন হয়েও অভিজ্ঞানে ও প্রাচীন-সুলভ প্রজ্ঞায় পূর্ণ একজন জীবিতের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও স্মরণ করতে হয়।

'প্রবোধ': প্রবোধচন্দ্র বাগচী। 'সুরেন': সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। (মতান্তরে 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।)

'শিশিরবাবু': শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

বিঃ দ্রঃ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদের চিঠিগুলি ব্যবহার করতে না দিলে এ লেখাটি পরিকল্পনাতেই সীমায়িত থাকতো। এছাড়া শ্রদ্ধেয় রণজিৎকুমার সেনের মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হতনা।

পার্সোনালিটি বনাম ধূর্জটিপ্রসাদ ও পার্সোনালিটি

নীহাররঞ্জন বাগ

যেমন রবীন্দ্রনাথের সাধনা অরূপানুভূতি, কীটসের অন্বিষ্ট সুন্দর, অথবা রিলকের সংকল্প বিষয়ের কাছে প্রপন্নার্তিময় স্বত্বত্যাগ, তেমনি ধূর্জটিপ্রসাদের—তাঁর সমস্ত নান্দনিক কৃতির মধ্যে—আজীবন একটিই মাত্র এষণা পার্সোনালিটি। ইতিহাসে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার, অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পলিটিক্যাল ইকনমি ও পলিটিক্যাল ফিলসফি এই দুই শাস্ত্রে আরও দুটি উপাধি অর্পণ করেছিল। আর, মধ্যবর্তী সামান্য কয়েকটি ছেদ ছাড়া টানা তাঁর কর্মজীবন কেটেছে অর্থনীতির অধ্যাপনায়। তবু তিনি অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন এমন একটি বিজ্ঞান যার জমিন সমস্ত সামাজিক শৃঙ্খলার ধারক আর ছাদ আকাশের দিকে খোলা (১৯৫৮, ২২৯)। ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়েই এই বিজ্ঞান, যদিও ব্যক্তির চেয়ে, এযাবৎ, সমষ্টির প্রসঙ্গই সেখানে বেশি। কিন্তু সমষ্টি তো পরস্পরসাপেক্ষ ব্যক্তিরই যোগফল। সুতরাং দুটো ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে আমাদের এক, ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ—তার অর্জন ও অধিকার, দুই, পরস্পর সাপেক্ষতা। সমাজবিদ্যা এই পারস্পরিকতার প্রতি পক্ষপাতে হয়ে উঠেছে সমষ্টিরই বিজ্ঞান। শুধু পার্সোনালিটির উচিৎ চর্যার সঙ্গে যুক্ত করেই এই একপেশেমি থেকে মুক্ত করা সম্ভব (১৯২৫, ২৪৬)। এসব কথা বলেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ ১৯২০-এ, তাঁর প্রথম বই "পার্সোনালিটি এণ্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস"-এ। ১৯৩২ এ বেরোয় সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় বই "বেসিক কনসেপ্টস ইন সোশিওলজি"। "অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি" ১৯৪৫-এ। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর "মডার্ন ইণ্ডিয়ান কালচার" ১৯৪৮। আর "বক্তব্য" ও "ডাইভারসিটিস" যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ৫৮-য়। এছাড়া বিষয় ও সময়ের দীর্ঘপরিসরে ছড়ানো রয়েছে আরও অজস্র আলাপ, অভিভাষণ, সন্দর্ভ। সর্বত্রই তিনি খুঁজেছেন 'ব্যক্তির পরম প্রয়োজন', সকল সমাজবিজ্ঞানের 'মৌলিক তত্ত্ব' বা পার্সোনালিটি (১৯২৪, VII)।

১

পার্সোনালিটির ধর্ম ও রূপস্বরূপের আলোচনায় প্রবিষ্ট হবার আগে

ধূর্জটিপ্রসাদের সংজ্ঞায় ব্যক্তির অবস্থান কি বুঝে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা, এরই প্রতিতুলনায় তিনি নির্মাণ করবেন অন্য একটি সংজ্ঞা যার নাম পুরুষ বা পার্সন, আর একমাত্র এই পুরুষেরই আছে পার্সোনালিটি, ব্যক্তির নয়। "বক্তব্য"-র বিভিন্ন জায়গায় চূর্ণ ভাষ্যগুলি এরকম, সমবায়ী সংযোগী পুরুষই বাস্তব, ব্যক্তি অবাস্তব (ঐ, ২০)। ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড abstruction," বা বিমূর্ত ভাব, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে (ঐ, ৩২)। মার্কেন্টিলিজমের বিপক্ষে যে বিদ্রোহ মাথা তোলে তার দার্শনিক ভিত্তি আইডিয়ালিজম বা আদর্শবাদ, বার্কলের নয়, লক প্রভৃতির। তার মূল বক্তব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অবশ্য ইংরেজ সংবিধান অনুযায়ী (ঐ, ১২)। কিন্তু আমরা তো জানি অষ্টাদশ শতাব্দীরও ঢের আগে, এমন কি প্রাচীন সমাজে, সাংস্কৃতিক বিকাশের নানান অন্তর্বিরোধের ফলে ব্যক্তিত্ববাদের প্রাথমিক ধারণাগুলি উন্মুকুলিত হয়েছিল। সিনিক এবং সিরেনাইক দার্শনিক গোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে আমাদের, সামাজিক আচার ও প্রথাপ্রসঙ্গ সংসর্গ থেকে মানুষকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছিলেন যাঁরা ভোগ ও স্বচ্ছন্দের বিস্তারে। রেনেসাঁর আত্মতাসন্ধান তো ব্যক্তিত্ববাদেরই সীমা ছুঁয়ে এসে নির্বাপিত হয়েছিল। এনলাইটেনমেন্ট এর প্রবক্তারা বিমূর্ত ব্যক্তিকে দিয়েই শিলান্যাস করেছিলেন তাঁদের স্বপ্নসৌধের। সামাজিক অনুভবনের স্তরান্তর মুখেই, বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিত্ববাদের আরও স্পষ্ট আরও নিরূপিত প্রত্যয়গুলি জন্ম নেয়। স্বামিত্বের সাথে যা যুক্ত নয়, সত্তা তাকে স্বীকার করবে না তো কি। বলে ছিলেন দ্য ত্রাসি (de Tracy)। মাক্স স্টির্নার (Max Stirner)-এরও হতে পারতো ওকথা। সুতরাং, স্পষ্টতই, বিমূর্ত ব্যক্তি ঐতিহাসিক বিকাশের সূচনাবিন্দু হতে পারে না, তার ফল। পৃথক মানবিক সত্তারূপে ব্যক্তির অস্তিত্ব মানুষের সামাজিক ইতিহাসেরই সমসাময়িক। তাই আমাদের বিচার্য হবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংস্থানে ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক আর তারই প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি তথা পার্সোনালিটির বিবর্তন।

মার্কস তাঁর "গ্রুণ্ডরিসে ডেআর ক্রিটিক ডেআর পলিটিশেন অয়কোনোমি (রোহ্ এণ্টভুফ) ১৮৫৭-১৮৫৮" গ্রন্থে তিনরকমের বুনিয়াদি ঐতিহাসিক সোশ্যালিটি টাইপের কথা বলেছেন: ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্ক (personal dependence relations), বস্তুনির্ভর সম্পর্ক (material dependence relations) ও মুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক (relations of free individuals)। সমস্ত প্রাক্-ধনতন্ত্রী সংস্থানই প্রথম সোশ্যালিটি টাইপের অন্তর্গত। আদিম কমিউন সমাজ ও

প্রাকধনতন্ত্রী বৈরী সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তফাৎ যথেষ্ট। মাত্রাগতও বটে। তবু ব্যক্তির বিকাশের বিচারে তাদের মিল এক জায়গায়: সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে কৌম, কমিউন, বর্ণ, এস্টেট, গিল্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সংস্থাগুলির মধ্যস্থতা। দ্বিতীয় সোশ্যালিটি টাইপের মধ্যে পড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর তৃতীয় সোশ্যালিটি টাইপ হল সাম্যবাদী সমাজসংস্থান।

ক. ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্ক: যূথচারী প্রাণীরূপেই ইতিহাসে মানুষের প্রথম উপস্থিতি। প্রতিকূল প্রকৃতির মুখোমুখি হওয়া একক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তাই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীন বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। তখন কোন না কোন মানবিক সমবায়ের মধ্যেই মানুষকে তার অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে হয়েছিল। সমবায়ের সদস্যদের এই পারস্পরিক নির্ভরতাই ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কের গোড়ার কথা। এই সমবায় কখনও পরিবার, কোথাও কৌম, কোথাও কমিউন। ব্যক্তি এখানে এই সীমিত সমাজের অঙ্গ, অঙ্গীভূত ও প্রতিরূপ; জমি নামক উৎপাদনের মূল উপায় ও আয়ুধের সাথে একত্র ও ওতপ্রোত। মার্কসের ভাষায়: All forms (grown more or less naturally but at the same time also results of the historical process) in which collective existence implies subjects in a certain objective unity with their production conditions or certain subjective existence implies the collective existences as production conditions, necessarily correspond to limited development (limited in principle) of productive forces (ঐ,৩৯৬)।

এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদনোপকরণের সার্বজন্য মালিকানা উদ্ভূত হয়েছে। পরিবার, কৌম বা কমিউন তার স্বত্বাধিকারী, গোষ্ঠী সদস্যদের সহযোগী সম্পর্কের ফলেই যা সম্ভব। তাছাড়া প্রতিটি ব্যক্তি সদস্য হিশেবেই স্বাভাবিক উৎপাদনের উপায়গুলিকে নিজের বলে ভাবে। কিন্তু যেহেতু মালিকানা, মূলতঃ "the relation of the working (producing or self-reproducing) subject to the conditions of his production or reproduction as his own' (ঐ, ৩৯২), তাই উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে মালিকানারও হয় নানা রূপান্তর। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থায় শ্রমের বিশিষ্ট চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল মালিকানার এক জরুরি ও সঙ্গত ফলপরিণাম রূপেই দেখা দেয় শোষণ ও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার। অবশ্য ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কের সামাজিক চেহারায় কোন না কোন ভাবে ব্যক্তির কৌমসদস্য অক্ষুণ্ণ থাকে তখনও। কেবল

তার অবনয়ন ঘটে 'to the position of objective condition of production' অর্থাৎ দাস বা ভূমিদাসে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বার্থের দ্বৈরাজ্য টেনে আনে কর্তৃত্ব ও পারবশ্য। এবং তার জনন ও সংরক্ষণে নেমে আসে ধর্ম, ঐতিহ্য, আইন, অর্থনীতি ও রাজনীতির অজস্র অনুশাসন। অর্থনীতিনিরূপিত সামাজিক খণ্ডায়ন শুরু হয় গিল্ড, করপোরেশন আর এস্টেটে। প্রাক-ধনতন্ত্রী বৈরী সমাজ-ব্যবস্থার বর্ণবিভাগ কি অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেরই প্রচ্ছন্ন প্রকরণ নয়?

কিন্তু এসব ভাঙচুর, পরিবর্তনপ্রবাহ কিভাবে স্পৃষ্ট করছিল ব্যক্তিকে, পার্সোনালিটির ওপর রেখে যাচ্ছিল কোন ছাপ? প্রথমে দেখি ব্যক্তি তার আচরণচৈতন্যে কৌমকমিউনিটির অন্তর্গত। চেতনায় তার অখণ্ড সমবায়, আর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার ট্যাবু ও ট্র্যাডিশন। ব্যক্তি যেহেতু এই স্তরে সমবায় থেকে ছিন্ন নয় কিছুতে, ব্যক্তি বনাম সমাজের প্রশ্নই ওঠে না এখানে। কিন্তু কৌমী উৎপাদনের অভ্যন্তরে যখন শ্রমবিভাজন এলো, এলো ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিত্বের সামবায়িক বন্ধনও আলগা হয়ে গেলো। যদিও ঐতিহাসিক সেই স্বতন্ত্রবিধান কমিউনকেন্দ্রিক জনসংযোগ ধ্বংস করেনি তখনও, তবু ব্যক্তিকে আর কমিউনিটির অন্তর্গত বলা যাবে না কিছুতে। সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হল কোন একটা সামাজিক মণ্ডলীর ভেতর দিয়ে। যেমন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক: সে কেবল কমিউনেরই সদস্য নয়, এস্টেটেরও। এরই ভেতর দিয়ে সামন্ত তাকে শোষণ করে, অত্যাচার হানে এবং প্রত্যাহত হয়। কমিউন্যাল সংযোগগুলো একটা নতুন, জটিল সামাজিক সংযোগের বিন্যাস তৈরী করে, সংযোগের এই বাস্তব সমাহার থেকেই উঠে আসে ঐ সমাজে ব্যক্তির অন্তঃস্বরূপ।

খ বস্তুনির্ভর সম্পর্ক: মূলধন সঞ্চয়ের প্রাথমিক পর্বে যখন উৎপাদনের উপকরণগুলো উৎপাদকের হাতছাড়া হয়ে গেলো, বস্তুনির্ভর সম্পর্কের সূত্রপাত হল তখনি। এ এক নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক। কমিউন্যাল সংযোগ ধ্বস্ত। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যস্থতায় নামলো বিনিময়, পণ্যমূল্যের বিনিময়। পণ্যমূল্যের কায়িক রূপ হল পণ্যবস্তু। পণ্য যাঁরা উৎপাদন করছেন, সঞ্চালন করছেন যাঁরা, বিনিময়-মূল্য সামাজিক সম্পর্কের নৈর্ব্যক্তিক বাহকরূপে হাজির হল তাঁদের ভেতর। মার্কসের সংহত ভাষাস্থাপত্যে বস্তুনির্ভর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লো: The mutual and allsided dependence of individuals indifferent towards one another constitutes their social cohesion. This social cohesion is expressed in exchange value, through which the activity or

product of each individual becomes activity or product for the individual himself, he must produce a universal product—exchange value, and that is stated and individualised as money (ঐ ৭৪)। পণ্যমুখী উৎপাদনব্যবস্থায় কী উৎপন্ন হল সেটা বড় কথা নয়, নয় তার ব্যবহারমূল্য. বড় কথা হল, উৎপাদক এখানে তৈরি করে বিনিময়মূল্য বলে একটা জিনিশ যার মাধ্যমে অন্যান্য পণ্যোৎপাদকের সঙ্গে যে খানিকগুলো বস্তুনির্ভর সম্পর্কে বাঁধা পড়ে। কমিউনিটির আঞ্চলিকতা ভেঙে এ সম্পর্কই হয়ে ওঠে বিবিক্ত ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সম্পর্ক। ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কে ব্যক্তি ছিল সমবায়ের সামগ্রিক কায়িক শক্তির ভগ্নাংশ কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধিক শক্তির যুগপৎ পার্টনার ও প্রোপ্রাইটর। 'ব্যক্তিত্বের ভাঙন' প্রবন্ধে বলেছিলেন গোর্কি। তবু কৌমী সমবায়ে সুস্পষ্ট পার্সোনালিটির কথা অনৈতিহাসিক। প্রতিটি সমাজ, শ্রেণী, মণ্ডলী তার নিজের ছাঁচেই ব্যক্তির প্রতিমা গড়ে তোলে। কৌমও তার ব্যতিক্রম নয়। অনিশ্চিৎ জীবনযাত্রায় দরকার অবিচল যূথবদ্ধতা। এই সংহতির প্রশ্নেই কৌম গড়ে তুলেছিল এমন এক প্রশিক্ষণ যাতে ব্যক্তি তার স্বকীয় বিকাশের সন্ধানে আচরণ বা চৈতন্য, বস্তুগত বা আত্মিক কোনক্রমেই কৌমকেন্দ্র থেকে স্খলিত হতে না পারে। কিন্তু ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে—প্রাচীন, কৌলিক, সামন্তী বা গিল্ড গড়নে—বিনিময়ের উপায়উপকরণ যত বেশ বেশি সামাজিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে, উৎপাদনের বিষয়প্রকৃতি এবং উৎপাদকের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মিতিও তত ক্ষীয়মাণ হল। তারপর প্রাগ্রসর পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা এসে ব্যক্তিকে তার কৌলিক কুলায় থেকে উৎপাদন করে 'খণ্ডবিখণ্ডিত অবরোহী নির্ণয়াসক্ত ভাসমান শিকড়ছেঁড়া' পরমাণুতে পরিণত করলো। আবার পার্সোনালিটির পূর্বানুমানিক বাক্যটিও লেখা হল তখনি। মার্কস একজায়গায় বলছেন: The real intellectual wealth of the individual depends entirely on the wealth of his real connections (র স, খ ৫ ৫১)। শিল্পগত উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র স্থাপন করলো বিশ্বব্যাপী বাজার আন্তর্জাতিক সামাজিক জীবন, সর্বতোমুখী সংযোগ। কিন্তু এই বিপুল যোগক্ষেম' বাহিত হল মালিকানার ব্যক্তিগত প্রকরণে। ফলত সম্পর্কের আহরণে সাধারণ হল বঞ্চিত। একদিন বস্তুনির্ভর সম্পর্ক ব্যক্তিকে তার আঞ্চলিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে যে জগৎগত ও স্বগত অস্মিতার কথা বলেছিল, তার ভেতর এভাবেই লুকিয়েছিল সর্বস্ব আব্জে নেওয়ার মার্কেন্টাইল ভাবনাকুলার।

গ. মুক্তব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক: তাই ব্যক্তির অবাধ মুক্তির জন্য চাই অন্য এক

মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ এবং সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন। আদিম সাম্যবাদী যুগের মালিকানা ও তার পরবর্তী রূপান্তর (কমিউন ইত্যাদি) থেকে এর পার্থক্য দুটি। এক, এখানে সমস্ত সদস্য এর অংশভাক এবং দুই, উৎপাদিক শক্তির উৎকর্ষ এবং উৎপাদনের সামাজিকীকরণ এর বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ। সামাজিক মালিকানায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি স্বয়ং যেমন সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তেমনি সমাজও ব্যক্তির বিকাশে প্রকাশ করে অবিরল আগ্রহ। তাছাড়া ব্যক্তি বনাম সমাজের সংঘর্ষ চুকে যায় বলে, সামাজিক সংযোগের অফুরন্ত সম্পদ আহরণও হয় ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কণ্টক। সুষম বিকশিত পার্সোনালিটির রূপায়ন সাম্যবাদী সমাজনির্মাণের কাজে সহায়ক, আবার সেই প্রক্রিয়ার অন্তিম অভীষ্টও বটে। ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কে সমবায়ের মধ্যে ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে আপন সত্তা। বস্তুনির্ভর সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে চলে ব্যক্তির অণুভবন। কিন্তু মুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কের ব্যক্তি অর্জন করে এক কালেকটিভ পার্সোনালিটি। সামবায়িক যোগ, জীবন ও কর্মে সে কম্যুনিস্ট সঙ্ঘের সদস্য। আবার সমবায়ের অপরাপর সদস্যদের থেকে তার এক দ্যুতিময় স্বাতন্ত্র্যও বর্তমান। কম্যুনিস্ট কালেকটিভিজম্ তাই আদিম সমবায়ের প্রতিষেধের প্রতিষেধ। তার লক্ষ্য ব্যক্তিসত্তার বিলোপ নয়, আচরণ ও চৈতন্যে ব্যক্তির অবৈকল্য নয়, লক্ষ্য ব্যক্তির বৈচিত্র্য ও বৈভব। আদিম সমাজে সম্পদ ছিল বস্তুগত, যেমন সোনা, রুপো। ধনতান্ত্রিক সমাজে তার সাঙ্কেতিক রূপ টাকা। 'But in fact, when the narrow bourgeois form is cast aside, what is wealth other than the universality of the needs, capacities, enjoyments, productive forces etc of individuals that are generated by universal exchange ? The complete development of human domination of natural forces, both those of so-called 'nature' as well as those of his own nature ? What is but the absolute elaboration of his creative dispositions without any presupposition other than the previous historical development, which makes the totality of his development i.e., the development of all human powers as such and not measured against any already established yardstick, into an end in itself ? What is this, but a situation in which man does not reproduce himself in a determined form, but produces his totality ? Where

man does not seek to remain something that he has become, but is in the absolute movement of becoming (ঐ গুবিন্দে, ৩৮৭) ?' আর সম্পদের এই মানবিক প্রত্যয় কি পার্সোনালিটিরও সাধারণ বিকাশভূমি নয় ?

৩

বিভিন্ন সামাজিক চেহারায় ব্যক্তি নামক প্রজাতিক একটি এককের অবস্থান ও উন্নয়ন বিশ্লেষণ করলাম আমরা। কিছু দীর্ঘ হল আলোচনা। কিন্তু এখান থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদের 'পুরুষতত্ত্ব'কে বোঝা সুবিধের। আমরা আগেই বলেছি, ১৯২৭ থেকে '৫৮ তিন দশকেরও বেশি দীর্ঘ এই কালপরিমাপে তাঁর সমস্ত রচনা জীবনানন্দীয় অর্থে যে 'স্থির বিষয়'কে বারবার অপাবৃত করতে চেয়েছে, তা এই পার্সোনালিটি। তবু যেহেতু তাঁর বৌদ্ধিক সঙ্কট ও সংসর্গ নানা সময়ে প্রশ্নপরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে তাঁকে, নানান আবর্ত এনেছে নানা অভিঘাত, তাই তাঁর প্রত্যয়ও পেয়েছে নানা রূপান্তর। তাকে আমরা পারিমাণিক বলবো না গুণগত, সে প্রশ্ন পরের, আপাতত তাঁর পারিভাষিক সম্বন্ধে দু'একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "বক্তব্য"-র একজায়গায় ধূর্জটিপ্রসাদ : মানুষ হবে পুরুষ, সে একক ব্যক্তিসত্তা বা ইণ্ডিভিড্যুয়াল হবে না,—হবে 'পার্সন' (১৯৫৭,১৭) এবং আরেক জায়গায় : মার্কসবাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (Personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয় (ঐ, ৩৩)। দুটি উদ্ধৃতির প্রথমটি প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত। প্রতিজ্ঞায় যে 'পার্সন' শব্দটি রয়েছে তার জন্ম লাতিন Persona-য়, অর্থ নট এবং/অথবা মুখোশ, Hypostasis সমার্থক গ্রীক। শব্দদ্বয় আবার মর্যাদা এবং ভূমিকারও দ্যোতক, এবং গোত্রগতভাবে গ্রীক Ousia বা সদ্বস্তু (Substance) -র কাছাকাছি। তাই 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অতুল সদ্বস্তুই পুরুষ (A person is the individual substance of rational nature)' বোএটিউস (Boethius)-এর এই পুরুষসূক্ত মার্কিন বা ফরাসি পার্সোনালিজমের এত মনোযোগের বিষয়। বস্তুত সিদ্ধান্তে উল্লিখিত ঐ পার্সোনালিজম্ এক ধর্মধ্বজ ভাববাদী মতবাদ যার মূল বক্তব্য : পৃথিবীকে পাল্টানো নয়, ব্যক্তিকে বদলানো তথা তার আধ্যাত্মিক আত্মোন্নয়নই প্রধান সামাজিক কাজ। সুতরাং মার্কসবাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পার্সোনালিজমের ভেতর দিয়ে যে নয়, একথা প্রমাণ করতে ফয়েরবাখ বিষয়ক সূত্রাবলীর শেষ সূত্রটির সাক্ষ্য লাগে না। বরং ব্যক্তিকে যখন ধূর্জটিপ্রসাদ পুরুষে উন্নীত করেন তখন তাঁর পুরুষতত্ত্বের সঙ্গে পার্সোনালিজমের যোগাযোগ

আভাসিত হয় সহজেই। অবশ্য এর জন্য তাঁকে কোন অ্যালকট (Alcott) বা কোন রেনুভিয়া (Renouvier)-র দ্বারস্থ হতে হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই কবুল করেছেন : ভারতীয় সমাজ যতই ভেঙে পড়ুক না কেন সেটি এখনও অসংলগ্ন ব্যক্তিকণার জঞ্জাল হয়নি। তার আচার ব্যবহারে, তার সমাজনীতিতে, তার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এখনও এমন একটি মানবপ্রত্যয়ের আভাস মেলে যেটি ব্যক্তিত্বের চেয়ে পুরুষতত্ত্বের অনুকূল (১৯৫৭, ২৫)। কিন্তু ক'পৃষ্ঠা আগেই তিনি আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন : যুগোপযোগী পুরুষসংজ্ঞা সাংখ্যের পুরুষ কিংবা গীতার পুরুষকারের পুরুষ ঠিক নয় (ঐ, ১৮)। সমাজবৈজ্ঞানিক ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজরীতির মধ্যে যে-প্রত্যয়ের খোঁজ পেয়েছেন, তাকে তিনি সে দেশের দর্শনে পাননি, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই পরবর্তী বাক্যেই একটি সংকোচক অব্যয় : অথচ স্বেচ্ছায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্মচক্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ পুরুষকারের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। সেইজন্যই পুরুষ কথাটার ব্যবহার সুপ্রয়োগ (ঐ, ১৮)।

আস্তিক্য পার্সোনালিজমের পরমতত্ত্ব এক 'দৈবী পুরুষ' যাঁর নিরন্তর নিসৃক্ষা বিশ্বের পোষক। তাঁদেরও অভিষ্ট এক প্রমূল্য যার নাম পার্সোনালিটি। তাঁরাও বলেন, এই প্রমূল্যই তত্ত্বকে উপলব্ধি করায় ('key to the meaning of reality')। বেদান্তবিদ্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় প্রস্বরে আমাদের প্রায় এই কথাই শুনিয়েছেন :

ক. The individual may be and is often considered as unrelated to the Absolute, but personality of the individual is only understandable as a part of the Personality of the Absolute (১৯২৪,১৪৩)।

খ. Self is the potential Absolute and the Absolute may be considered not as a lonely unity, but as an organic unity in which individual selves realise themselves (ঐ, ঐ)।

গ. We believe in the complete Personality, the Absolute self to which we are developing and from which we cannot stand and we believe that the ethical values which alone can be appreciated in and through a group are the only means by which Personality can be developed (ঐ, ২৮)।

তিনটি উদ্ধৃতিই তাঁর "পার্সোনালিটি এণ্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস" থেকে। বইটি তাঁর ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েসের রচনা। মাত্র কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে তাঁর ছাত্রজীবন। তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাড়িতে আসর বসতো কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে ঘিরে অধ্যাপকদের। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আলোচনা হত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন। পাশে দাঁড়িয়ে শুনতেন ধূর্জটিপ্রসাদ। কৃষ্ণকমলের বেদান্তব্যাখ্যায় ছিল গাম্ভীর্য ও বিদ্যার সমন্বয়। যুক্তিনিষ্ঠা আর শৃঙ্খলা দিয়ে বেদান্তকে ভূষিত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। গৃহস্বামী রামেন্দ্রসুন্দরও 'বিজ্ঞানের পৌত্তলিকতা' থেকে সরে এসেছিলেন বেদান্তের 'সম্বিতে'। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সুরসিক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গণিতের অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে পড়তেন রহস্য কাহিনী। বেদান্ত তাঁকেও টেনেছিল। রচনা করেছিলেন "অভয়ের কথা" নামে এক অদ্বৈতদীপিকা। স্মৃতিচারণমূলক একটি রচনা থেকে জানতে পারি এই অসমোধ্ব´ আসরের প্রভাব তার জীবনে কত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল (১৯৫৭, ২৪৬)। রচনার অন্তঃসাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায় ১৯১৯ সালে তিনি পড়েন কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ১৯২২এ শুরু করেন ক্যাপিটাল। কিন্তু তখনই তাঁর মনে হয়েছে: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে পার্সোনালিটি যদি প্রতিযোগিতা ও স্বার্থ-স্রোতে বাহিত হয়, তবে সমাজতন্ত্রেও পার্সোনালিটি হয় অবহেলিত অথবা কালেকটিভ চৈতন্যের মিস্টিক প্রত্যয়ে আচ্ছাদিত (১৯২৪, ৮৬)। আশা করা হয় সর্বহারার একনায়কত্বে পার্সোনালিটির বিজয়সূচনা। কিন্তু প্রতিটি ধর্মই যেমন গুহ্যপ্রবণ, সমাজতন্ত্রের অতীন্দ্রিয়তাও তেমনি এটাই (ঐ, ৬৫)। প্রাকৃতিক নিয়মের পবিত্র তেপায়ার ওপর সমাজতন্ত্রীরা স্থাপন করেছেন এক ঐতিহাসিক সামান্যায়ন। শ্রেণীচেতনার জন্ম প্রমাণ করতে ইতিহাসের ঘটিয়েছেন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিকৃতি। ভাবা হয়েছে যেন ঐ শ্রেণীচৈতন্যই বুঝি ভাবী সুনীতিকল্যাণের জনক (ঐ, ৬৩) ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রমথ চৌধুরী ধূর্জটিপ্রসাদকে বলেছিলেন কোন কিছুতে ডুবে যেতে নেই। তিনিই তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন অনেকান্ত পার্সো-ন্যালিস্ট বের্গসঁর রচনায়। পরে বের্গসঁর খপ্পর থেকে বাঁচান। রাসেলের প্রভাব থেকে উদ্ধার করে ক্রোচে পড়তে বলেন তিনিই। মার্কস তিনি জানতেন না। এ-প্রসঙ্গে "মনে এলো"-র রোজনামচায় একটি কৌতুকী উক্তি: ওটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। ১৯২২ সাল থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। তবে এখনও নতুন ঘাসের খিদে যায়নি। একটু সরে দাঁড়িয়ে নিজের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখতে বেশ লাগে (পৃঃ ২২১)। বিস্ময়ের কিছু নেই, তাঁর এই বৌদ্ধিক

ওডিসি অনেক সময়েই তাঁকে করে তুলেছে সারসংকলক (eclectic)। কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার মৌলিক যোগসূত্র এড়িয়ে যায় তার অসাবধানী বিশ্লেষণ। বস্তুবাদ গৃহীত হয় ভাববাদে ('I start from the dynamic individual, the person developing towards the Absolute')। মার্কসবাদ মিশে যায় ভূয়োদর্শী সমালোচনায় ('the first reality of every man was himself')। Objectivismকে মনে হয় subjectivism এরই উলটো পিঠ—দুইই অলীক, দুয়েরই উৎস বাস্তব ও ভারসাম্য হীন মানসিক অবস্থায় (১৯২৭, v, ii, i)। তাছাড়া সারসংকলনশীলতায় কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে উদ্ভূত সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যাবলী ঘটনাসাযুজ্যে আধারিত হয় না। তাই ধূর্জটিপ্রসাদ একবার ভাবেন ব্যক্তির বিকাশের জন্য চাই সমাজের একটা উচ্চতর পর্যায়, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, যার অন্তিম লক্ষ্য, তাঁর ভাষায় 'free individuals functioning collectively in society and coming out of it as persons' (১৯৫৮, vii)। কিন্তু বাস্তব সমাজতন্ত্রে তিনি লক্ষ্য করেন সমবায়ের মধ্যে ব্যক্তির বিলোপ। ব্যক্তির চতুর্বর্গে পার্টির করক্ষেপ তাঁকে পীড়িত করে। পার্টি সদস্য ছাড়া সাধক ও সৃজনশীলতার সঙ্কোচনে তিনি ক্ষুব্ধ হন। এসব বক্তব্য "পার্সোনালিটি এণ্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস"-এর প্রায় এক দশক পরে লেখা "বেসিক কনসেপ্টস ইন সোসিওলজি" (পৃঃ ৫০) থেকে। কিন্তু এই সময়সরণি চেতনার কোন নতুন ভূখণ্ডে তাকে নিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা ভাবতে পারি না। পরবর্তী পর্যায়েও ভাবার অবকাশ কম। একটা উদাহরণ নেয়া যাক। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বোঝাতে বিভিন্ন সময়ের তিনটি উদ্ধৃতি:

ক The free man is the ultimate reality, for then he stands in and above relations, in and above values. He is the Absolute Self (১৯২১, ১৪৯)।

খ Personality posits a relation which is not versus relation. Its prepositions are in, through and out. In other words, personality emerges out by working in and through the given environment (১৯৪৫, ৭৩)।

গ. পুরুষবাদের তত্ত্বকথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকশিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোনো (১৯৫৭, ৩৩)। এ কোন্ ব্যক্তি (পুরুষ),

যা কোন বিশেষ সোশ্যালিটি টাইপের সন্তান নয়? এ কোন্‌ সমাজপ্রতিবেশ যার বিকাশ যুগপৎ ব্যক্তিরও বিকাশ নয়? আসলে সম্পর্ক ও সংস্কৃতির অবিরল উল্লেখ সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজ নিরূপাখ্য, ব্যক্তি স্থানাংকরহিত। দ্বিতীয়টিতে দিগ্বোধক একটি বাড়তি প্রিপোজিশন (through) ছাড়া তিনটি উদ্ধৃতি প্রায় একই সংবাদ বহন করে: সমাজের থেকে ঊর্ধ্বে উঠে, বাইরে গিয়ে বা বেরিয়ে এসে পার্সোনালিটি তার পূর্ণতা পায়। ঋগ্বৈদিক চতুরাশ্রমে ব্যক্তি একসময় সমাজধর্ম সাঙ্গ করে স্বধর্ম সাধনে লিপ্ত হয়। এ তার জীবনের চতুর্থ পর্ব বা সন্ন্যাস। শব্দাদি বিষয়পঞ্চক থেকে প্রত্যাহার করে নেয় সে ইন্দ্রিয়দের। তার স্থৈর্য ও অনাসক্তি সমাজের সঙ্গে তার একাত্মতা থেকে উত্থিত নয়, সাংহং উপলব্ধি থেকে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন এই পারমিতাই নাকি most aggressive assertion of Personality that can be imagined' (১৯৩২, ১৪৫)।

৪

বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আমরা দেখাতে চেয়েছি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এবং তার ক্রমিক রূপান্তর। বিষয় ছিল সামান্যে সীমাবদ্ধ। এবার অন্য একটা প্রশ্ন তুলবো আমরা। পার্থিবকতার প্রশ্ন একই সমাজপ্রতিবেশ কিভাবে জন্ম দেয় মানুষের এমন স্বতন্ত্র সমারোহ। প্রথম কারণটা নিশ্চিৎ জীববৈজ্ঞানিক। যে কোন দুটি মানুষের জেনেটিক গড়ন এক নয় কিছুতে। প্রত্যেটি জীব তাদের জীবকোষে বিশেষ এক গুচ্ছ আলেলেস (alleles) নিয়ে জন্মায়। বস্তুত জেনোটাইপের এই অফুরন্ত তহবিলই অসীম পার্থিবকতার বস্তুগত ভিত্তি। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। তার অস্তিত্ব ও বিকাশ প্রকৃতির সঙ্গে এক মিথস্ক্রিয়ায় বাঁধা। কিন্তু মানুষ আবার সামাজিক জীবও বটে। তাই সামাজিক আবহের আত্তীকরণ ব্যক্তিত্ব গঠনের অপর নাম মনে করা যেতে পারে। সামাজিক এসে আশ্রিত হচ্ছে জীববৈজ্ঞানিকে। শেষোক্ত পূর্বশর্ত কেবল পার্থিবকতার সম্ভাবনার জনক, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের জন্ম ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক আবহে এবং যে আবহে মানুষের জীবন ও ক্রিয়া আধারিত। ত্র্যবয়বী এই আবহে সমাজ, সামাজিক সংস্থান এবং ঐতিহাসিক কাল তার সাধারণ স্তর। বিশেষ স্তর হল জাতি, শ্রেণী এবং পরিবেশের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তর অণুপরিবেশ। এরই ভেতর দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে স্থাপিত হয় ব্যক্তির যোগ। এই প্রতিবেশই ব্যক্তির ওপর আরোপিত করে তার নিজস্ব আচার

ঐতিহ্য, সংস্কারপ্রথা নীতিপ্রমূল্য। তবু ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতার পেছনে শুধু জীববৈজ্ঞানিক পূর্বশর্ত নয়, সামাজিক আবহ নয়, এমনকি তাদের যৌথ সন্নিকর্ষ নয়, আরও একটা ব্যাপার থাকে যার নাম স্বগতক্রিয়া (Internal activity)। সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে ফেলে পার্সোনালিটির অধ্যয়ন করে বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞান। নারোদনিকরা বলে উঠেছিলেন ব্যক্তিকে এমন নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক ভূমিকায় স্থাপন করলে আসলে তাকেই সংহার করা হয়। কিন্তু রহস্যটা তো এই : সামাজিক সম্পর্কাবলীর অনুশীলনের মুখে বস্তুবাদী সমাজবাদ একই সঙ্গে অনুধাবন করেন ব্যক্তিকেও, যার স্বগতক্রিয়া থেকেই আবার সামাজিক সম্পর্কাবলীও ভূমিষ্ঠ হয়। সামাজিক পরিবেশ আর ঐতিহাসিক আবহের কেবল নিষ্ক্রিয় উপজাত নয় মানুষ। সোশ্যালিজেশনের অর্থও নয় এক চটজলদি সামাজিক কাঠামোর ভেতর ব্যক্তির অসাড় অভিযোজন। স্বগতক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ সামাজিক আবহকে আনকার ও আত্তীকৃত করে অন্তের থেকে এক স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে। অস্মিতা গঠনে বিষয় বস্তুর জটিল ডায়ালেক-টিকস এই স্বগতক্রিয়ার ভেতরে তার শেকড় খুঁজে পায়। একই পরিবেশ তাই বিভিন্ন ব্যক্তিকে আলোড়িত করে বিভিন্ন মাত্রায়। 'In memory of Count Heyden' প্রবন্ধে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন লেনিন : The slave who is aware of his slavish condition and fights it is a revolutionary. The slave who is not aware of his slavish condition and vegetates in silent, unenlightened and worldless slavery is just a slave. The slave who drools when smugly describing the delights of slavish existence and who goes into ecstasy over his good and kind master is a grovelling boor. (খ ১৬,৪০)। দৃষ্টান্তটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি অভিন্ন সামাজিক আবহে প্রাতিস্বিকতা তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হয়েও স্বগতভাবে কেমন স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব নামক ঘটনা তাই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত : জীব-বৈজ্ঞানিক পূর্বশর্ত, সামাজিক আবহ এবং বাস্তবতার প্রতি ব্যক্তির এক নির্বাচিত মনোভাব বা স্বগতক্রিয়া। সামাজিক আবহের আত্তীকরণ এবং সেই আবহে কর্মিষ্ঠতার অবাধ বিকাশই ব্যক্তির সোশ্যালিজেশন। আবার তা ব্যক্তির ইনডিভিজুয়ালিজেশনও বটে। ধূর্জটিপ্রসাদ তার নিজস্ব প্রত্যয় থেকে বলেছিলেন : Individualisation is interwoven with socialisation inevitably and the synthesis is Personality (১৯২৭,২৪৬)। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থান সোশ্যালিজেশন-এর বিভিন্ন সম্ভাবনা ও আবহ বহন করে। একমাত্র কম্যুনিস্ট সোশ্যালিটির অভ্যন্তরেই প্রাতিস্বিকতা যুগপৎ এক সমগ্র ও অখণ্ড অস্মিতায় প্রণীত হতে থাকে। ব্যক্তিও স্বতন্ত্র হয় তখনি। প্যাট্রিয়ার্ক ধূর্জটিপ্রসাদ কি তাকে ডাকবেন 'পুরুষ' বলে।

ধূর্জটিপ্রসাদ : ঐতিহ্য ও সাহিত্যের সত্য

জীবেন্দু রায়

কিছুটা অভিনিবেশশীল পাঠক মাত্রেই এ কথা স্বীকার করবেন যে মুক্তবুদ্ধির পরীক্ষা নিয়ে যারা শুরু করলেও আমাদের রেনেসাঁস দেশাভিমানকেই প্রাধান্য দেয়। অবশ্যই তা এক ধরণের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত মাত্রায়।

এই লিগাসি বিশ শতকের গোড়ায় এসে ঢিলে হয়েছে বলা যায়। অবশ্য সেটা আপাত হতে পারে। পুরাতন স্তবক বহু ব্যবহারে হয়ত অন্তর্লীন হয়ে গেলো। কিন্তু দৃশ্যমান চিত্রটি স্পষ্ট। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বা প্রচার আন্দোলনের সঙ্গে যদি সবুজপত্র বা কল্লোলের তুলনা হয় তাহলেই এ বোধ স্পষ্ট হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদ এই কালেরই কাছাকাছি একজন মানুষ। বীরবলের মন্ত্রদীক্ষা তাঁর কাছে নান্দীমুখ। অবশ্য তারও আগে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে পাঠ নেওয়ার ঘটনা তাঁর আত্মকথায় আমরা পেয়েছি। তাঁর 'মেথডলজি' অনুসরণ করার কথা তো তিনি অসঙ্কোচে বলেছেন। এই সব মানুষের আদিগন্ত জ্ঞান ও সহজ প্রজ্ঞা তো তাঁর কাছে এক পরম বিস্ময়। যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

এইসব মানুষই তাঁর মনকে সরস সতেজ করে তোলেন, একটা ডাইন্যামিক চরিত্র দেবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকলেরই দৃষ্টির মাত্রারও পরিবর্তন হয়। গল্পগুচ্ছের সোনার তরীর গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যের রবীন্দ্রনাথকে তিনি সবুজপত্রের যুগে বলাকার স্রষ্টা হিসেবে নতুন করে পান। গোরার সন্ধি-সমন্বয়ের কথা ধরে বাইরেকে শেষ পর্যন্ত স্থিতিলাভ করেনি। এখানকার আবহাওয়ায় নেতির সংক্রামণ ঘটেছে। রয়েছে সংশয় আর সংঘর্ষের অবকাশ। সবুজের অভিযান' তো স্তবপদের মতো। ধূর্জটিপ্রসাদ এ সময়ের বেশ কিছু পরে এসেই যোগ দেন। সংশয় আর গতিমান জিজ্ঞাসা তার কাছেও স্তবকের মতো। তাঁর লেখাতেই সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আরো আছে। যেমন বুদ্ধিবাদ এবং পার্সোনালিটির কথা। বুদ্ধিবাদের অর্থ বুদ্ধির পালোয়ানি বা কালোয়াতি কোনোটাই নয়। বুদ্ধিবাদের 'সৎ' অর্থ হলো ইচ্ছাশক্তির আপেক্ষিক গৌণতা, বুদ্ধির অবিসংবাদী প্রাধান্য এবং সেটা অবশ্য চরিত্রধর্মের দৃঢ়তা বাদ দিয়ে নয়। আর সে বুদ্ধির প্রকাশ

ঘটবে তর্কে, সে তর্ক কখনই এঁড়ে হবে না এবং তার মূল্যও দূরপ্রসারী। অন্তত প্রমথশিষ্যের কাছে। এ তাঁকে এনে দেবে আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে সম্যক্ মুক্তি।

ব্যক্তিস্বরূপের বিশিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিভিজুআল নয় প্যাশনই গুরুত্ব পেলো।

এ এক নতুন কমিটমেন্টের মতোই। লেখক কারোর বশ্যতা মানবে কেন? কর্মজীবনে এবং সাহিত্যিক জীবনে সে সর্বদাই মুক্তমতি, সমালোচনাপরায়ণ। সমালোচনার বিষয় সমাজ। উদ্দেশ্য সমস্ত রকম গতিহীন মূল্যবস্তু বা ভাবের সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম। এর বিপরীতটিই কাম্য বিদ্যমান। 'চিন্তয়সি' গ্রন্থের প্রসঙ্গে বারবার সেই 'বিপরীত' 'অসৎ' চিত্রটি তুলে লেখকের অভিনবত্বের কথা বলেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ পেশায় অধ্যাপক বলেই হয়তো সেই কথাটি তাঁর বেশি করে মনে হয়েছিলো। তাঁর কথা হলো অধ্যাপকদের যা হালচাল তাতে নতুন কিছু চিন্তাভাবনার অবকাশ কম। অধ্যাপক তো সবাইকে চিন্তা না করিয়ে তোতা বানাতে সচেষ্ট। কিন্তু উনি তা নন। বিজ্ঞান, মানবধর্ম, সমাজধর্ম, সাহিত্য বা দেশের কথা সব ব্যাপারেই তিনি পাঠককে চিন্তায় উৎসাহিত করতে ইচ্ছুক। বাক্যের নয়, চিন্তার উৎস খুলে যাক এই তিনি চান। চিন্তায় ঐকমত্য সব সময় বাঞ্ছিত নয়। তাতে লেবেল পড়ে যায়, বাঁধা পথ ধরে চলে সাধারণ জীব তৃপ্তি পাবে নিশ্চয়ই কিন্তু বুদ্ধিজীবীর কি লাভ?

মানুষ বোধহয় শান্তিস্বস্তির জন্য একটা সিদ্ধান্ত চায়। গুরু, ভগবান, অবতার গান্ধী এরিস্টটল, একোয়াইনাস, পোপ, সর্দার, ডিক্টেটর, আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, 'হুকুম্'—একটা না একটা তৈরী সিদ্ধান্ত পেলে অনেক আরাম। উইলিয়ম জেমস লেকচার দেবার সময় আবোল তাবোল বকে গেলেন, শ্রোতৃবৃন্দের একজন শেষে প্রশ্ন করলে তাহলে আপনার সিদ্ধান্তটি? জেমস উত্তর দিলেন, 'বিশ্বের কি অন্তিম-কাল এসেছে যে, আমাকে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতেই হবে?' এর মোদ্দা কথাটা হলো এই—সত্তা একটা প্রোসেস—স্রোত, Substance নয়। এই দুতাবজ্ঞানের আদিম প্রক্রিয়া ·· প্রোসেস মানে তো চলা? চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি— কিন্তু কতদিন মানুষ চরবে? শৃঙ্খলে বাঁধা গ্যালিস্লেভের অবস্থা মানুষের। সেও স্থির নয়, স্থাণু নয়, কিন্তু কার নৌকো কে চালায়? এলিস ইন ওয়ানডারল্যাণ্ডের ভুংপোক খাওয়ার মতন—কাফকার 'কে'র মতন।

উপরের অনুচ্ছেদটি ধূর্জটিপ্রসাদেরই 'মনে এলো' থেকে নেওয়া। একে বুদ্ধির

ধোঁয়া বলে গাল পেড়ে বা বিদ্রূপ করে নিরস্ত হওয়া যায় না। বলাকার ডায়নামিজম্, বের্গসঁর ক্রিয়েটিভ ইভলিউশনের অন্তর্লীন এক সহজ গতি এর কেন্দ্র বিন্দু। স্থিতির চাবিকাঠিটি পেয়ে গেলে সব অর্থেই আরাম হতো। কিন্তু তার আর উপায় কই। সত্তা তো আর নিড়বিড়ে স্থাবর কোনো সামগ্রী মাত্র নয়, সে একটা প্রক্রিয়া অর্থাৎ গতিময় কিছু। সুতরাং বুদ্ধির রাস্তায় আপ্তবাক্য আসবে কি করে? এর উল্টো ছবিটাও দ্রষ্টব্য। ইতিহাসের গতিকে উসকে না দিয়ে তার ব্রেক কষার চেষ্টাও কম হয় না। চালক যখন পথ পাননা বা যে পথে চালাতে চান, সেখানকার রাস্তা খোলা না পেলেই তো গাড়ি থামাবার কথা আসে। বুদ্ধিজীবী-দের এমন দুর্গতি হামেশাই ঘটে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন নতুন চিন্তা বা ধারণা নিয়ে 'বক্ বক্' না করলে তার নাকি আবার 'মাথা খোলে না।'

বুদ্ধির মোটরে ব্রেক কষার চিত্র কি কেবল এই? না, নয়। রাজনীতির দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন পুরাতনী ধ্রুপদী সাহিত্যের উপর লেবেল মেরে দেওয়া সেটা কি? সেটা একধরণের মূল্যায়ন এবং অবমূল্যায়নও বটে। এই অবমূল্যায়ন তাঁকে ব্যথিত করেছিলো। সেখানে তাঁর অবস্থান সরকারী মার্কসবাদীর থেকে স্বতন্ত্র। তিনি 'মার্কসোলজিস্ট' বলে নিজেকে দাবী করেছেন, 'মার্কসিস্ট' বলে নয়। সেই হেতুই রাশিয়া প্লেখানভকে গ্রহণ করেছে এতে তিনি খুশী। কিন্তু ডসটয়েভস্কি বাদ পড়েন কি সুবাদে। সেখানকার একজন সাহিত্যিককে ধূর্জটি এই ক্ষোভের কথা জানিয়ে বলেছিলেন, 'আবার আপনাদের দেশে আসব যেদিন দোস্তয়েভস্কিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দাগিয়ে দেওয়া বন্ধ করবেন। তাঁর মাহাত্ম্যকে এত সহজে এক সামাজিক সূত্রের মধ্যে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবার আপনারা তো সামলে উঠেছেন এবার তার রচনা নিয়ে সাহিত্যালোচনা করুন না?'

এই কনটিনিউইটির বোধ, ট্র্যাডিশন সম্পর্কে সচেতনতা কিন্তু হঠাৎ জেগে উঠেছিলো বলে মনে হয়না। দেশ সমাজতন্ত্রী হলে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে ত্যাগ করা বা গালাগালি দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট আশঙ্কা হয়েছিলো। এ জাতীয় আশঙ্কার কারণ অবশ্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিককার অহেতুক একবগ্গা উগ্রমূর্তি।

একই সঙ্গে স্টালিনের আলোচনায় তাঁকে নরম দেখায়। রবীন্দ্রনাথ, স্টালিন, জওহরলাল, গান্ধী, সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ এসব নাম তিনি একসঙ্গে উচ্চারণ করেন এবং বেশ অনায়াসে। শেষ দুজনকে তিনি বলেন বাংলার প্রদীপ। অরবিন্দের সঙ্গে তো তার রীতিমতো সুযোগ ছিলো দেখা যায়। অধ্যাত্মবাদী তিনি অবশ্য

নন, রসিক সমাজতত্ত্ববিদ্ মাত্র। যুক্তির উধ্বে' অনুভূতির সিঁড়ি তাঁর কাছে খুবই গ্রাহ্য। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কথা তো বারবারই আসে। বিবেকানন্দের কথা স্বতন্ত্র, অধ্যাত্ম অভিপ্রায় বাদ দিয়ে রামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকা সাধারণের কাছে সহসা ধরা পড়ে না। সাধারণ তাঁকে অর্ধেক দেবতা ভেবেই সুখী। ধূর্জটিপ্রসাদ এর মধ্যে গুটি কাটার সংকেত দেখেছিলেন সম্ভবত; অর্থাৎ একটা প্রচলিত ছককে ভাঙার চেষ্টা। তাঁর মূল্যায়ন সমাজসত্তার পরিপ্রেক্ষিতেই। এ সমাজসত্তায় প্লিবিয়ান প্যাট্রিশিয়ানের দ্বন্দ্বের কথা সকলেরই জানা। রিয়ালিটি বলে যা চালানো হয় তা এই 'প্যাট্রিশিয়ান'দের পক্ষে প্রযোজ্য রিয়ালিটি। বিশালতম অংশটিই বাদ। অথচ নতুন কালের তারাই নতুন শ্রেণী। মার্কসীয় বিদ্যায় অনুরাগী ধূর্জটি সেই ভবিষ্যৎকে পেতে চান। সেই ভবিষ্যতের জন্যে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা সামনে রাখতে পেরেছিলেন বলেই সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের নায়ক স্টালিনের মূর্তিটা জবরদস্ত ঠেকলেও পরিহার্য বোধ হয়নি। এ এক নির্মাণপর্ব, মহা-বিশৃঙ্খলার সময়—'ক্যাওস্'। কল্পনাকার আর রূপকারের দায়িত্বের তারতম্য অনেক। মাঝে মাঝে অপরিমেয়। শত্রুবেষ্টিত সোভিয়েৎ দুর্গকে রক্ষা করতে শক্ত মানুষ দরকার। এ সব কথা ধূর্জটি খুলে বলেননি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের সময়— এ হেন নায়কের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রুশ জনগণের মনে আনত নিশ্চয়তার আশ্বাস, স্টালিন-নিন্দায় কণ্টকিত আমাদের কালের কাছে এ সমস্ত বাক্যের অন্য আর কি অর্থ হতে পারে! একটা সামগ্রিক ইতিহাসসিদ্ধ বোধে এই সময় ও তার বহু-নিন্দিত নায়ককে তিনি দেখেছেন, 'ডিটেল্‌সে' নয়। তাই দুর্দান্ত নিষ্ঠুর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ দেশপ্রেমী মানুষটির খণ্ড খণ্ড সত্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে এক সামগ্রিক দৃঢ় প্রত্যয়। এও 'পুরুষ' প্রত্যয়। তবে তার পূর্ণতা 'ইন্‌ডিভিজুয়ালিটিতে' নয়, 'পার্সোনালিটিতে'।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সুভাষ অরবিন্দ এই দৃষ্টি থেকেই তাঁর কাছে বিচার্য হয়েছিলো। সে সমদৃষ্টি কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক।

তা বলে 'অ্যানথ্রপোমরফিজম্' নয়। সে তার দু চক্ষের বিষ। তিনি লিখেছেন অ্যানথ্রপোমরফিজমের মানুষ মানবধর্মের কেউ নয়। সমষ্টি বা সংহতির শক্তিকে উপলব্ধির অক্ষমতা থেকে এর জন্ম। উঁচু আর নীচু এই দুই শ্রেণীকে চিরন্তন করাতেই এর তথাকথিত ঐতিহাসিক মূল্য। এর সার কথা ভয় ও ভক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'পার্সোনালিটি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আমাদের সমস্ত পুজোআচ্চা অনুষ্ঠানের মধ্যে এই অ্যানথ্রপোমরফিজমের বিষ সংক্রামিত

হয়েছে। তার ফল মনুষ্যত্বের পূর্ণরূপের খণ্ডায়ন। তাঁর বক্তব্য এ ধারণা মহাত্মাজির উপরেও আরোপিত হয়েছিলো। তিনি হয়েছিলেন কল্যাণ ও স্বাধীনতার প্রতিমা বিশেষ। অনেকেই হয়ত এই প্রতিমা পুজোর কিছুটা সার্থকতা খুঁজে পাবেন, কারণ ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার অবকাশগুলি যে এর দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলো তাতে সন্দেহ কোথায়? যে পুরুষ প্রত্যয়ের কথা ধূর্জটি বলেছেন, মহাত্মাজীকে প্রতিমা খাড়া করায় তার হানি ঘটেছে। গণ্ডি থেকে বা গুটি কেটে ক্রমাগত বেরিয়ে আসা বা অতিক্রম করে যাওয়াতেই পুরুষের সার্থকতা। এ পুরুষ প্রত্যয় 'স্বঅধীন'। তার প্রসারণ আর আক্রমণে সমাজ-পরিধিও হতে থাকে ক্রমবিস্তৃত। সে ঐতিহ্য থেকে বিশ্লিষ্ট নয় কদাচ, আর তা তো তার শ্বাসরোধ করেনা, পরন্তু পুষ্ট করে। এই মানুষ ঐতিহ্যের ভার সমেত কখনও এগোয়, কখনও এ ভার কিছু বর্জন করে নতুন করে প্রয়োজনমত যোগও করে। এইরকম 'নিরবচ্ছিন্নতা' এবং 'ক্রমশঃ প্রকাশ্যতাই' পুরুষের একমাত্র স্বাধীনতা'। ভারতীয় জীবন চর্যায় যে মানবপ্রত্যয় আভাসিত হয়েছে তাতে এই পুরুষত্বেরই সমর্থন কমবেশী।

এই ঐতিহ্যের বোধ সক্রিয় থাকে যখন তিনি কাব্যতত্ত্বের ব্যাপারে কিছু নতুন প্রকল্প বা প্রতিজ্ঞার কথা বলেন 'অথ কাব্যজিজ্ঞাসা' রচনায়। শশিবাবুর আলোচনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। 'শিল্পলিপি'তে গতশতাব্দীর সাহিত্য এবং একালের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ দাশগুপ্ত উৎপাদন সম্পর্কের কথা এনেছিলেন। মানসিক বিচ্ছিন্নতা তথা এলিয়েনেশানের একটি মার্কসীয় ব্যাখ্যাও আলোচিত হয়েছিলো। তাছাড়া কাব্যপ্রত্যয়ের আরো নানা কথা। ধূর্জটিপ্রসাদের এই রচনাটির মধ্যেও মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি আস্থারক সমর্থন আছে। লেখাটিও শশিবাবুর লেখার অনেক আগের।

এখানে একটু অন্য কথা বলতে চাই। সেটি হলো ছকে বাঁধা সাহিত্যের কোনো খড়সা মার্কস বা এঙ্গেলস রীতিসম্মতভাবে প্রস্তুত করেন নি। এটি আসলে তাদের অনুগামীদের তৈরী। মার্কস এঙ্গেলস যা বলেছিলেন তা পছন্দঅপছন্দের কথা। এ ব্যাপারে তারা যথোচিত নম। যদিও তাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববীক্ষার দর্শন পরিত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।

তবে তাঁদের পছন্দ অপছন্দ কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার মাত্র নয়। এবং সেই হেতু পুরোনো সাহিত্য বাতিল করার কথাও আসতে পারে না। এখানেও তাঁরা দ্বান্দ্বিক অর্থনীতি তথা দ্বান্দ্বিক দর্শনেরই অনুগামী। যেমন ব্যালজাকএর

কথা। আঠারোশ অষ্টাশি সালের এপ্রিল মাসে মার্গারেট হকিন্সকে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে ব্যালজাক তাঁর বিচারে খুবই বড়ো মাপের শিল্পী। তাঁর 'কমিডি হিউমেন'কে এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ধরা যায়। আঠারোশ পনের সালের সামন্তবাদের পুনরভ্যুত্থানের পর যখন পুরোনো ফরাসী রীতিনীতি আবার চলিত হলো, তখন এর উপর পাল্টাভাবে আঠারোশ ষোলো থেকে আটচল্লিশ এই বত্রিশ বছর মোটামুটিভাবে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাপের কথা সময়ক্রম ধরে বর্ণনা করে ব্যালজাক ফরাসী সমাজের এক আশ্চর্য জীবন্ত ইতিহাস চিত্রিত করেছেন। অথচ ব্যালজাক নিজে হলেন রীতিমতো রাজতন্ত্রবাদী, এই সামন্ত সমাজই তাঁর আদর্শ। সেই আদর্শ সমাজই শেষ পর্যন্ত হতমান হয়েছে, এই ইতিহাসসিদ্ধ কথাগুলিই বলেছেন ব্যালজাক। যাঁদের জন্য তাঁর অপরিমেয় সহমর্মিতা, নিজের অগোচরেই তাদের শোকগাথা লিখেছেন তিনি।

এটা আসলে সেই গুটি কাটার সঙ্কেত। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, ছিদ্রহীন অচলায়তনে অন্তত গবাক্ষপথে সূর্যালোক আনার বন্দোবস্ত। সেই কথাই এঙ্গেলস বলেছেন কবাকুং অন্য ভাষায়। তার মতে ব্যালজাক নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েই ভাবীকালের প্রকৃত মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। এটা আসলে বাস্তবতারই চূড়ান্ত জয়। এ বাস্তবতা অনড় সাবেকী কোনো পদার্থ নয়। দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসা একটি নতুন এবং অনিবার্য সত্য। এই সত্য বলাই বাহুল্য শিল্পী সৃষ্টি করেন না, তিনি তাকে শিল্পসম্মতভাবে সর্বজনগোচর করেন। শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ না করে ব্যাখ্যা করেন।

এই দৃষ্টিতেই এঙ্গেলস দেখেছেন ইবসেনের নাটক। সমাজপরিপ্রেক্ষিতকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্যই দেখেছেন সমকালীন য়ুরোপের পেটিবুর্জোয়ার তুলনায় নরওয়ে দেশের পেটিবুর্জোয়ার প্রকৃত স্বতন্ত্র। সে হলো স্বাধীন কর্ষণজীবীর উত্তরপুরুষ। ফলে পেটিবুর্জোয়া হলেও তার চরিত্রের মর্যাদা অনেক উন্নত ধরণের। তাছাড়া অচলায়তন ভাঙার প্রশ্নও তো আছেই। এখানেও শেষ পর্যন্ত ভাবীকালের প্রত্যয়ই জয়যুক্ত হচ্ছে। ভাবীকালের প্রত্যয় বলতে ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক উদ্যম।

এখানেই প্রশ্ন আসে পদ্ধতি বা প্রকরণ নিয়ে। সে ব্যাপারেও এঙ্গেলস অতীব স্বচ্ছ। আঠারোশ পঁচাশিতে মিন্না কাউৎস্কিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন উদ্দেশ্যমূলক কাব্য বা শিল্পের বিরোধিতা তিনি করবেন না। এস্কাইলাস, আরিসটোফিনিস, দান্তে বা সারভেন্তিস কারোকেই তাঁর উদ্দেশ্যবর্জিত স্রষ্টা বলে

মনে হয়নি। মূল কথা হলো ঝোঁক বা পক্ষপাতিত্ব পরিস্থিতি ও চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে আসা উচিত। সেক্ষেত্রে করতে হবে তিনটি কাজ। এক— পারস্পরিক সম্পর্কের যথাযথ বর্ণনার সহায়তায় সেগুলির সম্পর্কে সুপ্রচল ভ্রান্তির সম্যক অপনোদন, দুই—বুর্জোয়া জগতের অহেতুক প্রত্যাশাবোধের অপসারণ এবং তিন—চলিষ্ণু সামাজিক ব্যবস্থায় নশ্বরতা সম্পর্কে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি। সবচেয়ে বড়ো কথা এজন্য লেখকের কোনো বিশেষ পক্ষে যোগ না দিলেও কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্তু তার আলোচনা অন্যভাবে শুরু করেছেন। যদিও লক্ষ এক। ইতিমধ্যে একটি বিপ্লব এবং তজ্জনিত পরিবর্তিত সমাজপ্রকৃতি তাকে এ ব্যাপারে খানিকটা পরিণত করে তুলেছে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটেই তিনি এসব কথা ভেবেছেন।

যেমন সাধারণের রুচির প্রসঙ্গ। যে কারণে সাহিত্য-স্রষ্টা শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই লোক, সে কারণে শ্রেণী হিসেবে সাধারণ স্বতঃই বাদ পড়ে। তাঁদের ধারণা মহৎ সামগ্রী মহৎ মূল্যে উপভোগের ক্ষমতা সাধারণের নেই। তাঁরা যাকে সমঝদার শ্রেণী বলে গণ্য করেন তা আসলে মুষ্টিপরিমাণ একটা অস্তিত্ব বিশেষ। বৃহত্তর সাধারণের রুচিহীনতা যে আছে এ অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু সে হলো কেবল উপস্থিত কালের পক্ষে তাৎক্ষণিক প্রযোজ্য কথা। এই অনস্তিত্বকে সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করতে হবে। যে শক্তির সহায়তায় এত পরিবর্তন ঘটবে তা আদতে একটি সামাজিক শক্তি। সমাজের মধ্যে তা এখনও প্রচ্ছন্ন। অন্যদেশে পুরোনো শৃঙ্খলা ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়ছে এবং সাহিত্যের রূপগত পরিবর্তন ঘটছে। তরুণরাও অবশ্য এসব কিছুর হোতা।

এই সূত্রেই প্রস্তাব, আমাদের সমাজসত্তার মর্মমূলে প্রবেশ করতে হবে। সবাই জানেন সমাজসত্তা কোনো শ্রেণীবিশেষের সামগ্রী মাত্র নয়। আর একে বিশ্লেষণ করে বোঝানও একটু শক্ত। তবে এটি সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ যে কৃষকই বৃহত্তম অংশ। সমাজসত্তার কেন্দ্রও সেই। পরিবেশ দেখে এসব ভাবনাচিন্তা স্বাভাবিক-ভাবেই আসছে যে একটা বিরোধ কিছু না হযেই যায় না। তবে সব দেশের ইতিহাস যান্ত্রিকভাবে অন্ধভাবে অপর দেশের ইতিহাস অনুসরণ করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। বিরোধের ফলে সমাজসত্তার স্থির কেন্দ্রকটি আমাদের দৃষ্টিভ্রষ্ট হতে পারে। অতএব সাহিত্যস্রষ্টা বা শিল্পী সাবধান। আধুনিককাল কল্লোল কালিকলমের ঢাক পেটানোয় যে তথাকথিত রিয়ালিজম হৈ হৈ করে বাজার গরম করছে, ধূর্জটির

বক্তব্য, তা প্রায়শই সমাজসত্তার যথার্থ জ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে।

সমাজের তথাকথিত পণ্ডিত ও বক্তিতেরাই সব। বাঁচতে চাওয়া, বাঁচার মত বাঁচা এসব এযুগের দাবী। তাছাড়া সেই বহু ব্যবহৃত কথা, 'নতুন উৎপাদন শক্তির তাগিদে সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক সত্তার গঠন পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচার-ব্যবহারের প্রভেদ ও সংঘাতই হলো সাহিত্যের প্রকৃত সত্তা। একথাও লেখক বলেছেন, প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করা যতো কঠিন তার থেকে অনেক বেশী কঠিন মানুষের সম্বন্ধ ও স্বভাবকে জয় করা।

এদেশে সাহিত্য অন্তত জনসাধারণের নয়। যে সৃষ্টি করে তার শ্রেণীই বিশেষ করে এর উপভোক্তা। সমাজ যে ভাঙছে যে নতুন করে গড়বার সংবাদ নিয়ে আসছে তার সম্পর্কে সে পাশ ফিরিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আজকের এই ভাঙাগড়ার শক্তির যে নায়ক সে শ্রেণীবিরোধই হোক বা বিজ্ঞানই হোক তাকে ব্যবহার করতে হবে। একে এড়ালে আজকের পক্ষে সবচেয়ে সত্য সাহিত্যের সৃষ্টি হবে কেমন করে? ইতিহাসকেও ব্যবহার করতে হবে। ইতিহাস তো সেই পুরোনো মর্মর চিত্রমাত্র নয় আজ, ইতিহাসে সমাজসত্তার নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

সত্য সাহিত্যের সৃষ্টি নতুন সমাজসৃষ্টিসাপেক্ষ। আর নতুন সমাজসৃষ্টিতে তাঁদেরই অংশ বেশি, ধূর্জটিপ্রসাদের মতে যাঁরা জমির সঙ্গে যুক্ত। বাঙালী মুসলমান-দের দায়িত্বও একটু বাড়বে। আর তাছাড়া নতুন সমাজসৃষ্টিতে হিন্দুমুসলমান সম্পর্কও যথার্থতার ভিত্তিতে বাঁধা পড়বে। অহেতুক অনেক কিছু আবরণ আপনা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। নতুন সমাজসত্তা সৃষ্টি হলে নতুন সাহিত্যসৃষ্টিও সহজ হয়ে আসবে।

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিলো উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের এপ্রিল সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায়। ভারতবর্ষে সাহিত্যিক কমিউনিজমের তত্ত্বগত চর্চার সেটা একরকম আদিযুগ বললেই হয়। তখন এসবই নতুন ঠেকেছে, মন্দ তো নয়ই। যেমন সুরেন ঠাকুরের 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'—বক্তব্য, কলুষ আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্পর্শ করবে না। কেননা তাঁরা সব ব্যাপারটার মূলেই নাকি কুড়ুল মেরেছেন! সাহিত্যতত্ত্ব বা জিজ্ঞাসাতেও সেই দ্বান্দ্বিক তথা বিশ্বদর্শনের প্রয়োগ সম্ভাব্যতা নিয়েও ছক বাঁধাবাঁধির রীতিমতো চেষ্টা চলছিল। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব বা সুধীন দত্তরা এসব অবশ্য উচ্চভাষ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তারাশঙ্কর এ ব্যাপারে খুব বড়ো মাপের কাজ করেছেন কিন্তু সে তো মার্কসবাদ ভালো না বেসেই। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে দীক্ষা বা অনুরাগ কোনোটাই তাঁর ছিলো না। অথচ ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা বা সন্দীপন

পাঠশালার মতো মহামূল্য জীবন-কাহিনী তিনি রচনা করেছেন।

সর্বহারার দারিদ্র্যদূরীকরণ বা শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সাহিত্যসৃষ্টি অবশ্যই হয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বও ছক মাফিক। থিওডোর কমিসার-জেভ্‌স্কি তাঁর 'দ্য থিয়েটার অ্যান্‌ড্‌ এ চেন্‌জিং সিভিলিজেশন্‌'-এ স্পষ্টত লিখেছেন, যাঁরা বলেন নাট্য-শিল্প বিশুদ্ধরস-পরিণামী ব্যাপার, এর সঙ্গে নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই তাঁরা একেবারেই ঠিক বলেন না। আরও শোনা যায়, আধুনিককালে লেখা কোনো বই-ই যথার্থ ভালো হতে পারে না, যদি না তা মার্কসপন্থী মনোভাবে লেখা হয়। আর একটি রচনার নাম করছি। ফ্রিম্যানের 'প্রলেটারিয়ান লিটারেচার ইন্‌ ইউ এস-এ'। সেখানে তিনি লিখেছিলেন শিল্পকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে, প্রলেটারিয়েট একে অস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করবেন।

আরও একটি প্রাসঙ্গিক রচনা 'দ্য ডেসট্রাক্‌টিভ্‌ এলিমেন্ট'। রচয়িতা স্পেন্‌ডার। সেখানে অবশ্য প্রলেটারিয়ান শিল্পী শ্রেণী হিসেবে স্বতন্ত্র। তিনি অবশ্যই দ্বন্দ্বতত্ত্বে বিশ্বাসী বস্তুবাদী হবেন। সৃষ্টিশীল শিল্পকলা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধর্মেই সেখানে নির্মিত হয়ে উঠবে।

এসব একটু অতিকথন হয়ে গেলো। হয়তো বা বাগাড়ম্বরও। কিন্তু একটি জিজ্ঞাসা থাকে। সেটি হচ্ছে, তত্ত্ব না হয় তৈরী হলো, কিন্তু প্রয়োগ? টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ কি ছকে ছাঁচে তৈরী হয় নাকি? সৃষ্টিতত্ত্বের মূল প্রবর্তনা কোথায়, আর তার প্রকাশের নির্মাণের অসাধারণত্বই বা কিসে আসে তা মোটামুটি অজ্ঞেয়। পরিবর্তিত সমাজসত্তার উপরে বড়ো জোর শলোকভ তৈরী করা গেছে, গোটে ডস্‌টয়েভস্কি হয়নি। লেবেল আঁটা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাই এখনও অনিশ্চিত ও পরীক্ষাধীন। ম্যানিফেস্‌টোয় আর্টিস্ট তৈরী হয়না, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মী অবশ্য হয়।

সাহিত্যতত্ত্বের এই নতুন সংজ্ঞা নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ পরে তাই বোধহয় তেমন উৎসাহবোধ করেন নি। 'মনে এলো'-তে তার প্রমাণই আছে। ভেবেছেন নতুন কিছু তৈরী হওয়া অত্যন্ত অবশ্য দরকার। কিন্তু সেটা সৃষ্টির ধর্ম অনুসরণ করেই আসুক। আধার ট্রাডিশনালই থাকবে, কথা তো আধার নিয়েই। কাউৎস্কিকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিতেও সেই কথাই রয়েছে। নতুন সমাজসত্তা সাহিত্যিকের কাছে কিভাবে এবং কতখানি সার্থকভাবে ধরা দেয় সেটিই দেখবার।

ধূর্জটি তাঁর নিজের শিল্পকর্মেও এসব তত্ত্বকথা হুবহু মানেন নি। তিনি মেথড-শক্তির ভক্ত এবং সেটা প্রকরণে রূপনির্মিতে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি স্বাধীন

থাকতেই চেয়েছেন। তাঁর রিয়েলিজ্‌ম্ রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলো। অবশ্য ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণে তিনি আরও সাম্প্রতিক ও বহুরঙা। সব মিলিয়ে তাঁর গড়নটাই ছকের বাইরে। সেইজন্যেই বাঙালী আইডেনটিটির জন্য প্রচ্ছন্ন বেদনা এবং গর্ব! এসব তাঁর বড়ো প্রিয় প্রসঙ্গও বটে।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ যথোচিত বিনয়ী। যেটার স্বভাবত আমরা সচরাচর দেখি। ঝোঁক থেকে তৈরী হয় দল, দল থেকে দলাদলি। একে অপরকে কটুকথা। যেমন বুদ্ধদেবের অহেতুক কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ, বিষ্ণু দের বিরক্তিকর নিষ্ফল বামপন্থীপনা। ধূর্জটি কিন্তু নম্র। মার্কসবাদে ঝোঁক তার ধ্রুবকের মতো। স্বভাবের সঙ্গে সহজভাবে তাকে মিশিয়ে নিতে চেয়েছেন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটা সীমাবদ্ধতার বোধ তার মধ্যে জাগ্রত ছিলো। আগেই বলেছি ইন্‌টেলেকচুয়াল শ্রেণীর কোনো মহৎ গঠনাত্মক ভূমিকা অন্তত ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি খুঁজে পান নি। এদেশের অভিমানবেরা কেউই তথাকথিত ইন্‌টেলেক-চুয়াল নন। সাধারণের শ্রদ্ধাও তাই এখানে সমর্পিত নয়। দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা আর উপেক্ষার। তাছাড়া এও তিনি খুব স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন এদেশের (সব দেশেরই) বুর্জোয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির সবটাই ফণীমনসার বন নয়। তার গরিষ্ঠ অংশটাই বাংলাদেশের পলিমাটির মতো। ঠিকমত কর্ষণ করলে নতুন কালের ফসল তার থেকেই উঠবে। নতুন সমাজসত্তা বা সমাজব্যবস্থা তো ভুঁইফোড় কিছু নয়, পুরোনোর বীজ বিদীর্ণ করেই তার সম্ভাব্যতা। প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে তাকে গাল দেওয়া তাই অর্থহীন। সবচেয়ে বড়ো কথা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার মন জুড়ে। এদেশের মাটিতে এত বড়ো মানুষ তিনি আর দেখেন নি।

ধূর্জটিপ্রসাদের রবীন্দ্রবিচার

শঙ্খ ঘোষ

বাংলায় যে ভালো সমালোচনা নেই, এটা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নাকি ধূর্জটিপ্রসাদকে একবার বলেছিলেন: 'তোমরা সমালোচনার মর্যাদা বাড়াও। ভদ্রতা তোমরা রক্ষা করবে জানি। তবে এমন লোককে ধরো যে ভর সইতে পারে।'

এই পরামর্শ নিশ্চয় সব সময়েই মনে রেখেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, আর আমাদের সাহিত্যিক মানবিভ্রম (fall of standard) নিয়ে নিজেও তিনি বিলাপ করেছেন অনেক সময়ে। তাই জীবনের একটা বড়ো সময় জুড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেই কথা বলেছেন বারবার, হয়তো এইভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর নিজস্ব একটা মান। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ছিলেন 'ভর সইবার' মতো লোক, বিশেষত তিরিশের যুগে আধুনিকতার মুখোমুখি দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথকে নূতনভাবে বিচার করে দেখবার একটা দায়িত্বই ছিল সেদিনকার সাহিত্যভাবুকদের। সেই পটভূমিতে, ধূর্জটিপ্রসাদ কীভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁর দেখা রবীন্দ্রনাথকে, তা একবার ভেবে দেখা যায়। ডায়েরিধর্মী বিভিন্ন লেখার টুকরো তাঁর মন্তব্যগুলিতে, অথবা Tagore— a Study নামে তাঁর ক্ষীণ কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বইখানির মধ্যে, রবীন্দ্রসমালোচনার অভাবগুলি কি মেটাতে পারছিলেন তিনি?

এ নিয়ে বিচার করবার আগে অবশ্য জানা চাই কোন্‌গুলিকে তিনি ভাবছিলেন অভাব। মানবিভ্রমে গ্রস্ত এই দেশে রবীন্দ্রনাথকেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে মেনেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তবে সেইসঙ্গে মেনেছেন তাঁর সীমাও। লক্ষ করেছেন, সাহিত্যের রসবিচারেই সময় চলে গেছে রবীন্দ্রনাথের, তাঁর সমালোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্ত 'আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী, impressionistic'। বাংলা সমালোচনাকে নির্দিষ্ট এই সীমার বাইরে নেবার অন্যতম এক উপায় হতে পারে টেকনিকের বিচারে, অন্তত ধূর্জটিপ্রসাদের ছিল এইরকম বিশ্বাস। আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতাকেই তিনি মনে করেন সাহিত্যের আচার বা স্ট্যাণ্ডার্ড। সমালোচনাতেও যেমন সেই সচেতনতার অভাব দেখেন তিনি, তারাশংকরের মতো কারো কারো

সৃষ্টিকাজেও দেখেন সেই অভাব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও মনে হয় যে 'তাঁর sense of construction' নেই। এটা তাহলে আশা করা যায় যে, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমালোচনায় বুঝতে চাইবেন সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণকে, টেকনিকের বিচারের মধ্য দিয়ে পাঠকদের তিনি নিতে চাইবেন ভিন্ন ধরনের একটা রসবোধে, পাঠক হিসেবে আমরা খানিকটা সাবালক হয়ে উঠব তাঁর রবীন্দ্রবিচার জেনে।

রবীন্দ্রসমালোচকদের মধ্যে দ্বিতীয় এক অভাব দেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ, সে-অভাব সমগ্রবোধের। 'যে-পাঠকের মনে কোনো-না-কোনো মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার নকশা স্থিরভাবে প্রতীয়মান হয়নি, তার পক্ষে রবীন্দ্রসমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র'— বলেছিলেন তিনি, 'বক্তব্য' বইতে। সমগ্রবোধ বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন, সেটা অবশ্য বিবেচনাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ বিচিত্র আর বিস্তারিত বলে তাঁর কোনো এক খণ্ডাংশের আলোচনাই হয়তো করতে হয় আমাদের, কিন্তু সে-আলোচনা হতে পারে প্রতিমুহূর্তে সমগ্রের দ্যোতনা মনে রেখেই। এমন নয় যে, সমস্ত খণ্ডাংশকে যোগ করে তৈরি হচ্ছে এই সমগ্রতা। এ কোনো যোগফল নয়। দেখতে হবে এইভাবে যে, সেই সমগ্র কেবলই ধরা দিচ্ছে প্রতিটি খণ্ডের মধ্যে। দেখবার এই প্রয়োজনে গানের জগৎ এসে মিলে যায় কবিতার জগতে, ছবির জগৎ এসে মিলে যায় গানের জগতে। তখন আর 'কেবল কবিতার সাহিত্যিক বিচারে চলবে না', তখন তার মনে হয় যে 'যেখানে কবিতা সংগীতের কোলে মূর্ছিত হচ্ছে তার সন্ধান দিতে হবে'।

সমগ্রের এই সন্ধান বা টেকনিকের বিচারের আগেও একটা কথা থাকে অবশ্য। কথা থাকে সমালোচকের নিজস্ব জীবনবোধ বা সাহিত্যবোধের। কোন্ মূল দৃষ্টি থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ ধরতে চাইবেন তার রবীন্দ্রনাথকে? কী আমরা আশা করব তার কাছে? কবিতার আলোচনা দিয়েই কবিতা বিচার সম্ভব, স্পেংলারের এই মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, 'কবিতার আলোচনাটা কি? তার মধ্যে থাকে নিশ্চয়ই কবিতা, কিন্তু তার সঙ্গে আশেপাশে রয়েছে সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি।' সাহিত্যবিচারের ভিত্তিতে এই সমাজতত্ত্বকে বড়ো একটা মর্যাদা দিতে চান ধূর্জটিপ্রসাদ, কিন্তু কীভাবে একে কাজে লাগাবেন তিনি? সে কি স্পষ্ট কোনো মার্ক্সবাদী ভূমিকায়? 'আপনাকে সকলে মার্ক্সিস্ট বলে জানে' একথা আমরা শুনেছি বটে 'আমরা ও তাঁহারা'র তাঁহাদের মুখে। ডায়েরিতেও ধূর্জটিপ্রসাদ কবুল করেন যে তাঁর জীবনে মার্ক্সিজমের প্রভাব বেশি, মার্ক্সিজম ছাড়া অন্য কোনো

অর্থনীতিতে বিশ্বাস নেই তাঁর। কিন্তু তবু, নিজেকে মার্ক্সিস্ট না বলে মার্ক্সোলজিস্ট বলতেই পছন্দ করবেন তিনি, 'আমরা ও তাঁহারা'তেও আছে সেকথা, আছে 'ঝিলিমিলি'তেও। সেটা চেয়েছেন নিশ্চয় এইজন্যে যে মার্ক্সিজমে অনেক সময়ে 'ভাব ও কার্যগত উপকারিতা প্রচুর হলেও থিয়োরির দিক থেকে তার মূল্য নেই' বলে মনে হয় তাঁর, পপারের মতোই। মার্ক্সবাদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেও তার বিষয়ে আপত্তি তুলবার একটা পথ খোলা রাখেন তিনি, 'রাশিয়া-চীনের ইকনমিক্স' পুরোপুরি মানতে পারেন না, আমাদের দেশের কম্যুনিজমের 'সাদা সরলভাবে বুঝতে চাওয়া' নিয়ে দুঃখ করেন বেশ, ডক্টর জিভাগোর প্রশস্তি করতে পারেন, এবং লক্ষ করেন যে 'কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক সাধারণত ভীষণ গোঁড়া হন।... তাঁদের সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি মত-শুদ্ধতার চাপে বিভ্রান্ত হচ্ছে।' ফলে, সাহিত্য-শিল্পে সমাজমানসকে আশ্রয় করতে চাইলেও, বিশ্লেষণের এবং বুদ্ধিবিচারের একটা প্রভাব দাবি করলেও, প্রথানুগত কোনো মার্ক্সবাদী দৃষ্টি নয় তাঁর।

২

একেবারে শেষের ওই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে 'আমরা ও তাঁহারা'র প্রধান বক্তার মুখে। এখানে ভিন্ন ধরনের প্রশ্নও ওঠে একটা। ওকথাটি কি সত্যি সত্যি ধূর্জটিপ্রসাদের? 'আমরা ও তাঁহারা'র আমি কি পুরোপুরি তিনি নিজেই? সেই-রকমই ধরে নিতে অভ্যস্ত আমরা, এ-বইতে উত্তম পুরুষের উচ্চারণগুলিকে আমরা তাঁরই সাহিত্য বা সমাজ-বিষয়ক, জীবন বা রবীন্দ্র-বিষয়ক ভাবনা বলে জানি, 'বক্তব্য' 'ঝিলিমিলি' বা 'মনে এলো'র বিচ্ছিন্ন চিন্তার সঙ্গে কখনো কখনো আক্ষরিক ঐক্য হয় এর, যেমন আছে মার্ক্সোলজিস্ট শব্দটি দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয়ের মধ্যে। কিন্তু লেখক তো জানান আমাদের, 'আমরা ও তাঁহারা'র দুইপক্ষই হলো সেই মধ্যশ্রেণীর জীব যাদের 'দম, জান্ ও শাঁস ফুরিয়েছে', শ্লেষবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে যাদের দোষগুণ ইঙ্গিত করতে চান তিনি। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেও নিশ্চয় সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত, কিন্তু শ্রেণীটিকে তার ক্ষয়ের পথে লক্ষ করবার মুহূর্তে তিনি ঈষৎ বাইরে দাঁড়িয়ে বিচার করছেন তার, 'রক্তকরবী' নাটকের অধ্যাপক যেমন করেছিলেন। অধ্যাপকের কথার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কাজ করছিল একটা আত্মসমালোচনা, যে-সমালোচনার শক্তিতে শেষ পর্যন্ত তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নিজের গণ্ডির বাইরে, পুথিপত্র ফেলে দিয়ে প্রাণের সঙ্গ নিতে পারেন শেষ পর্যন্ত। ধূর্জটিপ্রসাদও নিশ্চয় 'নিজের সঙ্গে নিজের, নিজের সঙ্গে তোমার, নিজের সঙ্গে পরের বাক্যালাপ, তর্কবিতর্ক'

থেকে এগোতে চাইছেন কোনো সামাজিক মুক্তিবোধের দিকে, ব্যক্তির রুদ্ধতা থেকে মুক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যিনি বিচার করছেন, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে নানা মন্তব্য করছেন যিনি, তিনি ঠিক কোন্ ধূর্জটিপ্রসাদ? 'দম, জান্ ও শাঁস ফুরিয়েছে' যে-মধ্যশ্রেণীর, তাঁর রবীন্দ্রবিচারে কি শুধু সেই শ্রেণীগত মনটিকেই পাওয়া যাবে? না কি পাওয়া যাবে সেই মানুষটির মন, যিনি দূরে দাঁড়িয়ে জানেন যে ওই মধ্যশ্রেণীর মূল্যবোধের ওপর কিছু-আর নির্ভর করা যায় না আজ?

'অন্তঃশীলা'র খগেনবাবুর কথাটাও এখানে একবার ভেবে দেখবার যোগ্য। খগেনবাবুর চিন্তা ভাবনা কি ধূর্জটিপ্রসাদেরই ব্যক্তিগত পরিচয়? বইটি প্রথম ছাপা হবার পর ইন্দিরাদেবী লিখেছিলেন, 'নায়কের পুস্তকপ্রীতি থেকে আরম্ভ করে দুর্গন্ধ-ভীতি, সুগন্ধপ্রীতি, চা-সিগারেটপ্রীতি, এমনকি রমাপ্রীতিও লেখকে আরোপ করতে কেন যে ইচ্ছে হয় বলা শক্ত।' ইন্দিরাদেবীর অন্য অনেক অভিযোগের সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন ধূর্জটি, কিন্তু এই ইচ্ছেটির বিরুদ্ধে তিনি লেখেননি কিছু। লেখেননি সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য নিয়েও যে, 'অন্তঃশীলা'র মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজ্ঞাপনের ব্যর্থ চেষ্টা'। অসাধারণ আর ইতর সাধারণ, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে খগেনবাবু বা ধূর্জটিপ্রসাদ আছেন অসাধারণ অল্পসংখ্যকের দলে, এভাবেই বুঝেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। 'অন্তঃশীলা'কে তাঁর মনে হয়েছিল আত্ম-চরিত মাত্র, যে-আত্মচরিতে খগেনবাবু নায়ক হলেও 'মুখপাত্র স্বয়ং গ্রন্থকর্তা'।

এইজন্যেই হয়তো দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন করে একটি ভূমিকা লিখতে হলো লেখককে। তাঁকে বলতে হলো 'একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া।' স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হলো যে 'এর মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেরণা।'

'আমরা ও তাঁহারা'র ইনটেলেকচুয়ালদের কথাও যে-ভাষায় বলেছেন এর লেখক, প্রায় সেই ভাষাই আবার উঠে আসছে খগেনবাবুর পরিচয়ে। খগেনবাবুর সাহিত্যরুচি আর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে প্রায়ই মিল হয়ে যাবে 'আমরা ও তাঁহারা'র আমি-পক্ষের! আবার সেইসঙ্গে এও সত্যি যে সে-রুচির টান পৌঁছবে 'বক্তব্য' বা 'ঝিলিমিলি', 'মনে এলো' বা 'Tagore—a Study'র মধ্যেও। জ্ঞানত যে-মনকে ক্ষয়িষ্ণু বলে জানেন আমাদের লেখক, অন্তরে সেই মন থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে তাহলে মুক্তি পান না তিনি। ইতিহাসের নিয়মেই যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দ্বিধা, 'নিজের সঙ্গে নিজের' কথোপকথনের এই ক্রমিকতা। এই দ্বিধার

পটভূমিটুকু মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব যে, এ-কারণেই তাঁর আলোচনা বা বিচারের মধ্যেও কখনো কখনো ঘটে যেতে পারে আদর্শ আর সিদ্ধির সামান্য-কিছু ব্যবধান।

৩

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পান যখন গানের বিচারে পৌঁছন তিনি, যখন লক্ষ করেন কথা আর সুরের সম্পর্ক। টেকনিকের বিচার বলতে কতদূর তিনি বোঝেন, তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত থাকে তাঁর সাংগীতিক বিশ্লেষণে। গান যে একটা রিভিলেশন, রবীন্দ্রনাথের এই কথার ঈষৎ-প্রতিবাদে ধূর্জটি বলতে চান যে এর 'revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing' আর অবিরাম গতিশীল এই উন্মোচনের সত্যটি বোঝাবার জন্য ছায়ানটের আলাপ নিয়ে এক অনুপুঙ্খ বিবরণ দেন তিনি। আবেশময় রসোপভোগে নয় এসব বিবরণ চলে একেবারেই এক পারিভাষিক স্তরে, যেমন: 'প্রথমেই সা'রে গ' ম' প' প' রে' গ' ম' রে' সা' নেওয়া হল, তার পর আরোহীতে সা'রে রে'গা গা'মা মা'পা' নিয়ে ধৈবত আন্দোলিত করে গলা ওপরের সুরে পৌঁছল, অবরোহীতে ওই প্রকার শুদ্ধ স্বরগুলি ব্যবহার করে পা' রে' গা' মা' পা' এই মিড়টি নিয়ে রিখাবে গলা থামল— কোনো স্বরই বিবাদী হল না। তবু কি ছায়ানট গাওয়া হল? আমার মতে এখনও হল না, হল কেবল ছায়ানটের blue printটুকু, ডিজাইন-টুকু।' সাধারণভাবেই তাঁর গানের আলোচনা এমন একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই খুশি হয়ে তাঁকে লিখতে পারেন রবীন্দ্রনাথ: 'রবিঠাকুর যে সঙ্গীত রচনা করে থাকে ছাপার অক্ষরে এই তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল।'

নানা শিল্পরূপ কীভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে ধূর্জটিপ্রসাদের চেতনায়, এরও একটা ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে তাঁর গানেরই আলোচনা। সুরের উন্মোচন ব্যাখ্যা করবার জন্য অনায়াসে তিনি চলে যান চীনেদের scroll painting-এ, রাজপুত কলম কি বা টিনটরেটোর ছবিতে, শেক্সপীয়র বা বার্নার্ড শ'র নাটকে, প্রুস্ত বা জয়েসের উপন্যাসে। এমনকী, এর সঙ্গে তিনি নিয়ে আসেন লেনিনেরও এই তত্ত্ব যে quantity থেকেই qualityর বদল হয়। 'সংগীতে লেনিন!' সম্ভাব্য এই বিস্ময়ের উত্তরে তিনি বলবেন, 'কেন নয়? তিনিও দার্শনিক ছিলেন, তিনিও দর্শন বলতে making history বুঝতেন, interpreting it নয়, তাঁরও মন গতিশীল ছিল।' এইভাবে, এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পের সম্পর্কপ্রতিষ্ঠার মধ্য

দিয়ে, শিল্পের এক সামাজিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে, আমাদের বোধের একটা মাত্রাবদল হতে থাকে, আর মাত্রাবদল থেকে চরিত্রবদল।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনা যখন গানের সীমা ছেড়ে সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথে পৌঁছয়, তখন ছবি গান কবিতা নাচের বুননকে ঠিক এতখানি ঘনতায় কি আর ভাবতে পারেন তিনি? সেরকমই যে ভাবতে চান, তার একটা ইঙ্গিত মেলে Study*-র অধ্যায়কল্পনার মধ্যেই। 'শিল্প আর কবিতা' 'উপন্যাস আর গল্প' 'নাটক আর গান' 'ছবি আর নাচ'—এইভাবে চলে আসে তার অধ্যায়ক্রম। 'ছবি আর নাচ'? এই শেষ বিভাগটি একটু চমকে দেয় পাঠককে। নাটক আর গানের সূত্রেই আসতে পারত নাচেরও কথা, এটা বোঝা যায়। 'From drama to music should be an easy step for one who writes on Tagore', লেখকের এই মন্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে ইচ্ছে করে যে গান থেকেই বরং নাটকের আলোচনাতে পৌঁছবার একটা সুযোগ ছিল বেশি, আর তেমনি আবার, নাটক থেকে নাচে। কিন্তু নাচ-গান-নাটকের প্রচলিত সম্পর্ক ছাড়িয়ে যখন ছবি আর নাচকেই একাধ্যায়ী করে নেন লেখক, আমাদের আশা একটু বেড়ে যায়। সে-আশা আরো বেশি উসকে ওঠে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য বিষয়ে আকস্মিক এই মন্তব্য দেখে যে, এখানে সুর ছবি আর নাটকীয়তার একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। কোথায় এবং কীভাবে সেই সামঞ্জস্য, তার কোনো নির্দেশ থাকে না অবশ্য, মন্তব্য কেবল মন্তব্যই থেকে যায়, কোনো আঙ্গিকবিচারের মধ্য দিয়ে কথাটিকে প্রতিপন্ন করবার আর দায় নেন না তিনি, পারস্পরিক বিচারের সুন্দর এক সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায় হঠাৎ। নাচ আর ছবি যে কবির শেষ দশকের নেশা, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো ভাবুকের লেখাতেও এটা বিচ্ছিন্ন একটা তথ্যমাত্র হয়ে থাকে। এ-দুই শিল্পের মধ্য দিয়ে কোনো রেখারূপের টান বড়ো হয়ে উঠেছিল কিনা তাঁর অন্তিম বছরগুলিতে, এর আর কোনো বিচার মেলে না এখানে। তাই তাঁর অধ্যায়নামগুলিতে সংযোজক অব্যয়টি কেবল দুটি অংশের যোগচিহ্ন হয়ে থাকে, দুয়ের সম্পর্কসংঘাতে তৃতীয় কোনো সত্তা পায় না তারা।

টেকনিকে যাঁর আগ্রহ, এই সম্পর্ককে তিনি আরেকটু গূঢ়ভাবে দেখলেন না কেন? এ কি তাঁর সেই দ্বিধারই কোনো প্রকাশ? না-দেখার ফলে, নাটক আর নাচ খানিকটা দূরত্বে ছিন্ন হয়ে থাকবার ফলে, অন্য একটা সংকটও তৈরি হলো। রবীন্দ্রনাথের যে-নৃত্যনাট্য আমাদের কাছে পৌঁছয় একেবারে নতুন এক শিল্পরূপ

* Tagore—a Study, ধূর্জটিপ্রসাদের এই বইটিকে এ-প্রবন্ধে এর পর শুধু Study বলা হবে।

হিসেবে, তার সামাজিক আর শৈল্পিক তাৎপর্য তো ধূর্জটিপ্রসাদেরাই ঠিকভাবে বোঝাতে পারতেন একদিন। এঁদেরই ছিল সেই অন্তর্লীন সামর্থ্য। অথচ এই রূপটিকে তেমন বিবেচনায় লক্ষ করলেন না বলে 'নটীর পূজা' আর 'নটরাজ'কে ধূর্জটি বললেন নৃত্যনাট্য, 'চণ্ডালিকা'র সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চার্য হলো 'তাসের দেশ'! 'নটীর পূজা' বা 'তাসের দেশ' রচনায় নাটক আছে, আছে এক বা একাধিক নাচেরও প্রয়োগ, কিন্তু নৃত্য আর নাটকের এই যোগটুকুকেই তো নৃত্যনাট্য বলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। নৃত্যনাট্য নৃত্য আর নাটকের যোগফল নয়, এ হলো তার গুণফল, একথাটা আমাদের লক্ষ্যে রাখা উচিত। অথচ আজও পর্যন্ত 'তাসের দেশ' বা 'শাপমোচন'এর মতো রচনা যে নৃত্যনাট্য অভিধাতেই চলছে এদেশে, এর একটা কারণ নিশ্চয় শিল্পাঙ্গিক বিষয়ে আমাদের ধারণার শোকাবহ শিথিলতা। এইটা আঙ্গিকচেতন হয়েও সে-শিথিলতা থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের মুক্ত করতে পারেন না শেষ পর্যন্ত। আঙ্গিকের এই বিচারে নিজে তিনি সবসময়ে খুব সতর্ক নন বলে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'র মধ্যেও দেখেন 'রাজা ও রাণী' বা 'বিসর্জন'-এর তুল্য 'flexible dramatic verse', সুর আর সুরহীনতার প্রভেদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন করেন না এই দুই যুগলকে, লক্ষ করেন না গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যবিকাশের যথার্থ ইতিহাসটিকে।

নতুন শিল্পরূপের দিকে যোগ্যভাবে এগিয়ে দেওয়া সমালোচকের একটা বড়ো দায় নিশ্চয়। কেবল নাটকে নয়, উপন্যাসেও যখন রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলছিলেন স্বতন্ত্র নানা গড়ন, সব পাঠকের পক্ষে সহজ ছিল না তার আস্বাদন। এ আস্বাদনেও কি ধূর্জটিপ্রসাদ তেমন কোনো সাহায্য করছিলেন আমাদের? নিজের উপন্যাসে যিনি দেখান যে 'অন্তঃশীলা গার্গীর ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়', বলেন যে সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়', তিনি কি বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে গল্প ছেড়ে দিকে দিকে এগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও? গানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যিনি নিয়ে আসেন 'গোরা' আর 'চার অধ্যায়'-এর তুলনা, প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত প্রসঙ্গ, উপন্যাস বিচারের সময় তার গুরুত্ব কিন্তু একেবারেই ভুলে যান তিনি। ভুলে যান উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ রূপবিচারের কথাও, আর তাই 'গোরা'-র সঙ্গে প্রভেদ দেখাতে গিয়ে এক করে নেন 'চোখের বালি' আর 'চতুরঙ্গ'-র মতো দুই মেরুর দুটি রচনাকে, বলেন: 'Structurally, Chokher Bali and Chaturanga are much stronger though their body is thinner'' একেবারে এক নূতন রীতি ধরতে

চেয়েছিল যে 'চতুরঙ্গ', তাকে কি 'চোখের বালি'-র বন্ধনীগত করে বিচার করা সঙ্গত? এর 'compactness, its tension, its unity of design' যে একে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস করে তুলেছে, চকিত এই মন্তব্যটি থাকে বটে লেখায়, কিন্তু কাহিনী বর্ণনায় যত দীর্ঘ সময় নেন, তার সামান্য একটা খণ্ডও ব্যবহার করেন না সেই সংহতি বা চাপের কোনো বিচারে, শ্রেষ্ঠত্বের কোনো নির্ণয়ে। অথচ, 'চতুরঙ্গ' নিশ্চয় দাবি করতে পারত তেমন-কোনো বিশ্লেষণ।

এটা অবশ্য ঠিক যে কবিতার কথায় তাঁর লক্ষ্য থাকে ভাব আর রূপের সমগ্রতায়, কবিতার ইতিহাস তাঁর বিবরণে হয়ে ওঠে ছন্দোমুক্তির ইতিহাস। পয়ার ত্রিপদীর শুকনো কাঠামোটিকেও ভেঙে দেখান সেখানে, বোঝান প্রবহমানতার কাজ, দেখান 'বলাকা'-র ভাষা আর ছন্দ তৈরি হবার পর বাংলা কাব্য কীভাবে জটিলতম অনুভবের প্রকাশে যোগ্য হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ছন্দোমুক্তি যে ঘটল কবিতার বিষয়মুক্তিরই দাবিতে, অল্প অবসরে সহজেই সেকথা দেখাতে পারেন তিনি। 'আমি' আর 'না-আমি'র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে বাস্তববোধের দিকে এগিয়ে আসতে চান রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সেই প্রগতির সঙ্গে ধূর্জটি মিলিয়ে দেখেন কবিতার ভাষা বা ছন্দের প্রত্যক্ষতা স্বচ্ছতা আর সংহতির চাহিদা। এর মধ্য দিয়ে কবির ব্যক্তিত্বকে যে সমগ্রতায় ধরতে চান ধূর্জটিপ্রসাদ, সেইখানে আছে তাঁর সমালোচনার যথার্থ আদর্শ। কিন্তু একথা মানতে হয় যে, সে-আদর্শ থেকে প্রায়ই স্খলিত হয়ে পড়েন তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গে পৌঁছে।

৪

সমগ্রকে বুঝতে হবে লেখকের চেতনাগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে। একইসঙ্গে যিনি লিখেছেন কবিতা নাটক গল্প গান, এঁকেছেন ছবি,—তাঁর সেই বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি-কোনো মূল স্বভাবই তো উদ্গত হয়ে উঠতে চায়, একটি-কোনো ঐকাত্ম্য চেতনা। বিভিন্ন এই প্রকাশরূপগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে ভাববার একটা অর্থ আছে বটে, কিন্তু সে-অর্থ সত্যিকারের মর্যাদা পায় যখন সবকিছুর মধ্য দিয়ে কেবলই সেই কেন্দ্রীয় চেতনাটিকে ছুঁতে পারি আমরা।

সে-চেতনাকে ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চয় বুঝতে চাইবেন এক সামাজিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে। বিচারপদ্ধতি ঠিক করবার সময়ে বলেই নেন তিনি: 'all criticism is at the first instance natural and sociological'. অর্থাৎ টেকনিকের আলোচনাও অর্থবহ হয় কেবল তখন, যখন তা কোনো সামাজিক

ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার প্রকাশ হিসেবে মূর্তি নেয়। নিছক ছন্দবিশ্লেষণের জন্যই ছন্দ আলোচনায় কোনো মহিমা নেই। সমাজমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের টানাপোড়েনে কোন্ বিশেষ মূর্তি ধরছে ছন্দ, তারই আলোচনা কবিতাবোধের পক্ষে হতে পারে প্রাসঙ্গিক। যেমান, সমস্তরকম রূপের বিচারের প্রশ্নে এই কথাটাই চলে আসে সামনে : জীবনের কোন্ দৃষ্টি থেকে অনিবার্য হয়ে উঠছে এই রূপ।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আর সামাজিক ভাবনা নিয়ে একটি অধ্যায় থাকে তাঁর বইতে। বইটির সূচনায় যখন জীবনবৃত্তান্ত বলেন তিনি, অথবা আলোচনার পদ্ধতি স্থির করে নেন যখন, সেসব সময়েও লেখকের চোখের সামনে থাকে সামাজিক পট। আর. বিচার শেষ করে আনবার সময়ে আরো একবার বিবরণ দেন তাঁর দৃষ্টির, ইতিহাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে যান অল্প কথায়। তপোবনের ভারতবর্ষ থেকে গ্রামশহরের ভারতবর্ষের বোধ, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবলতা আর তার পেষণে সমাজ, জাতীয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল, কোরীয় যুবকের সঙ্গে আলাপচারিতে শোষিতের অভ্যুত্থান বিষয়ে স্পষ্টতর ধারণা, রাশিয়ার অভিভব : এসব নিয়ে গড়ে ওঠে অনতিদীর্ঘ সেই অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যে স্পষ্ট ছিল না খুব, সে-কথার উল্লেখ থাকে সেখানে ; ইঙ্গিত থাকে নারীমুক্তি বিষয়ে তাঁর অসম্পূর্ণ ধারণার। সামাজিক যে পরিবেষ্টনের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি, তার অনিবার্য ফল হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-স্বভাবে দেখা দিয়েছিল নানা আত্মাবরোধ, ধূর্জটিপ্রসাদ দেখান তা। এই সবই বলেন তিনি, কবিতা বা কাহিনীর বিচারে কখনো ব্যবহারও করেন এর। অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে প্রমথনাথ বিশী পর্যন্ত সমালোচকেরা যে ব্যক্তিজৈবনিক শুষ্ক কাঠামোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখছিলেন এতদিন, তার থেকে একটা ভিন্ন মান মিলল এখানে, এ নিশ্চয় বলা যায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে, এ মানের প্রয়োগ ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় একেবারে সর্বাত্মক হয়ে আসে না। Study'র সপ্তম অধ্যায়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-নৈতিক দৃষ্টির কথা, আর তার ঠিক আগের অধ্যায় হলো ছবি আর নাচের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে স্যুরিয়ালিস্টদের 'অটোমেটিং রাইটিং'-এর তুল্য নয়, সেকথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, তবু তাকে তিনি মিলিয়ে দেখেন কেবল অবচেতনের সঙ্গে, 'সে' আর 'খাপছাড়া'র খামখেয়ালের সঙ্গে, 'প্রান্তিক'-এর মৃত্যুবোধের সঙ্গে। তখন, অল্প সময়ের জন্য তিনি যেন ভুলে যান এর সময়ের হিসেব। এই বিবরণ থেকে মনে হতে পারে যেন ১৯৩৭ সালের কাছাকাছি সময়টুকুই ছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকবার একমাত্র সময়। অবচেতন আর মৃত্যুশঙ্কাকে এতটা প্রাধান্য না দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ

ছবির এই শিল্পকেও হয়তো দেখতে পারতেন তার বিশ্বনৈতিক সংকটবোধের সঙ্গে যুক্ত করে, লক্ষ করতে পারতেন যে কেবল 'প্রান্তিক' নয়, কয়েক বছর আগেকার 'শিশুতীর্থ'কেও মিলিয়ে নেওয়া যায় তাঁর নূতন ওই শিল্পরূপটির সঙ্গে। হিংস্র আদিম বর্বর যুগ ইতিহাসে বুঝি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে আবার, এই সাময়িক আশঙ্কাগুলি থেকে কখনো কখনো যে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর ছবি আঁকবার ইচ্ছে হতো তাঁর, ছবিকে আরেকটু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেখলে ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চয় লক্ষ করতেন তা। কিন্তু এইখানে, ছবিকে তিনি বিচার করেন প্রায় যেন সময়ের বাইরে রেখে।

তেমনি করেন নাটককেও, কখনো-বা। এটা বেশ বিস্ময়জনক যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বলতে গিয়ে লেখক এড়িয়ে যান সেই তিনখানি নাটক, রাষ্ট্রিক আর সামাজিক ভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বময় স্থাপনা আছে যেখানে। 'রক্তকরবী' নাম ওঠে বটে চকিতে, 'pamphleteering on the stage' অভিধা দিয়ে ছেড়ে দেন তাকে, কিন্তু একেবারেই ওঠে না 'মুক্তধারা' বা 'কালের যাত্রা'র নূতন পদক্ষেপের কথা। অথচ, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ আর অপূর্ণতা, দুটোই নিশ্চয় দেখানো সম্ভব ছিল এই নাটকগুলির ভাবনাবিচার থেকে। ইতিহাসের সংকট বিষয়ে 'Tagore's diagnosis was not Marxist' এটা যেমন ঠিক, তেমনি ঠিক এই তথ্য যে প্রতিদিনের জীবনে আমাদের শ্রেণীদ্বন্দ্বের অনেকগুলি উগ্র ছবি প্রকট হয়ে আছে 'রক্তকরবী'র মতো নাটকে, এমনকী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইশারা আছে 'কালের যাত্রা'র মতো রচনায়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনভাবনার সঙ্গে এই রচনাগুলি কীভাবে যুক্ত হয়ে যায়, ধূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সেটা। নাটক আর নাচ-গান-ছবির জন্য যেন দরকার নেই ব্যাপক সেই সামাজিক বোধের, লেখক যেন ভাবছেন যে অংশত কবিতা আর অংশত উপন্যাসের মধ্য থেকেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রকৃতি, দেখানো যাবে সেই চিন্তা কীভাবে রূপায়িত হয়ে আসে শিল্পে। সমালোচক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ যেন ইতস্তত কয়েকটি দিকনির্দেশ মাত্র রেখে যান, তার ব্যবহারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে জরিপ করে দেখেন না আর।

৫

দার্জিলিঙের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে 'বক্তব্য' বইটিতে। রবীন্দ্রনাথের কোনো রাজনৈতিক বক্তৃতা নিয়ে অনেকরকম পারস্পরিক সংলাপের পর, চিত্তরঞ্জন দাস না কি বলেছিলেন: 'কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি।' কথাটার ইঙ্গিত

নিশ্চয় এই যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বিবেচ্য নয় ততটা, নির্লিপ্ত এক কবি হিসেবেই শুধু বিচার্য তিনি। আর ঠিক সেইদিনই, 'অমল ধবল পালে' গানটির এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুনিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এক পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফত আমাদেরই কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন।' কার্ল মার্ক্স না পড়লে পলিটিক্যাল কবিতা লেখাই চলে না, দৃঢ় ছিল তাঁর এই মত।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ এই দুই বিপরীত ভাবনার একটা সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন। সামঞ্জস্যের এই চেষ্টাকেও কি, তাঁর নিজেরই বলা নজিরে, মধ্যশ্রেণীসুলভ বলে ভাববেন কেউ? মার্ক্সবাদের দীক্ষায় সাহিত্যশিল্পের বিচার প্রায়ই একটা অনড় যান্ত্রিক ছকে পৌঁছে যায়, ভূপেন্দ্রনাথের ওই অবিবেকের মধ্যে নিশ্চয় তারই একটা পরিচয় আছে। 'অমল ধবল পালে'র প্রতিমায় 'feudal যুগের পালতোলা জাহাজ' খুঁজে পাওয়া কিংবা 'একখানি ছোটো খেত আমি একেলা'র মধ্যে শোষিত কৃষকজীবনের হাহাকার শুনতে পাওয়ায় হয়তো সত্যি সত্যি মার্ক্সবাদ নেই। সেই মার্ক্সবাদে না পৌঁছেও ধূর্জটিপ্রসাদের মতো কেউ বলতে পারেন: 'The historical comprehension of public experience which can satisfy our troubled soul today is the gift of social knowledge. For a poet, obviously, it must be felt social knowledge. This content of social knowledge seems to be missing in Tagore's poetry', বলতে পারেন যে দুঃখকে মহিমময় করে দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সরে যান ইতিহাসের বিশেষ এক আধুনিকতা থেকে, সরে যান গর্কির বা লেনিনের দুঃখবিরোধী জীবনচেতনা থেকে। এইসবই দেখান ধূর্জটিপ্রসাদ, কিন্তু সেইসঙ্গে আবার তর্কহীন প্রশস্তি জানাতে পারেন 'গোরা' 'ঘরেবাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত সমস্ত রচনাকেই। লেনিন সম্পর্কে গর্কির উচ্ছ্বাসের কথা যিনি বলেন Study'তে, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবিলাসের সীমাবদ্ধতার কথা বলেন যিনি, ভিন্ন একটি প্রবন্ধে ('রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি') তিনিই স্বতঃস্ফূর্তে জানান যে 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক····অধিকারসর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্মী। এই হিসাবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ওই ধরনের—অতএব, তিনি ঢের বেশি রিয়ালিষ্টিক।' এই ত্যাগধর্মকেই না উপনিষদের পাতা থেকে উড়ে আসা বলে ঈষৎ তির্যক মন্তব্য করেছিলেন তিনি Study'তে? একদিকে যেমন তিনি

সমাজচেতনাকে ব্যাপ্ত দেখতে চান সমস্ত সৃষ্টিতে, অন্যদিকে তেমনি 'বলাকা'র শেষ স্তব্ধতায় খুঁজে পান কবির 'আত্মিক সাধনায় ভোরবেলাকার ধ্যান'। মার্ক্সিস্ট না হয়ে মার্ক্সোলজিস্ট তিনি, সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্ত থেকেই বিচার করতে চান শিল্পের, অন্যদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিতে দেখেন 'তাঁর স্তর ছিল চেতনার ঊর্ধ্বাংশে যেখানে বাক্য ফুটে ওঠে, অন্ধ গন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, কথা লুটিয়ে পড়ে সুরের বাহুল্যতায় (ভুল), এবং ভাসমান প্রতিচ্ছায় রূপায়িত হতে চায়।' এ নিশ্চয় কোনো গোঁড়া সমাজতাত্ত্বিকের বর্ণনা নয়? রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারী তার শেষ মুক্তিতে এসে পৌঁছয়নি, পুরুষের সিদ্ধির জন্য নিজেকে ত্যাগ করে সে, একথা বুঝতে পারছিলেন যে-ধূর্জটিপ্রসাদ, তিনি আবার 'মনে এলো'তে লিখবেন: 'এ-দেশে মেয়েদের রিসার্চ করা ইনটেলেকচুয়াল হওয়া খুব শক্ত, প্রায় অসম্ভব। হওয়া উচিত কি না তাই জানি না। ওদের গড়নপেটনই আলাদা। সমাজ? কোনো সমাজই চায় না—চায়নি।'

প্রমথ চৌধুরীর দীক্ষায় একদিন বের্গসঁ-তে মজেছিলেন, বের্গসঁ থেকে রাসেল, রাসেল থেকে ক্রোচে, তারপর মার্ক্স। এইখানে পৌঁছে তার মনে হলো উদ্ধার পেলেন। একথা ঠিক। কিন্তু তেমনি ঠিক এই কথা যে, সংশয়হীন কোনো সীমান্ত অবস্থানে পৌঁছননি তিনি শেষ পর্যন্ত, বলতে হয় তাকে: 'হয়তো, হয়তো, হয়তো, সবই আমার হয়তো।' আর এই হয়তোর ফলে, অন্তর্গত এই দ্বিধার ফলে, ধূর্জটিপ্রসাদ তার আদর্শ রবীন্দ্রবিচারের ক্ষেত্রেও একটা সূচনামাত্র করে গিয়েছিলেন, সম্ভাবনাময় নানা ইশারায় ভরে আছে সেই সূচনা, কিন্তু শুধু তাঁর আদর্শ আর সিদ্ধির কোনো পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়নি শেষ পর্যন্ত। 'আমরা ও তাঁহারা'র উত্তমপুরুষকে বলেছিল প্রতিপক্ষের দল: 'আপনি দেখছি sun-struck by রবিবাবু।' এ হয়তো নিছক প্রতিপক্ষের নয়, ধূর্জটিপ্রসাদেরই এই আত্মসমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা কখনো কখনো দেখেছেন তিনি, তবু সংস্কৃতি-ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তের প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রাপন্নই ছিলেন এঁরা, আর ভাবছিলেন কেবলই: 'আমরা ভারী সাবধানী লোক' কিংবা 'আমাদের দ্বারা কিছু হবে না।' ভাবী ইনটেলেকচুয়ালদের কাছে এ হলো তাঁর এক সতর্কবাণী, ভাবী রবীন্দ্রবিচারেরও কোনো কোনো সংকটের হয়তো ইঙ্গিত রইল এখানে।

সমাজতাত্ত্বিক ধূর্জটিপ্রসাদ

সুরেন্দ্র মুন্‌শী

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর জীবনে নিজেই লক্ষ করেছেন যে তিনি এক দ্বিমুখী অনুরাগের শিকার হয়েছেন, বাঙালি পাঠকেরা যেমন একদিকে তাঁর সাহিত্য এবং সংগীতের অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন অথচ তাঁর ইংরেজি লেখাতে নিরুৎসাহী, আবার তেমনই যাঁরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাঁকে চিনতেন তাঁরা শুধু অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক পরিচয়টুকুই গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হয় বাংলা লেখাগুলি বোঝেননি অথবা বোঝার চেষ্টা করেননি। উপেক্ষার শিকার তাঁকে অবশ্য অন্যত্রও হতে হয়েছে, বিশেষতঃ সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নিজস্ব এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, সকল জ্ঞানের সমন্বয়'-এর চর্চার জন্য। তিন শতকের অধিককাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা অধ্যাপনা সত্ত্বেও প্রথম ভারতীয় সমাজবিদ্যা অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি অকপটে স্বীকার করতে পারেন: 'সমাজতাত্ত্বিকের মতে যেরূপ হওয়া উচিত আমি সেরকম সমাজতাত্ত্বিক নই।' সমাজতত্ত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রয়োজনী দৃষ্টিবিধায়ক এক আত্মিকরূপে, তাই সমাজতত্ত্ব তাঁর কাছে জীবিকা বা বিশেষজ্ঞের ভূমিকার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলো, যেন এক নিজস্ব অঙ্গীকার, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এক হাতিয়ার। এই ব্যক্তিগত মূল্যবোধের খেসারতও জীবনে তাঁকে কম দিতে হয়নি। তার এক সুযোগ্য ছাত্র যেমন বলেছেন যে তাঁর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রচনাবলী যথেষ্ট অবহেলিত হয়েছে, এমনকী অনেকক্ষেত্রে তা ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁর এই আপাত উপস্থাপনা-ভঙ্গির জন্যে।

ডি পি (ধূর্জটিপ্রসাদ যেভাবে অধিক পরিচিত ছিলেন) যাকে 'closed scholarship' বলতেন সেই সংকীর্ণ পথ পরিহার করার জন্যে জীবনে পুরস্কারও পেয়েছেন সুপ্রচুর। বন্ধু সহকর্মী এবং ছাত্ররা, যাঁরাই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন সকলেই একবাক্যে জাকির হোসেনের সেই মর্মস্পর্শী উক্তিকে সমর্থন করেছেন: 'A man of great refinement, profound learning and singular integrity, he enriched the life around him not only by what he taught but even more, perhaps, by being what he was

His very presence among us had engendered a creative intellectual atmosphere in the University'. সব বিচারের ঊর্ধ্বে এক অসাধারণ অধ্যাপক হিশাবে ধূর্জটিপ্রসাদ ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ছাত্রের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায়, বিশেষত সুশোভন সরকারের মৃত্যুর পর এই জাতীয় শিক্ষকের ধারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এই প্রবন্ধে আমার অভিপ্রায় হল ধূর্জটিপ্রসাদের কিছু ভাবনা তুলে ধরা, যা আজকের সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে উপযোগী। ডি পি ১৯৫৫ সালে প্রথম ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকের প্রথম কাজ হওয়া উচিত দেশীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ অনুধাবন, যদিও তাঁর এই বক্তব্যের উপযুক্ত সাড়া মেলেনি। একথা সত্যি যে ভারতীয় সমাজতত্ত্বে এ বিষয়ে প্রবণতার একটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সেই গভীর মর্মটিই অনুপস্থিত, কারণ ডি পি মনে করতেন ঐতিহ্যের অনুধাবন মানে ঐতিহ্যের আতিশয্য, গর্বভরে পেছনে ফেরা বা নিঃসঙ্গ একাকীত্ব নয়, বরং ঐতিহ্যই হবে সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্ণায়ক। এই ধারণার যোগসূত্র তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলীতেও (যা আমি পরে আলোচনা করব) পাওয়া যায়। আমি এখানে ডি পি-র ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার বিশদ বিবরণের মধ্যে যেতে চাইছি না কারণ এই সংখ্যাতেই একজন খ্যাতিমান সমাজতাত্ত্বিক এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করছেন। যা হোক, তাঁর আরো কিছু কিছু চিন্তা যা আমাদের জীবনে আজও খুবই উপযোগী, তার মধ্য থেকে তিনটি এখানে আলোচনা করব।

১. একটি পদ্ধতির সন্ধানে

এটি খুব বিস্ময়কর লাগে যখন দেখি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত Personality and the Social Sciences বইতে ডি পি প্রথম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ব্যয় করেন একটি পদ্ধতির আলোচনায়। আসলে Personality আলোচনায় তিনি subjectivism ও objectvism দুয়েরই পরিধির ঊর্ধ্বে কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে কতটা সার্থক হয়েছিলেন সে আলোচনা অবশ্য এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষনীয় যে এভাবে দেখলে সম্পূর্ণ বইটি

ব্যক্তি এবং সমাজের সার্বিক জীবনে সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য একটি সুপ্রযুক্ত পদ্ধতির সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছে। এই চিন্তারই প্রতিফলন আমরা আবার দেখতে পাই ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর Basic Concepts in Sociology বইতে। লেখক সেখানে বলেন: 'a study of the basic concepts in sociology is bound up with the enquiry into the nature and limitations of what is conveniently summed up as the scientific method' (পৃ: ১)। এই চিন্তা একটি সুস্পষ্ট পরিণতি পায় On Indian History (১৯৪৫) বইয়ের Study in method শিরোনামে। বইটি অবশ্যই সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। ডি পি প্রকৃতই চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে। ইতিহাস তার কাছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের থেকেও আরও বড়ো ছিলো, শুধু তাই নয়, তিনি ইতিহাসকে তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিতের উর্ধ্বে স্থান দিতে চেয়েছিলেন (যাকে তিনি বলেছেন ইতিহাসের দর্শন)। তত্ত্ব বা দর্শনকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি কখনোই কর্মকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেননি। বস্তুত ইতিহাস ডি পি র কাছে মৃত অতীতের বিবৃতি নয়, বরং 'সঠিক সমাজ-ইতিহাস-সচেতনতা'র নির্ণায়ক। তাই ইতিহাস যেমন গড়তে হবে, তেমনি আবার নতুন করে লিখতেও হবে। ইতিহাস কখনোই একটি বিমূর্ত জ্ঞানভাণ্ডার নয়, নয় বিশেষজ্ঞ সর্বস্ব সম্পদ, বরং ইতিহাস 'the function of any human being who participates in the historical process and inherits it in the form of traditions and whose view of history is part of and whose conscious action adds to and re-creates that process itself. History is not the special preserve of "scientific" historians; it is the bread and salt of every single person with active will.,

কোনো তথাকথিত তত্ত্ব বা দর্শন এ ব্যাপারে উপযোগী হবে না। ডি পি ইতিহাসের ভাববাদী দার্শনিকদের এবং সেই বিশেষ একদল বস্তুবাদীদের, যাঁদের লেনিন বলেছিলে 'economists' তাঁদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে খুবই সজাগ ছিলেন। ভাববাদীরা যেমন জীবনের রূঢ় বাস্তবের কোনো সাধারণ বা বিমূর্ত প্রতিফলন দেখাতে অসমর্থ অর্থনীতিতত্ত্বেও তেমনি প্রতিভাত হয় দৈনন্দিন আর্থনীতিক অভিঘাতের এক বিচ্ছিন্নতা। আসলে এমন একটি পদ্ধতির প্রয়োজন যা সব সীমাবদ্ধতার বাইরে ভারতীয় ইতিহাসের সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচন করবে, অথচ বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতও সেখানে উপস্থাপিত হবে। এই পদ্ধতির আরও প্রয়োজন

এই জন্য যে তা তুচ্ছ পাণ্ডিত্যের কসরৎ হয়েই থাকবে না বরং আমাদের ইতিহাস তৈরির রাস্তা সুগম করবে। ধূর্জটিপ্রসাদ মার্কসবাদের মধ্যেই সে পথের হদিশ পেয়েছেন (পৃঃ ১৭)।

Indian History and the Marxist Method শীর্ষক মূল্যবান অধ্যায়ে ডি পি-র মার্ক্সীয় পদ্ধতি ব্যাখ্যার লক্ষ্য ছিল: discovering a suitable method for the composition of Indian history with all the uniqueness and the generality it connotes and all the responsibility it throws on its renewal. (পৃঃ ১৮)। তিনি ইতিহাসকে একটি সচল প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং মার্কসবাদও তাঁর কাছে তত্ত্ব এবং ব্যবহারের কোনো বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। মার্কসবাদ তাই তাঁর কাছে কোনো ডগমা নয়; বরং তাঁর নিজের ভাষায়: Marx's historical methodology is scientific primarily in its avoidance of (a) conceptual abstractions– the defect of the idealist schools of historians, and (b) mechanical causation—the bane of the purely materialist school and its progeny, viz., the 'scientific historians' who would deal with 'facts and nothing but facts'. It is essentially scientific (a) in its understanding of the subject-matter of history, viz., social process and movement, (b) in its attempt at the discovery of specific tendencies by means of which the direction of the process may be indicated, its intensity appraised, and quality formulated, and (c) in its emphasis upon the practical, the empirical and the instrumental, which has always been the initial and the ultimate drive of all sciences. (পৃঃ ৩৬)

২. সমালোচক রূপে বুদ্ধিজীবী

Indian History and the Marxist Method অধ্যায়ে যেখান থেকে আমি পূর্বোল্লিখিত বিষয়টি প্রতিবেদন করলাম, সেই অধ্যায়টি ডি পি শেষ করেন নিম্নলিখিত কথা দিয়ে: A 'Critique' of Indian history is the supreme need of the day (পৃঃ ৪৮)। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবনে ভাষণদান কালে ডি পি আবারও সমালোচকের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন: Let

us not be afraid of having a critique. I enter a strong plea for a critique of Indian history. The need is great. I wonder if our intellectuals have fully realised it. (Diversities, ১৯৫৮ পৃ: ১৫১) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমালোচনার এই প্রয়োজন উভয়ত ইতিহাস নির্মাণ ও রচনার জন্য, নতুন কোনো সুনির্দিষ্ট উপায়ে এবং গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা অতীতের ও 'মানুষের জীবনের প্রতিটি ধারার' পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমি অন্যত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি যে মার্কসীয় পদ্ধতিতে সমালোচনার সুগভীর ভূমিকা মার্কসীয় চিন্তাবিদদের বিভিন্ন রচনাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান, যে-ধারার প্রবর্তক স্বয়ং মার্কস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কস তাঁর পদ্ধতিতে সমালোচনার বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন করেন। যেমন: সুস্পষ্টতা, বিবর্তন, সামাজিক অভিযুক্তি। বাস্তবিক সমালোচনা প্রায় তত্ত্বের মর্যাদা পেয়েছে মার্কসীয় চিন্তায় ('On Criticism in Marxist Method', Social Scientist '70, পৃ: ৬)। ডি পি মার্কসীয় ব্যাখ্যার এই অংশটি যে আত্মীকরণ করেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ সম্ভবত তিনি গ্রামশির রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

সমালোচনার ভূমিকাতে তিনি যে শুধু স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই নয়, ভারতবর্ষের একটি দেশে সমালোচক হিসেবে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার দুর্লক্ষণগুলি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তিনি সমালোচককে দেখেন এক নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে, যে শ্রেণী অবশ্যই তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার এবং রাজনৈতিক পরিবেশের সংকটের ফলে সৃষ্ট। এই সূত্র ধরেই তৃতীয় এবং শেষ চিন্তায় আমি আসতে চাই।

৩. শ্রেণী ও সংস্কৃতি

Modern Indian Culture বইয়ের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি ডি পির সর্বাপেক্ষা মৌলিক কাজ, যেটি সর্বপ্রথম ১৯৪২ সালে প্রকাশিত, পরে ১৯৪৮ সালে সংশোধিত এবং শেষে Sociology of Indian Culture (১৯৭৯) নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই বইতে ডি পি এই নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিশেষ সংস্কৃতি, যাকে ভারতীয় সংস্কৃতিই বলা যায় সেই বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। ডি পি এই শ্রেণীকে 'ঝুটা' শ্রেণী হিসেবে দেখান, যে শ্রেণী তাঁর মতে 'could never be a substitute for the genuine middle class that would have arisen on the decay of the feudal system and the unhampered growth

of industrialisation'. (পৃ: ২৬

ভারতবর্ষের পূর্বতন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে অধুনা এই 'ভদ্রলোক'-শ্রেণীর কোনো মিল পাওয়া দুষ্কর। সত্যিকথা বলতে কি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের 'মধ্যস্থ দালাল' ও মুৎসুদ্দি রূপেই এর অস্তিত্ব। 'The ancient families of Calcutta were started by these gentlemen. A comparison is possible with the "aristocrats"of the Shanghai international settlements. Bengali culture of the nineteenth century takes its cue from the taste of these Calcutta Compradors' (পৃ: ৮০-৮১)। এই সেই শ্রেণী যারা জমিদারির ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং বেড়ে উঠেছিল পূর্বতন বেনিয়াশ্রেণীর এবং দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির অবলুপ্তির প্রেক্ষিতে। 'Both English education and "land mindedness" were imparted after the liquidation of indigenous trade and commerce and the cottage industries. It was the newly created gentry living on land or on the new commerce who took to English education. Those who suffered from the disappearancce of cottage industries found the English education in the cities too expensive and the pathsalas and mabtaks dying of neglect ; so they lapsed into illiteracy' (পৃ: ৮৯)। বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আসক্তির একটি বড়ো কারণ ছিল সরকারী চাকুরি লাভের লালসা। এই বর্ধমান শ্রেণীর সংস্কৃতি হচ্ছে সেই শ্রেণীর সংস্কৃতি যাদের অসুস্থতার কারণ 'sense of impotence inside and fear of people on the other side' এবং এই চিন্তাই তাদের সংকটময় অস্তিত্ব এবং অর্জনাদির পেছনে সর্বক্ষণ ঘুরপাক খেতো (পৃ: ১১৪)। তাই সমস্ত বিষয়ে ভাবপ্রবণতাই এই সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (পৃ: ১১৭)। সাহিত্য সংগীত এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রকাশ দেখাতে গিয়ে ডি পি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'middle class soul, which is alleged to be the originator and the repository of culture, is stricken by a malady. It is simultaneously preyed upon by a new sense of guilt and a feeling of denial' (পৃ: ২০৫)।

এই নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমালোচনায় ডি পি-র প্রধান বক্তব্য এদের 'ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা'। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় ভারতীয় জনগণের

সঙ্গে এদের বিচ্ছিন্নতা। তিনি এই শ্রেণীর উৎপত্তি দেখেন 'সমাজ বিবর্তনের ফাঁক' হিশেবে এবং এই প্রসঙ্গেই তিনি আবার দেখেন যে 'much of the inner weakness of modern Indian renaissance, its nostalgia, its unrootedness, its haunting sense of inferiority' (পৃঃ ৮২)। এমন বিভিন্ন ক্ষেত্র পাওয়া যায় যেখানে তিনি মনে করেন ভারতীয় সংস্কৃতির মুক্তির উপায় একমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুধাবনে এবং সেই চিন্তাকে সামগ্রিক জনজীবনের অভিমুখী করার মধ্যে বাস্তবিক তিনি দেশের সেই 'common man' এর উপরেই গভীর আস্থা দেখান। তাঁর কথায়: Here, the common man is still a person, a whole, more integrated and more humanly cultivated than the English-educated, westernised individual of his countryman (পৃঃ ২১৬)। ঐতিহাসিকভাবে ভক্তি আন্দোলনের প্রতি আস্থা তাঁর এই বিশ্বাসেরই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে। তিনি এই আন্দোলনের নেতাদের কাজ এবং কথাকে আজকের 'সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ উত্তর' বলে মনে করেন (পৃঃ ১৭)। কিন্তু ঔপনিবেশিক অবস্থায় এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংস্কৃতি সমালোচনা এবং তাঁর দেশের 'common man' এর সংস্কৃতির প্রতি এই আস্থা এই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত সংস্কৃতির সমালোচনার উর্ধ্বে যেতে ব্যর্থ হয়। এই অর্থে তিনি এমন কোনো শ্রেণীসংস্কৃতির তত্ত্ব আমাদের কাছে উপস্থিত করেন না যা অতি সুস্পষ্টভাবে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির অধিক কিছু আলোকিত করে। আমাদের কাছে এ ব্যাপারে গ্রামশি বরং পথনির্দেশ করেন। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস এবং সেই সংস্কৃতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব অনুধাবন এজন্যই আজ অতীব প্রয়োজন। সেই প্রচেষ্টায় ডি পির কৃতিত্ব এবং সীমাবদ্ধতার কাছে পাঠ নিতে পারি।

ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে ডি পি ছিলেন সেই পথিকৃৎ যিনি সুশৃঙ্খলভাবে ভারতীয় শ্রেণী এবং সংস্কৃতির বিচার করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগামীর ভূমিকা এ পর্যন্ত কোথাও অনুসৃত হয়নি। এই বিষয়ে যে কোনো কাজের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক এবং তত্ত্বমূলক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও পথগুলি অনুসরণ করা অতীব প্রয়োজন। অন্যভাবে বলতে গেলে সমাজ-তত্ত্বের প্রয়োজন এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির যে পদ্ধতি শুধুমাত্র নিয়মমাফিক হবে না, হবে না কোনো তদবস্থস্থিতি-প্রবণতার প্রয়োজনে অস্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যবহার। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পেশাদারী সমাজতত্ত্বের চেয়ে ডি পি-র চিন্তা অধিকতর বেশি উপযোগী এবং বাস্তবসম্মত।

মানুষ ধূর্জটিপ্রসাদ : ঘরে ও বাইরে

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোনও বড় দরের মানুষ যাঁর ব্যক্তিত্ব মনীষা এবং জ্ঞানচর্চা, সকলের কাছে না হোক বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখার কয়েকটি স্বাভাবিক বিপত্তি আছে। মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর জীবন ও কর্মের স্বভাব ও চরিত্রের কোন দিকটি ফুটিয়ে তোলা দরকার যাতে সেই মানুষটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা ও বোঝা যায়। আত্মজীবনী লেখা যেমন কঠিন কাজ, স্মৃতিচারণ করাও তেমনি কঠিন। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই কিছু ঢেকে-ঢেকে প্রকাশ করার দিকে প্রবণতা এসে যায়। বড়ই হোক আর সাধারণই হোক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, স্খলন ও মানবিভ্রম ঘটে। আত্মকথা লিখতে বসে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি এই সব অন্তরায় কাটিয়ে দার্শনিক নিরাসক্তি নিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারেন নি। আবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেরই স্মৃতিভ্রংশ ঘটতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কোনো ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে দরকারী কথা উহ্য রেখে অবান্তর প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করতে দেখা যায়। আত্মকথা আর স্মৃতিচিত্র রচনার মুখ্য প্রতিবন্ধক হচ্ছে আত্মসচেতনতা, যার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যবর্জন আর কল্পনামিশ্রিত অতিরঞ্জন ঢুকে পড়ে। তখন বিষয় ও আখ্যান হৃদয়গ্রাহী হলেও পক্ষপাতদোষে বিচক্ষণ পাঠকের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না।

লেখক যখন নিকট আত্মীয় হন, তখন আলোচ্য ব্যক্তির খুব কাছে থাকার ফলে তাঁকে ঠিকমতো বোঝার সুযোগ যেমন বেশি পান, তেমনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়সম্পর্কের জন্য নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি খণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ সব কথা জেনে ও মেনে এর মুখবন্ধে যে স্বাভাবিক বিপত্তির উল্লেখ করেছি তার সত্যতা স্বীকার করেই লিখছি আমার বড় দাদা ধূর্জটিপ্রসাদের প্রসঙ্গ। তার একটি কারণ সম্পাদকীয় অনুরোধ। দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ হল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব। সঙ্গত সংকোচ কাটিয়ে যদি তাঁর ব্যক্তিসত্তার মোটামুটি চেহারাটা পরিস্ফুট করতে পারি এবং তাঁর পারিবারিক জীবন ও সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনোজগতের খানিকটা ইতিহাস অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তি-মানসের কিছুটা ক্রমবিকাশ দেখাতে পারি, তাহলে অনিবার্য ত্রুটি সত্ত্বেও এই চেষ্টা অসার্থক হবে না।

আমার বাবা ৺ভূপতিনাথের চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তৃতীয় সন্তান, তবে জ্যেষ্ঠপুত্র। বাবা-মার প্রথম ছেলে এবং বাড়ীর বড় ছেলে হওয়ার দরুণ তিনি যে বেশি সুখ-সুবিধা, আদর যত্ন পেয়েছেন অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাবার অগোচরে স্নেহশীল ও কোমল-স্বভাব মায়ের ওপর জোর ও দাবী খাটিয়ে তিনি যে ভাবে বই কেনার জন্য এবং দুঃস্থ আত্মীয় অথবা বন্ধু বান্ধবকে সাহায্য করার জন্য টাকা আদায় করে নিতেন, তা স্পষ্টই মনে পড়ে। আর মনে পড়ে একটি মজার কথা। 'সেন ব্রাদার্স' এর দোকান থেকে নতুন সব বই বাড়ীতে এনেই আমাদের দুই ছোট ভাইকে হুকুম করতেন, চট্‌পট বইগুলোয় তাঁর নাম লিখে ফেলতে। বাবা আদালত থেকে ফিরে এসে যখন বিশ্রাম করতেন, বই এর গোছা তুলে নিয়ে উলটে পালটে দেখতেন। ছেলের কারসাজি বুঝে মৃদু হেসে চুপ করে থাকতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তখন রিপন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। একখানা বই তার মলাট ও রঙের জন্য আমার মন কেড়েছিল। সেটি হল মোটাসোটা, ঘোর সবুজ বেনারসী বুটিদার শাড়ীর মতন তার পৃষ্ঠশোভা। বাবা গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী বলে বইখানির ক্রয়যোগ্যতা স্বীকার করলেন।

আপনার ব্যক্তিজীবনে বাপ-মায়ের প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিগুলোয় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ছোট বয়স থেকে তিনি নানা বিষয়ের বই আনতেন, পড়তেন। বাবার নীরব প্রশ্রয় এবং প্রচ্ছন্ন উৎসাহ তাঁকে অল্প বয়সে কিছুটা precocious করেছিল, এবং তাঁর পড়াশুনোর ধারা হয়েছিল অনেকটা এলোমেলো। কেউ কেউ বলতেন অকালপক্ক, ডেঁপো। স্কুল ও কলেজে ছাত্রাবস্থায় বলিয়ে-কইয়ে বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। চটপট জবাব তার মুখে লেগে থাকত। স্মার্ট ও সপ্রতিভ এক তরুণ গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠদের ছেড়ে কথা বলতেন না। গুরু গম্ভীর শিক্ষক ও অধ্যাপকরাও তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, যদিও 'কাজের পড়া' পড়তে উপদেশ দিতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ এই সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করেছেন কলেজী পড়ার আওতার বাইরে। ডিবেট, থিয়েটার ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নিয়ে এবং তার সঙ্গে ঘরে বাইরে প্রচুর আড্ডা দিয়ে তাঁর দিন কাটত। প্রধান আকর্ষণ ছিল নাট্যমঞ্চ, বিশেষ করে উদীয়মান সৌখীন অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর অভিনব অভিনয়। দাদার সঙ্গে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল-এ 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস' ও 'চন্দ্রগুপ্ত 'দেখেছিলাম, তার স্মৃতি আজও অম্লান। এ ছাড়া, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা তো ছিলই।

এই সব ব্যাপারে অনেক সময় যেত, পড়াশুনোর ক্ষতি হত নিশ্চয়ই, যার ফলে

তাঁর 'কলেজ-কেরিয়ার' ভালো হয় নি। তবে আসল পড়া হত বাড়িতে। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘরে বাতি জ্বলত। সে সব নিজের মনোমত পড়া। এই অনিয়মিত রুটিনের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছিল বেশ কয়েক বছর। এর ওপর প্রতি সপ্তাহে মামার বাড়ী হালিসহরে যাওয়ার ফলে ম্যালেরিয়া ধরেছিল। এই সময়কার কথা তিনি কিছু কিছু লিখেও গেছেন। বিশেষ করে. আমাদের একমাত্র মামাতো ভাই 'তিপুদা'র প্রসঙ্গ। ধীমান্ অতি-সুকণ্ঠ, রোগভয় ও বাতিক-গ্রস্ত এবং প্রথম জীবনে সংশয়বাদী (পরে গভীর অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন) এই অ-সাধারণ মানুষটির সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের ছিল খুব অন্তরঙ্গতা ও মনের মিল। 'সবুজপত্রে' তাঁর প্রথম রচনা 'দাদার ডায়েরী' ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয়। আর এক নিকটতম প্রিয় বন্ধু ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, যাঁর মডার্ন আর্ট প্রেস থেকে 'বিচিত্রা' কাগজ অভিনব মুদ্রণ-সজ্জায় বেরিয়েছিল। এই শান্ত, কর্মিষ্ঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী বন্ধুর অকালমৃত্যু ধূর্জটিপ্রসাদকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিতে তিনি একটি ইংরেজী গ্রন্থ এবং তাঁর স্ত্রীকে একখানি বাংলা বই উৎসর্গ করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের বন্ধুগোষ্ঠী ছিল খুব বিস্তৃত। সকল শ্রেণীর সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশতে পারতেন। তবে পরিবেশ বদল ও প্রবাসী হওয়াত পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কম হয়ে এলেও তাদের অবহেলা করেন নি যদিও সাধারণ মানুষ বলে তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাল রেখে চলার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না। ধূর্জটিপ্রসাদের স্বভাব ছিল খোসমেজাজী, মজলিসী। তাই অনায়াসে নিম্নস্তরের ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে তাঁর বাধা ছিল না। শুধু তাই নয়, সহানুভূতি ছিল প্রচুর। কোনও দুঃস্থ. নীচস্থ কিংবা সমালোচনায় অপদস্থ ব্যক্তির স্বপক্ষে তার ওকালতি করতে তিনি সর্বদাই এগিয়ে আসতেন এবং তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে তার অন্যবিধ গুণ কিছু বাড়িয়ে বলতেন। পক্ষ-সমর্থনে তাঁর এই দুর্বলতা নিয়ে আমরা আড়ালে কত হাসি-ঠাট্টা করেছি। বন্ধু-প্রীতির ফলে এক অব্যবসায়ীকে ঘি-এর ব্যবসায় সাহায্য করতে গিয়ে লোকসানও দিয়েছেন। দুতিনটে ঘি'র টিন বিক্রী হলে সে কি উল্লাস ও ভোজের আয়োজন। এই প্রবল উৎসাহ ও সমবেদনা তাঁর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য, সেটা বরাবরই বজায় ছিল।

এর বড় কারণ হল, ধূর্জটিপ্রসাদ অন্তঃকরণে ছিলেন খুব কোমল যদিও বাইরের গম্ভীর আবরণে সেটি প্রকাশ পেত না। আত্মীয় স্বজনরা তা জানতেন ও বুঝতেন। অনেকদিন পর্যন্ত, প্রবাসজীবন সত্বেও, পরিবারই ছিল তাঁর মনের বা হৃদয়ের স্থির কেন্দ্র। ভাই-বোনদের প্রতি নিবিড় টানের বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে, কিন্তু

তার মৌখিক উচ্চারণ ছিল তাঁর রীতি ও নীতি-বিরুদ্ধ। চেষ্টায় ও সংযমে তিনি এই আত্মপ্রকাশের বিমুখতা আয়ত্ত করেছিলেন এবং বলা চলে, এটি রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের শিক্ষা। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের হর্ষ-বিষাদের তীব্র চেতনাকে কিভাবে আত্মশক্তির চর্চায় দাবিয়ে রাখতে হয় এবং বিচলিত হৃদয়ের আবেগকে কেমন করে কোনও সৃজনধর্মী কাজে নিযুক্ত ও প্রবাহিত করতে পারা যায়, তার উজ্জ্বলতম প্রতীক তাঁর কাছে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কথা তাঁর মুখের কথা শুনেই বলতে পারছি। ধূর্জটিপ্রসাদের ভ্রাতৃ-বাৎসল্য ছিল প্রবাদের সামিল। সে কথা জানতেন তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু, সত্যেন বোস এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তী-কালে, গিরিজাপতি বাবু ও সুশোভন বাবু। তাঁর এই গভীর গোপন বৎসলতার একমাত্র জীবিত সাক্ষী আমি নিজে।

আমাদের পিতার মৃত্যুর সময়ে আমার বয়স ছিল পূর্ণ চৌদ্দ বছর আর আমার ঠিক ওপরের দাদা দেবীপ্রসাদের বয়স তখন সাড়ে পনেরো। ১৯২০ সালে পিতৃ-বিয়োগের পর থেকে তিনি যে ভাবে দুটি নাবালক ভাইদের কঠোর-কোমল অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন, সে সব কথা ও দৃষ্টান্ত এতই ব্যক্তিগত যে প্রকাশ করা চলে না। তাঁর ছেলে কুমারপ্রসাদকে শৈশবেই তার দুই কাকার জিম্মায় রেখেছিলেন কলকাতায়, তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্বভার দিয়েছিলেন তাদের হাতে। তাঁর একটা নিজস্ব ধারণা ছিল, ছেলে-মেয়েরা ছোট থেকে বাপ-মায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকলে তাদের আওতায় পড়ে যথাযথভাবে মানুষ হয় না। সে জন্যে দায়িত্বশীল নিকটতম আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রাখলে ফল ভালো হয়। তাই নিজের বিশ্বাস ও আস্থা অনুসরণ করে আপনার লেখাপড়ার কাজ নিশ্চিন্ত মনে করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে ছোট একান্নবর্তী পরিবারের বিধি-নিয়ম রক্ষার দিকে তাঁর যথেষ্ট নজর ছিল। ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর গভীর অনাস্থা ছিল কিন্তু কলকাতায় এলে কয়েকটি লৌকিকতা রক্ষা অনিবার্য হয়ে উঠত। তখন কোনো মতে দায় সেরে তিনি সরে পড়তেন। আবার সাংসারিক দায়িত্ব পালনে কোনো ফাঁকি বা গলদ দেখা গেলে তাঁর কঠিন সমালোচনা ও তিরস্কার থেকে অব্যাহতি ছিল না।

ধূর্জটিপ্রসাদের দায়িত্বজ্ঞান কতটা প্রবল ছিল, তার দু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি যখন লক্ষ্ণৌতে চলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে, তখনও আমরা দুই ভাই আইন-মতে সাবালক হইনি। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছি, আমার ওপরের দাদা আই এস সি পরীক্ষা

দিয়ে রেজাল্ট বেরোবার জন্য অপেক্ষা করছেন। এটা ১৯২২ সালের জুলাই মাসের কথা। সেজদার পরীক্ষার ফল ভালো হলে সে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবে, এই আন্দাজ করে তিনি এ সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় তার ভার দিয়ে গেলেন তাঁর সেই নিকটতম বন্ধু হরিদাস বাবুর হাতে। আমাদের লেখাপড়া সম্পর্কে তাঁর অভিভাবকীয় চিন্তার অন্ত ছিল না। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি এবং পাঠ্য বিষয় নিয়ে আমার লেখাও পাঠাতে হত, অর্থাৎ আজকালকার মতো ডাকযোগে টিউটোরিয়াল। এই সূত্রে একটা কথা মনে পড়ছে। Arthurian Cycle নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। কয়েকদিন পরে সেটি ফেরৎ এল। দেখলাম, ভিতরে নানাবিধ সংশোধন এবং দু একটি নতুন পয়েন্ট এবং সেই সঙ্গে কিছু তিরস্কার—Malory'র বইএর ভূমিকাটি না পড়ে ও তার বক্তব্যের উল্লেখ না করে প্রবন্ধটি কেন লিখেছি।

গোড়াতেই বলেছি, সব দিকে ধূর্জটিপ্রসাদের কড়া নজর ছিল। অল্প বয়সেই, বাবা জীবিত থাকতেই, তিনি আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। তার শাসন ছিল কঠোর। ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু হয়ে যেতেন বলে সেটা মাঝে মাঝে নির্মম হয়ে দাঁড়াত। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, পারতপক্ষে সামনে আসত না। শেষ জীবনে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করতেন, 'আমাকে সবাই এড়িয়ে চলে কেন'? এর উত্তরে যখন বলা হত, 'তোমার সম্বন্ধে একটা ভীতিপ্রদ ইমেজ তৈরী হয়ে গেছে বলে', তখন তিনি চুপ করে যেতেন। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে তার শাসন ও শিক্ষা সম্বন্ধে মতের সম্পূর্ণ বদল হয়ে যায়। নিজেও সে কথা স্বীকার করতেন। তাঁর ১৮-২০ বছর বয়সে স্বাস্থ্যহানি ঘটে যার জন্যে বছর খানেক ধরে স্নায়ুদৌর্বল্যের চিকিৎসা চলেছিল। এটাও একটি বড় কারণ। আসল কথা, তাঁর স্নেহকোমল মনকে দাবিয়ে রাখতে গিয়ে তিনি অতিমাত্রায় রাশভারি হয়ে থাকতেন। এও এক রকমের ছেলেমানুষি যেটা তাঁর স্বভাবে ছিল বেশি বয়সেও।

ধূর্জটিপ্রসাদের একেবারে গোড়ার জীবন আমার জানবার কথা নয়। তিনি বাবা-মার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমি সর্বকনিষ্ঠ। দু জনের ব্যবধান এগারো বছর চার মাস। ১৯১১ সালে ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বাবা বারাসত থেকে কলকাতায় এসে বাসা নেওয়া ঠিক করেন। আমরা থাকতাম মধ্য কলকাতার চাপাতলা অঞ্চলে। রিপন কলেজের পাশে অখিল মিস্ত্রী লেনে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর ছিলাম একই ভাড়া বাড়ীতে। তারপর একডালিয়া রোডে নিজেদের বাড়ী তৈরী হলে ১৯৩২ সালে আমরা বালিগঞ্জে চলে আসি। ধূর্জটিপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ থেকে বছরে দু

তিন বার কলকাতায় আসতেন এবং গরমের দীর্ঘ ছুটিটা বাড়ীতেই কাটাতেন। ইতিমধ্যে তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে এক জায়গায় বলে গেছেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা সময়ে তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা ছিল। এই উন্নাসিকতার একটা কারণ বোঝা যায় যে স্কুল-কলেজে যখন তিনি পড়ছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া আর বেশি কিছু পঠনীয় বই ছিল না বা তিনি যত্ন-সন্ধান করে পড়ার সুযোগ পান নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি তখনও ভ্রূণাবস্থায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জনপ্রিয় হন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশ বিরূপ ছিল এবং তাঁর গান ও কবিতা সম্বন্ধে উপহাস বিদ্রূপ করত। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ যখন থেকে প্রমথ চৌধুরীর এবং তাঁরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন, তখন থেকে তাঁর মতেরও পরিবর্তন হয় এবং তিনি নিজেই সাহিত্যকর্মের দিকে মন দেন। বিশেষ করে, 'ভারতী গোষ্ঠী'র কয়েকজন লেখকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়াতে তাঁদের লেখাও পড়তেন যেমন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ঘরোয়া বৈঠকে এঁদের সঙ্গে মেলামেশা হত। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মনে আছে, যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা, বিশেষ করে, তাঁর ছোটগল্প তাঁর ভালো লাগে এবং ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রেমাঙ্কুরের 'ট্যালেণ্ট' সব চেয়ে বেশি।

সে যাই হোক, ধূর্জটিপ্রসাদ এই সময়টাতে ১৯২০-২২ সালে কয়েকটি পত্রিকায় ছোট ছোট লেখা দিতেন যেমন 'মহিলা' (পটলডাঙ্গায় মহিলা প্রেস থেকে বেরুত), 'বিজলী' (বৌবাজারে একটি দোতলা বাড়ীতে) এবং 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রকাশিকা' (লাল বাজারে) নামক কাগজে। আমি ঐ সব কাগজের অফিসে তাঁর লেখা পৌঁছে দিতাম এবং কাগজ বেরুলে কপি নিয়ে আসতাম। এখন সেগুলির আর চিহ্ন নেই যদিও তার মধ্যে কিছু কিছু রক্ষা করার মতো জিনিস ছিল। 'সবুজপত্রে' লেখাও এ সময়ের মধ্যে আরম্ভ করেন, 'সবুজপত্রে'র পুরানো ফাইল থেকে তার হদিস পাওয়া যাবে। আমি এই প্রসঙ্গে তিনটি রচনার প্রতি আজকের পাঠক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—১) দাদার ডায়েরী (ধারাবাহিক নয়), ২) নর্ম্যাল (প্রবন্ধ) এবং ৩) রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র সমালোচনা। শেষ দুটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের মনোমত হয়েছিল ও প্রশংসা পেয়েছিল, এ কথা স্পষ্ট মনে পড়ে।

'সবুজপত্র' ক্রমে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত ও শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ধূর্জটিপ্রসাদ অন্যত্র লেখা সুরু করেন। এই সময়ে 'কল্লোলে'র আসরে তিনি কয়েক বার যান, ঐ কাগজে লক্ষ্নৌ থেকে প্রেরিত তাঁর একটি লেখাও প্রকাশিত হয়।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোলের আসর' গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদের উপস্থিতি ও তাঁর আলাপ-চারিতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া, লক্ষ্ণৌতে বেশ দীর্ঘকাল স্থিতিশীল হওয়ার ফলে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং শেষ দিকে ঐ সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন, সেটি পরে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে কাশীতে সাহিত্য-পাগল সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে এবং তার 'উত্তরা' কাগজে প্রায়ই লেখা দিতে থাকেন। না দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ সুরেশদা' (অধুনা প্রয়াত) নাছোড়বান্দা লোক, তাঁকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা তাকে ভালোও বাসতেন। 'উত্তরা' কাগজে শুধু প্রবাসী লেখকরা নন (যেমন মীরাটের অবনীনাথ রায়), কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে লেখকরা তাঁদের রচনা পাঠাতেন। ফলে কাগজখানির বেশ কিছুকাল ভালোই কাটতি হত এবং তখনকার দিনে পাতিরামের স্টলে বিরাজ করত। পরে অবশ্য অনিয়মিত ও সঙ্কীর্ণ কলেবরে প্রকাশ হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। এখানে ধূর্জটিপ্রসাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা বেরিয়েছিল, যেমন কয়েকটি স্বগত বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা এবং ডায়েরির ছাঁদে লেখা, সেই সময়ে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা ধরে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, যেমন, 'অতসী মামী', 'ষোল আনা', 'চীন যাত্রী' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই। এগুলি ধূর্জটিপ্রসাদের কোনো প্রকাশিত বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

এইভাবে এখানে সেখানে লেখার অভ্যাস বাড়ে এবং তাঁর নিজস্ব 'স্টাইল' তৈরী হয়ে ওঠে। তাঁর অনুরাগী পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন তাঁর ভাষাশৈলীর বিশিষ্ট গুণাগুণ। নিপুণ সংলাপ হল তাঁর লেখার ঢং। তিনি নিজেই লিখেছেন, কোনও কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে খাড়া করে তীক্ষ্ণ তির্যক্ ভাষায় তার সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখাই তাঁর পছন্দ। এ কথা ঠিক, কারণ এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার না করলে তাঁর বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার হত না। এর সুফল হয়েছিল, অনেকটা প্রশ্ন-উত্তরের সুব্যবহারে তাঁর মন্তব্য ও চিন্তার ধারাটাই গড়ে উঠত, বিশেষ উজ্জ্বল রূপ নিয়ে। কুফল এই যে তাঁর চিন্তা ও মন্তব্যগুলো মাঝে মাঝে দু একটা 'স্টেপ' লাফিয়ে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার দিকে গড়াত, মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ যুক্তির শৃঙ্খলা দিয়ে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হতে পারত না, এবং 'ডায়ালগ' বা সংলাপের পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠত না। প্রমথ চৌধুরীর 'pun' (দ্ব্যর্থবোধক বা শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ) যেমন একাধারে তাঁর বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতা, ধূর্জটিপ্রসাদের অতি উপাদেয় সংলাপ রচনাও অনেকটা তাই। দাদা আমাকে

একখানা বই দেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস মর্গান সেই পুস্তিকাটিতে চমৎকারভাবে দেখান কাব্য-নাটকে আর উপন্যাসে 'ডায়ালগ'-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সাহিত্যিক অর্থাৎ ক্ষেত্রোপযোগী মূল্য।

এখন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর প্রবাসজীবনে তাঁর ব্যক্তিমানস, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতভাবনায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে কতটা লাভবান হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে চাই। কারণ আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে এবং সেখানে নানা ধরণের খ্যাত-অখ্যাত মানুষ, তাদের জীবনায়ন ও আনুষঙ্গিক সমস্যা, বড় সমাজের মানুষ ও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের ওপর তাদের আকর্ষণ, দেশবিশ্রুত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন আর সর্বোপরি, একটি বিশাল ছাত্র-সমাজের মনে তাঁর 'ইমেজ' নির্মাণ ও প্রক্ষেপ—এ সব বিষয়ে তাঁর প্রবাস-স্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর সামাজিক সত্ত্বাকে পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে গিয়ে তাঁর মনের আকাশ যেন খুলে গেল, বড় হয়ে দেখা দিল এবং আপন চরিত্রের অনেক ত্রুটি-অসঙ্গতি দূর করে তাঁকে একটি ক্রমোন্নত 'পার্সোন্যালিটি' বিকশিত করতে সাহায্য করল। আমার নিজের দৃঢ় ধারণা, দাদা যদি লক্ষ্ণৌতে না যেতেন, তাঁর মনের পরিধি কখনোই এতটা বিস্তৃত, জ্ঞানের রীতি-সম্মত অনুশীলন এতটা ব্যাপক হতে পারত না। আশু মুখুজ্জ্যে মশাই তাঁকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিতে না পারায় কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছিল বেশি। নইলে কলকাতায় থাকলে ধূর্জটিপ্রসাদ বোধহয় একটি 'টিপিক্যাল' মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিমান অধ্যাপক হয়ে ছাত্র-জনপ্রিয়তার মুখ চেয়ে খাতা খুলে নোট দিতেন আর নিজের কাজগোছানো মানুষ বনে যেতেন।

লক্ষ্ণৌতে যাওয়া ধূর্জটিপ্রসাদের মানসজীবনে একটা বড় পরিবর্তন সূচনা করেছিল, এ কথা আগে বলেছি। তাঁর আটাশ বছর বয়সে তিনি নিজেকে যেন আপন হাতে তুলে নিলেন। বুঝেছিলেন যে সব কথায় ও কাজে, সংসর্গে ও আচরণে তাঁর এতদিন কেটেছে, তাতে আত্মশক্তির ক্ষয় হয়েছে। তাই এখন থেকে এই আত্মশক্তির অনুশীলন তাঁর কাম্য ও লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেটা দু চার বছরে হয় নি। সংযত ও শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা আর সেই সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ মনন তাঁকে ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দীর্ঘ কাল ধরে এই মানসিক প্রক্রিয়া তাঁকে আত্মপ্রসাদ থেকে মুক্ত করে। প্রচুর অধীত বিদ্যা তাঁকে শুধু গ্রন্থকীট ও বই-সংগ্রাহক না বানিয়ে মৌলিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর যে অবাধ সঞ্চরণ, সেটা ফর্ম্যাল পণ্ডিতী কৌতূহল নয়, প্রকৃত

জিজ্ঞাসা যা তাঁকে আত্মসন্তুষ্ট হতে দেয় নি, হিউম্যানিস্টদের ধরণে গোটা মানুষ (whole man) হয়ে উঠতে প্রেরণা জোগায়। লক্ষ করেছি, কিভাবে তিনি মতামতের আতিশয্য, এক পক্ষের সমর্থন প্রবৃত্তি, ধৈর্যচ্যুতি প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা করতেন। ডায়েরির পাতায় ('মনে এলো' এবং 'ঝিলিমিলি') এই প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখা যায়। লক্ষ্ণৌতে দু তিন বছর থেকে 'পার্সোনালিটি' ও সমাজ-বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ইংরেজি বই লিখতে শুরু করেন। যদিও অর্থনীতি তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল, শুষ্ক গণিতভিত্তিক অর্থশাস্ত্রের চর্চা তাঁর ভালো লাগত না। জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব—এই দুটির পরম্পরায় বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার ফলে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনে তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক সংজ্ঞাগুলির স্থিরীকরণ এবং সেই সূত্রে ব্যক্তিসত্তার যথার্থ, সামগ্রিক বিকাশ, এরই সন্ধানে ও নিজের জীবনচর্যায় তাঁর প্রায় সারা জীবন কেটেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত, এ বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে তাদের সামাজিক 'কনটেক্স্ট', ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাদের প্রয়োজন ও সার্থকতা বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করেন। তারই ফলে, ১৯৩০-৫০ সালের মধ্যে তাঁর ইংরেজি ও বাংলা বইগুলো বেরুতে থাকে। ছাপা অক্ষরে শুধু আত্মপ্রকাশ নয়, স্বোপার্জিত জ্ঞানের ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলিকে বক্তব্য হিসেবে পেশ করা ও তাদের যাচাই করে নেওয়া, এক কথায় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কুড়ি বছর তাঁর জীবনে সবচেয়ে সক্রিয় ফলপ্রসূ সময়কাল মনে করি।

তিনজন মনীষীর কাছে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাবতে শেখেন, চিন্তার সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করে লিখতে শেখেন। কারণ প্রথম দিকে তাঁর ভাষা অগোছালো হত, শব্দ ও প্রকরণের ব্যবহার শুদ্ধ ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর কাছেই তাঁর লেখার মন্ত্র, ধরতাই বুলি আর চলতি মতামতকে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা, সাহস ও শক্তিসঞ্চয়। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে অধীত বিদ্যাকে হজম করা, শুদ্ধ স্বচ্ছ ভাষায় কঠিন বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করা—এক কথায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে অনুপ্রবিষ্ট করা—ধূর্জটিপ্রসাদ শিখতে চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে আপন ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মস্থতা বা আত্মশক্তির চর্চা, ভারতীয় সমাজ-সত্তার মৌলিক বোধ, সংযম ও ধৈর্য প্রয়োগে ব্যক্তিগত দুঃখ-মনস্তাপের ওপরে উঠে, সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার নিয়ত প্রয়াস (যাকে বলা হয় 'সাবলিমেশন'),—এ রকম অনেক কিছুই। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃজনশীল প্রতিভায় কেবল অভিভূত না

হয়ে তিনি জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। আর সঙ্গীতে কবির দান বা সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও দ্বিধাই ছিল না। ধূর্জটিপ্রসাদ জানতেন বলেই লিখেছেন, স্বর ও সুরজ্ঞানের পাকা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি এত রকম ও এত নিপুণ পরীক্ষা করতে পেরেছিলেন, যা তাঁকে কেবল গানে কথা দিয়ে নয়, সুরেরই বিন্যাসে, বিস্তারে, সুফলিত প্রয়োগে এক শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা ও সুরভাবুক (কম্পোজার ও থিঙ্কার) করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শুধু 'গানের রাজা' নন, ছিলেন সঙ্গীতের জ্ঞানী অর্থাৎ রাগের খাঁটি রূপটি কিভাবে ফোটানো দরকার, কথাকে সঙ্গে অথবা পিছনে রেখে সুর কখন, কোথায়, কোন দিকে কোন গ্রামে উঠবে নামবে, সে সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল। সঙ্গীত চিন্তা ও সেই তত্ত্বব্যাখ্যার দায়িত্ব কবি একাই করে গেলেন, এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কিছু ইতিহাস, তাঁর মনোজগতের গঠন ও উপকরণ সম্বন্ধে খানিক আভাস দেওয়া গেল। এখন তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস রুচি ও স্বভাবের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি। জীবনে তিনি একাধিক মনস্তাপ পেয়েছেন। ১৯১৮ সালে তাঁর ঠিক পরের ভাই জয়ন্তীপ্রসাদের অকালমৃত্যু, ১৯২০তে পিতৃ-বিয়োগ, ১৯৩২ সালে প্রিয়তম বন্ধু হরিদাসবাবুর মৃত্যু, ১৯৪২ সালে তৃতীয় ভাই-এর অকালে চলে যাওয়া, এ সবই ঘটেছিল। কিন্তু কখনো মুহ্যমান হয়ে বসে থাকতে দেখিনি। দুঃসহ 'রিন্যাল কলিক'-এর যন্ত্রণায় পাশ ফিরে বই এর মধ্যে মনোনিবেশ করে দেহের যন্ত্রণা ভুলতে দেখেছি। শেষ জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পড়েও মনকে দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সেন্‌টিমেন্‌ট্ তাঁর যথেষ্ট ছিল কিন্তু সেন্‌টিমেন্‌টাল' হয়ে পড়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। চিত্তের দৃঢ়তা, নিয়মানু-বর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের অভ্যাস করে তিনি অনেকটা মনের সবলতা লাভ করতে পেরেছিলেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, গুরুবাদে, জন্মান্তরে, আত্মার অস্তিত্বে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, লোকাচারে সংস্কার-পালনে তো নয়ই। কেবল কিছু দিনের জন্য পরলোক সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জেগেছিল। সূক্ষ্ম স্নায়ু বা অনুভূতির ফলেই বোধ হয় তিনি 'প্রিমনিশন' বা পূর্বাভাস পেয়েছিলেন, জানি। ধর্ম-বিশ্বাস ছিল না বলেই মনে করি, তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখাই শ্রেয় মনে করতেন। এই সব বিবেচনায় তাঁকে 'মেটিরিয়্যালিস্‌ট্' বলা যায়।

যৌবন থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদ সৌখীন প্রকৃতির মানুষ। শরীরের ও বেশভূষার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর খুব নজর ছিল। মলিন পরিবেশ তাঁর অসহ্য লাগত। গরমকালে কলকাতায় এসে দিনে দু তিন দফা স্নান, বরফজল ও ডাবের জল ছাড়া চলত না।

ছিলেন যেমনি স্পষ্টভাষী, তেমনি মিতাহারী। টক্-ঝালের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল, মিষ্টির আস্বাদে অরুচি। ব্যতিক্রম শুধু, আম আর সন্দেশ। নানা জাতের কলমের আম চিনতেন, স্বাদের তারতম্য থেকে সে আমের নাম বলতে দেখেছি। প্রবাস-জীবনে তাঁর রুটিন ছিল সকাল থেকে পড়াশুনো আরম্ভ, মাঝে মাঝে বারান্দায় বাগানে পায়চারি। সকাল-সকাল স্নান, ফিটফাট পোশাকে কলেজে যাওয়া, ফিরে এসে কিছু বিশ্রাম, সন্ধ্যায় ছাত্র কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ, তর্ক। তারপর আবার অনেকক্ষণ ধরে লেখা-পড়া। আর তারই সঙ্গে অনেক চা-কফি, সিগারেট। কলকাতায়, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে বই-এর দোকান থেকে নতুন বই এলেই ঘরে ঢুকত। বই কেনার বিরাম ছিল না 'অ্যাকাউন্ট' ছিল বলে। আমার পঠদ্দশায় বই আনতাম সেন ব্রাদার্স ও বুক কোম্পানি থেকে তাঁর নামে। তিনি এসে বিল মেটাতেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের আর কয়েকটি স্বভাবের কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রথমটি তাঁর এক জেদী মনের জোর। দেহের অসুস্থতা মানতে চাইতেন না, অসুখ হলে কমিয়ে বলতেন। বাড়ীর কাউকে ভুগতে দেখলে তিনি বলতেন, ওটা মনের বাতিক, ভয়। ১৯৩০-৩২ সালে সিগারেট বর্জনের ফলে লম্বা গোছের বিড়ি খেতাম। ফলে ব্রঙ্কাইটিস-এর সূত্রপাত। ক্রমাগত কাশি শুনে একদিন বললেন, 'কাশি চেপে রাখতে হয়, ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল'! এ উপদেশে অবশ্য কাশির ধমক কমে নি, 'স্বাধীনতার দাম'ও কমে নি। নিজের শেষ জীবনেও তিনি দৈহিক অক্ষমতা মেনে নেন নি। জুরিখ্ হাসপাতালে সঙ্কটময় অস্ত্রচিকিৎসা শেষ হলে, তিনি একলাই কলকাতায় এসে পড়লেন। তারপর নিউমোনিয়া এবং তার তিন চার মাস পরেই আলিগড়ে ফিরে গিয়ে অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। স্তিমিত কণ্ঠস্বর, দুর্বল দেহ নিয়েও তিনি ছোট ক্লাসে ছাত্র-গবেষকদের নিয়ে বসতেন। স্বাস্থ্যহানির কোনও ওজর-আপত্তি তিনি গ্রাহ্য করতেন না। চুপ করে থাকতেন, কিন্তু নিজের মতেই চলতেন।

রসিকতা ছিল তাঁর আর একটি উল্লেখ্য অভ্যাস। এটা প্রকাশ পেত আড্ডায়, মজলিসে এবং লেখায়। অল্প বয়সে এ অভ্যাস কখনো লঘু ও তরল হত, এটা ঠিক। পরেও, কেউ কেউ তাঁর বাকচাতুরীকে সময়োপযোগী মনে করেন নি। কিন্তু লেখায় ও কথায় 'আয়রনি' অর্থাৎ শাণিত বিদ্রূপ ও বক্রোক্তির সূক্ষ্ম খোঁচা নিপুণ হয়েই প্রকাশ পেত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই: প্রথমটি তাঁর এম. এ ক্লাসে ছাত্রজীবনের সময়ে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সহপাঠী ও আমার অধ্যাপক,

ত্রিপুরারি চক্রবর্তী আমাকে গল্পচ্ছলে বললেন, "ধূর্জটির 'উইট্' কেমন ছিল শোনো। ইতিহাসের ক্লাসে এক অধ্যাপকের বরাদ্দ ঘণ্টা আমাদের অনেকেরই ভালো লাগত না। প্রথমে রোল কল্, তারপর দু চার মিনিট কিছু বলেই খাতা খুলে নোট দিতেন। আমরা হেঁটমুণ্ড লিখে যেতাম, কেউ বা ঝিমুত। সুমের-আক্কাদ-ব্যাবিলনের শুকনো ইতিহাস আরও নীরস হয়ে যেত। বংশের পর বংশের তালিকা, কতকগুলো রাজার খটমট নামের লিস্ট আর মৃতদের সমাধি! ধূর্জটি প্রায়ই ক্লাস পালাতো, মাঝে মাঝে এসে 'বোর্‌ড্' হয়ে বসে থাকত। অন্য বই পড়ত, নয় তো খাতায় হাবিজাবি লিখত, ছবি আঁকত। একদিন অধ্যাপক মশায় ধূর্জটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ভাবটা এই, 'লিখছ না তো?' তাঁর উহ্য প্রশ্নের জবাবে ধূর্জটি গম্ভীর ভাবে বলল, 'স্যার—ভাবছিলুম, 'they were more buried than born'! অধ্যাপক চুপ করে রইলেন। রসিকতাটা ধরতেই পারেন নি।"

দ্বিতীয়টি প্রৌঢ় বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে এক নিমন্ত্রণে বসে। পাশেই বসেছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেব, এক অদম্য রসিক। দাদা চাট্‌নিটা একটু মুখে দিয়েই বললেন 'সিরাপ'। হারীতদা' বললেন, "তা বটে, একটু বেশি মিষ্টি পড়েছে। কিন্তু ধূর্জটি, তুমি পাঁপর খেলে না? চাটনির অনুপানই তো পাঁপর। ওটা হজমী।" জবাব দিলেন, 'জানি, কিন্তু ছুঁই না। ওটা হজম করায়, কিন্তু নিজে হজম হয় না।' একটু থেমে আবার বললেন, "পাঁপর হল যীশুখৃষ্ট।" হারীতদা'র মতো সিদ্ধ রসিকও জিগ্যেস করলেন, 'মানে...?' 'মানে—অপর সবাইকে তরালেন, নিজেকে পারলেন না।'

তৃতীয়টি আলিগড়ে এক সকালের ঘটনা। দাদা সে সময়ে একলা ছিলেন, শরীরটাও খারাপ যাচ্ছিল। তাই তাঁর কাছে কিছু দিন ছিলাম। সকাল ন'টা আন্দাজ একটা বড় গাড়ী পোর্চে এসে দাঁড়াতে উঠে দেখি জওহরলাল নেহরু নামছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইজ ডি. পি. ইন্?' 'আছেন', বলে দাদাকে চটপট খবরটা দিলাম। তিনি তখন লিখছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে এসে ভিতরে এসে বসতে বললেন, কিন্তু পণ্ডিতজী হাতঘড়ি দেখিয়ে বললেন, 'না, সময় বেশি নেই। হাথরাস-এ যাচ্ছি, একটা চোখের হাসপাতালে খোলা হচ্ছে, সাড়ে ন'টায় পৌঁছুতে হবে।' কুশল-বিনিময়ের পর বললেন, 'একটু দেখা করে গেলাম, চলি এখন...'। তারপর পা-দানিতে পা রেখে ঘাড় ফিরিয়ে স্মিত মুখে বললেন, 'Well D. P., still philosophising?' মুখটিপে ঈষৎ হেসে তক্ষুনি জবাব এল।

'Yes, better than muddling along, isn't it ?' জওহরলালজী উচ্চ হেসে গাড়ীতে ঢুকলেন। তির্যক্ উক্তির সূক্ষ্ম খোঁচ বুঝতে তাঁরও দেরি হয়নি।

ধূর্জটিপ্রসাদের রসিকতায় ঝাঁঝ ও দীপ্তি দুটোই ছিল। 'ইম্‌প্রম্‌টু' যে উইট-এর স্বধর্ম ও যোগ্য বাহন, তা প্রমাণসিদ্ধ।

ব্রাহ্মণত্ব, জাত্যভিমান, এ সব তাঁর মধ্যে ছিল না। ছিল না সাম্প্রদায়িকতার কোনো সঙ্কীর্ণতা। নইলে উত্তর প্রদেশে তাঁর অগণিত মুসলিম ছাত্র, বন্ধু, নেতা তাঁকে এত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিতে পারতেন না। একদা আলিগড়ের উপাচার্য, পরে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ধূর্জটিপ্রসাদের এই উদার মানবিকতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যেটা প্রকৃত দান, অর্থাৎ দর্শন সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তার যে বৈশিষ্ট্য, তাকে শ্রদ্ধা করতেন। যে কোনও ধর্মের, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, আনুষ্ঠানিক বা প্রতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর কাছে খুব অপছন্দ ছিল। সেই রকম বংশগৌরবকে মধ্যবিত্তদের একটা বাজে সেন্টিমেন্ট বলেই মনে করতেন, যা উন্নতির বড় অন্তরায়। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ যথেষ্ট প্রখর ছিল, যাকে একরকম 'দম্ভ' বলা চলে। পাপ-পুণ্য বোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি আত্ম-প্রত্যয়ের কথা তিনি শেষ বই 'ঝিলিমিলি'তে খোলাখুলি লিখেছেন। কিন্তু বংশের ধারা সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে দেখেছি। বংশপরম্পরায় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা এবং জ্ঞানগত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ 'On Indian History' বইটির উৎসর্গে—'To the Family Tree in historical gratitude'— সেই ঋণ-স্বীকারে।

স্বাভাবিক কুণ্ঠা কাটিয়ে অগ্রজ সম্পর্কে অনেকদিনের স্মৃতি থেকে যা লিখতে পারলাম তা হয়তো কিছু এলোমেলো। কিন্তু তথ্যের ভুল হয়নি বলেই বিশ্বাস। আর এই থেকে যদি ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের একটা মোটা রেখাচিত্র পাওয়া যায় এবং তাঁর স্বভাব-রীতি রুচি ও অভ্যাস, সব মিলিয়ে একটা নক্সা তৈরী হয় বর্তমান পাঠকদের কাছে, তা হলেই যথেষ্ট ভাবব।

স্ত্রীর চোখে ধূর্জটিপ্রসাদ

[আমাদের পক্ষ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের স্ত্রী ছায়া দেবীর কাছে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, তিনি লিখিতভাবে উত্তর দিয়েছেন।]

প্রশ্ন—কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিলো ?

উত্তর—১৫ বছর।

প্রশ্ন—বিয়ের পর তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আপনার কোনো অসুবিধা হয়েছিলো কি ?

উত্তর —একেবারেই না। আমার শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল।

প্রশ্ন—বিয়ের আগে আপনি কি ধূর্জটিপ্রসাদের পরিবার সম্পর্কে জানতেন ?

উত্তর না, আমরা প্রবাসী বাঙালী।

প্রশ্ন —আপনার লেখালিখির ব্যাপারে ধূর্জটিপ্রসাদ কী রকম উৎসাহ দেখাতেন ?

উত্তর —খুশীই হতেন। আমার সামান্য লেখায় মতামতের প্রশ্ন ওঠে না।

প্রশ্ন ধূর্জটিপ্রসাদ খুব মজলিসি লোক ছিলেন, এর ফলে পারিবারিক বা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মনোযোগের অভাব ঘটতো কি ?

উত্তর—তিনি পরিবারবর্গের ওপর অত্যন্ত মমতাশীল ছিলেন এবং আত্মীয় পরিজন সকল নিয়েই গল্পগুজব করতে ভালবাসতেন।

প্রশ্ন —তাঁর পরিচিতের মধ্যে আপনার প্রিয় ছিলেন কারা ?

উত্তর পরিচিতের পটভূমিকা বৃহৎ ছিলো, সেই কারণে বহুলোক আমাদের ঘরের মানুষ ছিলেন, বিদেশীও বহুজন, তাঁদের পেয়ে আমরা দুজনেই সমভাবে খুশী হতাম। কলকাতায় আমরা এলে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৺সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুশোভন সরকার ৺গিরিজাপতি ভট্টাচার্য এঁদের পেয়ে উনি, আমি অ[illegible]শয় পুলকিত হতাম, এঁরাও আনন্দে যোগ দিতেন।

প্রশ্ন —তাঁর লেখা নিয়ে আপনার মতামত মানতেন ?

উত্তর—মতামত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কেননা লেখকের বিচারবুদ্ধি ছিল।

প্রশ্ন —উপন্যাসে ধূর্জটিপ্রসাদকে কখনো কখনো মহিলাদ্বেষী মনে হয়। বাস্তবে কি তিনি তাই ছিলেন ?

উত্তর—একেবারেই না।

প্রশ্ন—শোনা যায় মোহানার পর তিনি একটি চতুর্থ খণ্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ কথা ঠিক ? ঠিক হলে পরিকল্পনাটি কি ছিলো ?

উত্তর—হ্যাঁ ঠিক, তবে লেখকের পরিকল্পনা ছিল নিজস্ব এবং কেবলমাত্র তিনি ঔপন্যাসিক ছিলেন না, সেই কারণে হয়তো এই পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

প্রশ্ন—তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তর—প্রশ্ন ওঠে না।

প্রশ্ন—তাঁর স্বভাবের কোন দিকটা আপনার ভালো লাগত ?

উত্তর—বন্ধুপ্রীতি অসীম, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার, ভ্রাতৃবর্গের পুরাকালের জয়েন্ট ফ্যামিলির বড়দা, সকলের সঙ্গে হাস্যপরিহাস, অভ্যাগতের আপ্যায়ন।

প্রশ্ন—তাঁর গান কেমন লাগত আপনার ?

উত্তর—গান তিনি বড একটা গাইতেন না। আসলে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও সমজদার ছিলেন।

প্রশ্ন—তাঁকে কখনও আবেগে অভিভূত হতে দেখেছেন কি ?

উত্তর—কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন না অতএব আবেগ থাকা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য কি ছিলো ?

উত্তর—নিয়মিত অভ্যাসে চলতেন। পড়াশুনায় বেশি সময় দিতেন।

প্রশ্ন—তিনি যে methodologyর কথা বলতেন তা জীবনে মেনে চলতেন কি ?

উত্তর—নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন—তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময় ছিলো কখন ?

উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমরা সব সময় তাঁকে হাসিখুশী দেখতাম। ১৯৩২ সালে বালিগঞ্জে বাড়ি করে মা ভাইয়েদের পুরাতন বন্ধুদের পেয়ে খুব আনন্দে কাটাতেন দেখেছি।

প্রশ্ন—তাঁকে নিয়ে আপনার সবচেয়ে সুখের স্মৃতি কি ?

উত্তর—প্রশ্ন বাহুল্য।

প্রশ্ন—প্রতিভাবানের স্ত্রী হওয়ায় অনেক বিড়ম্বনা থাকে অনেক সময়, আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা কি ?

উত্তর—বিড়ম্বনা ঘটেনি।

প্রশ্ন—বক্তব্য বইটি আপনাকে উৎসর্গ করলেন কেন ?

উত্তর—স্বাভাবিক, এইতেই বোঝা যায় বিড়ম্বিত জীবন ছিল না।

প্রশ্ন—ধূর্জটিপ্রসাদ এদেশে মার্কসচর্চার একজন পথিকৃৎ। অথচ তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলেন না, এর কারণ কি ? আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে

কোনো কথা হয়েছিলো ?

উত্তর—কোথাও তিনি লিখে যাননি। দলের বাইরে থেকে কাজ করা পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন—সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন কি ?

উত্তর—সামাজিক আমন্ত্রণে যেতেন। আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না।

প্রশ্ন—আপনাদের বাড়িতে কি পুজোআর্চার রেওয়াজ ছিলো ? ধূর্জটিপ্রসাদ কি অঞ্জলি দিতেন ?

উত্তর—বাহ্য অনুষ্ঠানে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পূজা-আচার রেওয়াজ আমাদের বাড়ি ছিল না। অঞ্জলি কখনই দিতেন না।

প্রশ্ন—বন্ধু-বান্ধবের চিঠিপত্রের তিনি নিয়মিত জবাব দিতেন ? তাঁর ব্যবহারের মধ্যে প্রধান কি ছিলো—সৌজন্য না আন্তরিকতা ?

উত্তর—বিশেষ পত্রালাপী ছিলেন। সৌজন্য ও আন্তরিকতা দুইই ছিলো, ক্ষেত্র-বিশেষে প্রযোজিত হ'তো, ভেবে চিন্তে নয়, স্বভাব-প্রণোদিত হয়ে।

প্রশ্ন—অর্থনৈতিক অবস্থা কি তাঁর কাজের অন্তরায় হয়েছিলো ?

উত্তর—না, একেবারেই না।

প্রশ্ন—আপনার কাছে স্ত্রী হিসাবে কী আশা করতেন ?

উত্তর—অপ্রকাশিত।

প্রশ্ন—তাঁর স্মৃতি রক্ষা কীভাবে হওয়া উচিত আপনি মনে করেন ?

উত্তর—তাঁর বইগুলির পুনর্মুদ্রণ, তাঁর নামে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ধূর্জটিপ্রসাদ লিখতেন কখন ? এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অভ্যাসের কথা আপনার মনে পড়ে ?

উত্তর—নির্দিষ্ট সময় ছিলনা, লেখার তাগিদ এলে বসে যেতেন চা-কফি ও সিগারেট সহযোগে। খাদ্যের চেয়ে এই তিনটি অংশ তার বিশেষ প্রিয় ছিল।

প্রশ্ন—আপনি তাঁর সঙ্গে গানের আসরে যেতেন ?

উত্তর—প্রায়ই, প্রায় সর্বত্রই আমরা একসঙ্গে সব জায়গায় যেতুম।

প্রশ্ন—তাঁর কোন বইটি আপনার সবচেয়ে প্রিয় ?

উত্তর—আমরা ও তাঁহারা।

প্রশ্ন—একজন লেখিকা হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা ও শৈলী সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর—আমার মতো সামান্য লেখিকার মতামতের দাম কী ?